প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনচরিত) গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বামিজীর আদর্শ জীবনচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উপকৃত হইতে পারেন এই মহান উদ্দেশ্য লইয়াই এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা খরচ প্রভৃতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইল।

শারদীয়া সপ্তমী, ১৩৫৬ প্রকাশক

সূচীপত্র

ভূমিকা … … [১]
অবতরণিকা … … [৯]
সিমুলিয়ার দত্তবংশ … … ১
পিতামাতার পরিচয় … … ৬
নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা … … ১২
শিক্ষারম্ভ … … ২১
বিদ্যালয়ে … … ৩১
পিতামাতার নিকট শিক্ষা … … ৪৬
বাল্যজীবনের শেষ কথা … … ৫৬
কলেজে … … ৬০
মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা … … ৯৪
অকূল চিন্তাসাগরে আশ্রয় … … ১০২
পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট … … ১১০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে … … ১২২
বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা … … ১৫১
বরাহনগর মঠে তপস্যা … … ১৬০
পরিব্রাজকবেশে … … ১৭৬
গাজীপুরের পওহারী বাবা … … ১৯৩
পুনর্যাত্রা … … ২০০
হিমালয়ক্রোড়ে … … ২০৫

আলোয়ার রাজ্যে ২২২

জয়পুর ও খেতড়িতে ২৪৫

গুজরাট প্রদেশে ২৫৭

বোম্বাই প্রদেশে ২৮৪

দাক্ষিণাত্যে ৩১২

প্রব্রজ্যাকালের অন্যান্য কাহিনী ৩৩৮

মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে ৩৫৫

সঙ্কল্পনিরূপণ ও আমেরিকা যাত্রা ৩৭২

সমুদ্রপথে ৩৮৩

আমেরিকায় প্রথম কয়দিন ৩৯৫

চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা ৪০৪

মহাসভার অধিবেশনান্তে ৪১৬

পর্য্যটন ও প্রচার ৪৩৫

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া এবং ভারতের নানাস্থানে মঠ সেবাশ্রমাদি স্থাপন দ্বারা স্বদেশবাসীকে ধ্যান-ধারণা ও দরিদ্রনারায়ণসেবা শিক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়া বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতেরই বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারত তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনাদর্শে ও অদ্ভুত কৃতকার্য্যতায় গৌরব অনুভব করিয়াছে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি, কারণ তিনি স্বয়ং বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পূত জীবনচরিত আলোচনায় যে সমগ্র জগতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইবে, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সংস্রবে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রিয়তম ও প্রতিভাবান্ শিষ্যের গুণগ্রামের কথা কিছু কিছু অবগত হই। তখন তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে পরিব্রাজকভাবে ভ্রমণ করিয়া কঠোর তপস্যা ও সাধন-ভজনের দ্বারা নিজ গুরুদেবের আদিষ্ট কার্য্যভার-সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট মধ্যে মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার কথা শ্রবণ ও তিনি এখন হৃষীকেশের তপোভূমে সাধনে নিযুক্ত বা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছেন, এইরূপ সামান্য সংবাদ জানা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানিবার সুযোগ এবং সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ আগ্রহও হয় নাই। কিন্তু

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই জগদ্বিখ্যাত চিকাগো ধর্ম্মমহামেলায় যখন তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রকাশিত হইল, তখন হইতেই বিশেষভাবে তাঁহার জীবন ও উপদেশের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন হইতে সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতে লাগিল অথবা তৎসম্বন্ধীয় বা তৎপ্রণীত যে কোন পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাই শুধু সাগ্রহে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম তাহা নহে, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতেও তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম এবং তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য ত্যাগ ও তপস্যার কথা, অপূর্ব্ব গুরুভক্তি, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ উদার মতসমূহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন, তখন প্রথম শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার অপূর্ব্ব তেজোমণ্ডিত প্রতিভাদীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া তিনি যে অলোকসামান্য মহাপুরুষ তদ্বিষয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম।

এই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বামিজীর লীলাসম্বরণের সময় পর্য্যন্ত (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই) নানাস্থানে তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশামৃত শুনিবার এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আমার মঠে যোগ দিবার পূর্ব্বে কাশীপুরের উদ্যানে যখন স্বামিজী অবস্থান করেন, উপর্য্যুপরি কয়েকবার এবং তদানীন্তন আলমবাজার মঠে যোগ দিবার কিছু পরেই তাঁহার দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ও আলমোড়া যাত্রার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ঐ মঠে ৪।৫ দিন মাত্র তাঁহার সঙ্গলাভ করি। (এই সময়কার কিছু কিছু বিবরণ বহু পরে 'স্বামীজির অস্ফুট স্মৃতি' নাম দিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিয়াছি।) পরে ঐ বৎসর ৺পূজার পর লাহোরে তাঁহার

সঙ্গে মিলিত হইয়া তথা হইতে দেরাদুন, সাহারাণপুর, দিল্লী, আলোয়ার, জয়পুর ও খেতড়িতে তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করি। খেতড়ি হইতে পৃথক হইয়া একমাস পরে পুনরায় কলিকাতায় তাঁহার সহিত মিলিত হই। ১৮৯৮এর প্রথম ভাগে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাটীতে মঠ উঠিয়া যাইলে কয়েকমাস তথায় তাঁহার সহিত একত্রবাসের সৌভাগ্যলাভ করি। তারপর তিনি কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া নাইনিতাল হইয়া আলমোড়ায় গমন করিলে আমিও মাসখানেক পরে তথায় ৪।৫ দিনের জন্য মিলিত হই। তাঁহার কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আবার কখনও কলিকাতায়, কখনও মঠে (ইহারই কিছু পরে বেলুড়ে স্থায়ী মঠবাটী নির্ম্মিত হয়) তাঁহার সঙ্গ ও সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটিতে থাকে। ১৮৯৯ সালের জুনে তাঁহার দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের সময় প্রিন্সেপ ঘাটে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আবার যখন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রি ৯টার সময় কোন সংবাদ না দিয়াই তিনি হঠাৎ মঠে প্রত্যাগত হন, তখন আবার তাঁহার দর্শন লাভ হইল। ইহার পর অধিকাংশ সময় তিনি মঠে যাপন করিয়াছেন—আমিও বিশেষ কারণে বাহিরে না যাইলে তাঁহার সঙ্গলাভ করিতাম। ইতোমধ্যে স্বামীজি যে কয়েকবার মঠ ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন, তাহার মধ্যে ঢাকা যাত্রার সময় তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। অবশেষে যেদিন আমাদের কাঁদাইয়া তিনি মহাসমাধি প্রাপ্ত হইলেন তখনও তথায় উপস্থিত ছিলাম।

স্বামীজির জীবনের যে সামান্য অংশ সম্বন্ধে আমার কতকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহার নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী কি কি উপাদান হইতে প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

মঠে আশ্রয় লইবার পর হইতেই স্বামীজি আমাদিগকে মঠের দৈনন্দিন কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বার বার আদেশ করিতেন। আমরা সকল সময়ে না পারিলেও অনেক সময়ে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম। তৎফলে মঠের অন্যান্য অনেক ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বামীজির অনেক কথা, অনেক উপদেশ এবং তাঁহার জীবনের কতক কতক ঘটনা ও বিভিন্ন স্থানের গতাগতিরও কতক কতক বিবরণ তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া মঠে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

স্বামীজির মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া বেলুড় মঠে সমবেত হন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বামীজির সম্বন্ধে যিনি যাহা জানিতেন তাহা বলিয়া গিয়া আমার দ্বারা লিপিবদ্ধ করান। পরে 'উদ্বোধনের' সম্পাদনকালে স্বামীজির জীবনের উপাদান-সংগ্রহের জন্য পাঠকগণের নিকট আবেদন করায় স্বামীজির বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে দীক্ষিত বেলগামনিবাসী ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, স্বামীজির অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বামীজি-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজির পাশ্চাত্যদেশবাসিনী বহুগুণালঙ্কৃতা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বোধ হয় স্বামিজীর একখানি সুবিস্তৃত জীবনী সঙ্কলনের মানস করিয়া তাহার অংশবিশেষস্বরূপে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ-ভারত' নামক ইংরেজী মাসিকে 'The Master as I Saw Him' নাম দিয়া স্বামীজি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, অকালে দেহত্যাগ করাতে স্বামীজির সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের ভার গ্রহণের

পর স্বামীজির একখানি সুবৃহৎ সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিবার কল্পনা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে উপরে উল্লিখিত ডায়েরি এবং মুদ্রিত বিবরণ-সমূহ ব্যতীত নানাস্থান হইতে নানা ব্যক্তিকে লিখিয়া নানা ঘটনা সংগ্রহ করেন এবং এইরূপে স্বামীজির সুবৃহৎকায় ইংরেজী জীবনচরিত চারিখণ্ডে সঙ্কলিত হয়। ভবিষ্যতে যিনিই স্বামীজির জীবনচরিত রচনার প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাকেই প্রধানতঃ ইহাই উপাদানরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ জীবনচরিত মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ ও আমি উহার হস্তলিপি দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং যাহাতে উহাতে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে অতিরঞ্জন না থাকে বা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে নানা উপায়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা দেশ স্বামীজির উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা ভাষায় দুই-একখানি অতি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ব্যতীত বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিবার চেষ্টা বিশেষ দেখি নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল বর্ত্তমান গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় স্বামীজির ইংরেজী জীবনচরিতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে দেখান এবং তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও গুছাইয়া বেশ মিষ্ট করিয়া বলিবার শক্তি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সমগ্র জীবনচরিতটী লিখিবার চেষ্টা করিবার জন্য উৎসাহিত করি এবং কি ভাবে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিলে ভাল হয়, তৎসম্বন্ধেও কতকগুলি পরামর্শ দিই। সম্প্রতি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানি লেখা শেষ হওয়ায় উহা প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়া আমাকে একটী ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন—তদুপলক্ষে আমি এ পর্য্যন্ত উহার হস্তলিপির অধিকাংশ ভাগ শ্রবণ করিয়াছি এবং

আমার স্বামীজির জীবন সম্বন্ধে যতটা জানা আছে, তৎসহায়ে এবং মঠের ডায়েরি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া ঘটনার বর্ণনার মধ্যে যাহাতে অসত্য প্রবেশ না করে, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

প্রমথবাবু মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে স্বামীজির বিস্তারিত ইংরেজী চারি খণ্ড জীবনচরিতের অনুবাদ করিবার অনুমতি যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে গিয়া সকল স্থলে ধারাবাহিক ও আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেন নাই, কেবল যাহাতে ঘটনাগুলির একটীও বাদ না পড়ে তদ্বিষয়েই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। গ্রন্থ-সংশোধনকালে তিনি আরও বিশুদ্ধ করিবার জন্য পুরাতন 'উদ্বোধন', 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ হইতে স্বামীজির জীবনচরিতের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আবার মিলাইয়া দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পঞ্চম ভাগ' হইতে স্বামীজির বাল্য জীবন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী যথাযথ বর্ণনামাত্র করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দার্শনিকভাবে স্বামীজির জীবন বিশ্লেষণ করা বা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতার পরিমাণ কতদূর, গ্রন্থকার সে দিকে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, তদপেক্ষা উচ্চতরশক্তিসম্পন্ন লেখকের জন্য সেই কার্য্য রাখিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার দ্বারা স্বামীজির জীবনালেখ্যখানি যথাযথ চিত্রিত হইয়া থাকে, তবেই তিনি নিজ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

আমরাও তাঁহার পুস্তকের শুদ্ধতা সম্বন্ধে যেটুকু সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছি সেটুকুও বড় বেশী নহে, এবং হলফ করিয়া এ কথাও

বলিতে পারি না যে, ঘটনা-সন্নিবেশে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নাই, তবে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করাতে ইহা অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তৎপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিতে' Dialogic Process নাম দিয়া মহাপুরুষগণের জীবনচরিতে তাঁহার শিষ্যগণের ভক্তির আতিশয্যে যে অনিচ্ছাকৃত অতিরঞ্জনাদি দোষ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্বামীজির ইংরেজী জীবন-চরিতের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের হস্তলিপির আলোচনাকালে বিশেষ অনুসন্ধান অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত হইতে কিয়ৎপরিমাণেও মুক্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে, কারণ স্বামীজির জীবনের যে সকল ঘটনা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল, অনুসন্ধানের ফলে তাহারাও কতক আমার ধারণা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন, অতি-রঞ্জিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আরও স্বামীজির কিছুকাল পূতসঙ্গের ফলে তাঁহার যে একটী ছবি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত কিছু পার্থক্য-বোধ হইলেই লেখককে সেইটী স্মরণ করাইয়া দিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

যাহার যেরূপ ধারণা, যাহার যে দিকে ঝোঁক, মহাপুরুষের জীবনা-লোচনাকালে সেই দিকটীই তাহার দৃষ্টিতে বিশেষভাবে নিপতিত হয়। সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বামীজিকে দরিদ্রনারায়ণ-সেবাব্রতপ্রচারক, জাতীয় ভাবের উদ্বোধক, সমাজসংস্কারক, প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণাকারী প্রভৃতি নানাভাবে বর্ণিত দেখিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটিকেই স্বামীজির সমগ্র ভাবের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। তাঁহাতে এই সকলগুলিই ছিল এবং আরও অনেক জিনিষ ছিল। স্বামীজির ধারাবাহিক জীবনচরিত-পাঠে তাঁহার

এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সমগ্র ভাবটী অনেকটা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং বর্ত্তমান গ্রন্থালোচনে ইহার বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে পাঠকগণকে গ্রন্থের আলোচনায় উন্মুখ জানিয়া এবং গ্রন্থের গুণদোষ বিচারের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা বিরত হইলাম।

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

ইতি—

উদ্বোধন কার্য্যালয়,
শ্রাবণ, ১৩২৬

নিবেদক
শুদ্ধানন্দ

অবতরণিকা

যে মহাপুরুষের পুণ্যচরিত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই নবরত্ন বাঙ্গলাদেশে ও বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ধন্য। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ বাঙ্গালাদেশের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি লোক-কল্যাণের জন্য দেহধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচার এবং অলৌকিক সদ্‌গুণরাশি প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন জড়বাদ ও নাস্তিকতার বিষম প্লাবনে এ দেশ ভাসিয়া গেল, যখন প্রাচীন ধর্ম্মের সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন, যখন খ্রীষ্টীয় মিশনরিরা পৌত্তলিক বলিয়া আমাদিগকে উপহাস এবং আমাদের দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতিকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তখন ধর্ম্মের অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া প্রাচীনের উপর লোকের একটা অভক্তি জন্মিয়া গেল এবং একে একে প্রাচীনভাব ও সংস্কারগুলি তাঁহাদের মন হইতে উৎপাটিত হইতে লাগিল। এই মহাযুগ-পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিভাশালী রাজা রামমোহন রায় প্রাচীন ধর্ম্মের সারাংশ অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। এই ধর্ম্মের উদার মত কিয়ৎপরিমাণে নাস্তিকতার দিক হইতে লোকের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু লোকে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম হইয়া সাম্যবাদের দোহাই দিয়া সামাজিক স্বাধীনতার নামে আহার-বিহার ও বিবাহাদি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন

করিল। ইহাতে নব্যতন্ত্রের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রাচীন ধর্ম্মের জীর্ণস্তূপের আশে পাশে যে সকল ব্যক্তি সন্দেহ-দোলায়িত চিত্তে অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকারে ঘুরপাক খাইতেছিলেন এবং কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া অন্তরে অন্তরে ঘোর শাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন সাম্যমন্ত্রবাদী খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মরাও দোষলেশশূন্য পূর্ণমানব নহেন। তখন ধীরে ধীরে লোকের মনের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর আছেন কি না বা হিন্দুধর্ম্মোক্ত সকল কথাই বিশ্বাসযোগ্য কি না—এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ ঘুচিল না। এমন কি পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত নাকি বলিয়াছিলেন, 'ও সব কিছু বুঝি না'। কিন্তু ইতোমধ্যে আর একদল থিয়োসফিষ্টদের ভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক ধরণে হিন্দুধর্ম্মের নবব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং সাহেবদিগের টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে গীতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দু' এক জন টোলের পণ্ডিতও বিজাতীয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইহা ভাল কি মন্দ সে কথায় প্রয়োজন নাই, তবে ইহা দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা তাহারই নির্ণয়ে সযত্ন হইয়াছিলেন। ইহাতে পুরাতন গ্রন্থাদির কতক গ্রহণ করিয়া ও কতক প্রক্ষিপ্তবোধে বাদ দিয়া একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। বঙ্কিমবাবু, শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দকে এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ইতোমধ্যে বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের জন্য এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন, ধর্ম্ম ও সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, অতিলৌকিক দেবমানবের কথা আর কি বলিব? ইনি বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মবিপ্লব

হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় আজ বাংলাদেশে এমন হিন্দুসংসার নাই যেখানে লোকে প্রাতঃ-সন্ধ্যা ভক্তিভরে তাঁহার নাম স্মরণ না করে এবং এমন গৃহ নাই যেখানে তাঁহার অন্ততঃ একখানিও প্রতিকৃতি না দেখা যায়। তাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র জগৎ ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইনি যখন প্রাণপণ সাধনা দ্বারা সকল ধর্ম্মের সত্যতা প্রদর্শন ও সমন্বয় বিধান করিলেন তখন বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত দলের মুখপাত্রগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিগণ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় বিজ্ঞানবাদী, হেষ্টী সাহেবের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দেশমান্য পণ্ডিতগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ধন্য ও বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ইনি স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়া দেখাইলেন যে, উপনিষদুক্ত নিরাকার ঈশ্বরও সত্য, আবার কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি সগুণ ঈশ্বরও সত্য। এমন কি, পুরাণোক্ত দেবদেবী-লীলা পর্য্যন্ত মিথ্যা নহে। এই মহাপুরুষের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভা-দর্শনে অনেকে এক্ষণে ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু দেখিব তাঁহার জন্মগ্রহণে ধর্ম্ম-জগতে কি নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার জীবনটী দেখিলেই হইবে না। তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত আর একটী জীবনও বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। সেটী হইতেছে পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন।

কারণ প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব-সমূহ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার জীবন হইতে বিবেকানন্দকে বাদ দেওয়া চলে না। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অলোকসামান্য পুরুষ জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের জুলিয়াস সীজার, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নাপলেয়ঁ প্রভৃতি ২।৪জন মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শক্তি-শালী পুরুষ বোধ হয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্গীত, শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য—এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাগ্মী, মেধাবী, কর্ম্মকুশল, ক্রীড়াকৌতুক-রহস্যনিপুণ, অমল-চরিত্র, আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ লোকশিক্ষক জগতে কখনও জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। সকল দিক হইতে এমন সুপাত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের সেই জন্য ধারণা আছে, বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত নাম শুধু তাঁহারই জন্য, তাঁহার মত শিষ্য লাভ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা অনেকেই প্রথমে স্বামীজির আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া শেষে তাঁহার গুরু'র সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। হইতে পারে স্বামীজির ন্যায় অদ্ভুত মনস্বী শিষ্য না থাকিলে হয়ত পরম-হংসদেবের নাম এত দিনে বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইয়া যাইত, কিন্তু যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, শিষ্যের শক্তিতেই গুরুর এত মহত্ত্ব তবে তাঁহাদের মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ না হইলে স্বামীজির ন্যায় গুণবান্ পুরুষ আর যাহাই হউন, যাহা হইয়াছিলেন তাহা কখনই হইতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে

বিবেকানন্দ স্বামীতে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বামীজি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'পরমহংসদেব ইচ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।' কারিগর ওস্তাদ, উপাদানও উত্তম, তাই জিনিষটী এত নয়নাভিরাম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ না থাকিলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য এত প্রচারিত হইত কি না যাঁহারা সন্দেহ করেন, অপর পক্ষে তাঁহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব না থাকিলে বিবেকানন্দও এরূপ বিশ্ববিখ্যাত হইতেন কি না সন্দেহ। দুইটি জীবন পরস্পরসাপেক্ষ,—উভয়কে একত্রে দেখিতে হইবে, নতুবা এ রহস্যের মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। গুরুকৃপা, সাধনা ও চরিত্রবলে সত্যের সন্ধান পাইয়া স্বামীজি দেশকে বিপথ হইতে প্রকৃত পথের দিকে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারকের ন্যায় করাল কুঠার হস্তে প্রাচীন সমাজের মূলোচ্ছেদ করা তাঁহার আদৌ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি জ্ঞানালোক-বিস্তার দ্বারা স্বতঃসঞ্জাত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সংস্কার-সম্পাদনের জন্য আপন উন্নত ও উদার হৃদয়ের প্রেরণায় স্বীয় মুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া অদ্ভুত ত্যাগের আদর্শ শীর্ষে বহনপূর্ব্বক হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, এদেশের প্রধান অভাব দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সংস্কার কিছুই হইবে না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন রাজনৈতিক আন্দোলন বা শাসক-সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ করিলেই এই দারিদ্র্য দূর হইবে না। ইহার জন্য দেশের লোককে স্বাবলম্বনপর করা প্রয়োজন। তিনি বুঝিলেন যে, এ দেশের লোকের শতাব্দীব্যাপী মানসিক ও নৈতিক জড়তা দূর করিতে হইলে ইউরোপ ও আমেরিকার কর্ম্মশীল জাতিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিলে ভিক্ষা ত কেহ দিবেই

না, পরন্তু লাঞ্ছনা ও অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য তিনি স্থির করিলেন আদান-প্রদান-নীতি অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের যাহা আছে তাহা ঐশ্বর্য্যশালী পাশ্চাত্য জাতিদিগকে দিব এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিব। এইরূপ বিনিময় দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে সৌখ্য ও সৌহার্দ্দের বন্ধনও দৃঢ়ীভূত হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্মবলে জগতে ভেদ, বৈষম্য, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি দূর হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইবে, সকলের মধ্যে আবার মৈত্রী, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার কিরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সর্ব্বজনসুবিদিত। কিন্তু তিনি নাম-যশের কাঙ্গাল ছিলেন না; সেখানে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মবীর ইংরাজের দেশে। ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক মহানুভব ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার ভাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া অনেক নূতন জ্ঞান জন্মিল। তারপর তিনি সমুদয় ইউরোপখণ্ড ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের রীতি-নীতি সন্দর্শন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন এবং তৎসাহায্যে ভারতীয় রীতিনীতির সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌টি বর্জ্জনীয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক বর্ষ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এ দেশের লোককে বিশ্ববাসীর আসরে দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই বিপুল পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক,

পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং আশা করা যায় কালে আরও সুদূরপ্রসারিত হইবে। তাঁহার আদর্শ অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেকে অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের অবতারণা করিতেছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। এমন কি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহার ভাবগুলির সাহায্যে আপনাপন সম্প্রদায়কে অধিকতর উন্নত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাতে মনে হয় ভারতে আবার এক নবীন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সে যুগের প্রবর্ত্তক বা প্রধান পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার ভাব ও আদর্শ জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বত্র অব্যাহতভাবে প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজেদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, আর উহা যতটা বিপথে চালিত না হইয়া ধর্ম্ম ও সৎ পথে চলে ততই ভাল।

স্বামীজি যে এইরূপ সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বজনীন সংস্কারকরূপে গৃহীত হইয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমাজসংস্কার বা রাজনীতিচর্চ্চা দ্বারা এদেশের উন্নতি সম্ভব নহে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, অহিংসা, নির্লোভতা, নিরহঙ্কার ও কর্ম্মযোগ চিরদিন যে দেশের আদর্শ, সে দেশ ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা উন্নত হইবে না। আর সে ধর্ম্ম কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা আর্য্য ঋষিদিগের প্রচারিত উদার বেদান্ততত্ত্ব। তাই তিনি বেদান্তের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষণা করিলেন—অমনি শত সহস্র ধর্ম্মপিপাসুহৃদয় তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বক্তা অনেক আছেন, পণ্ডিত অনেক আছেন, জ্ঞানী অনেক আছেন, কর্ম্মীও অনেক আছেন,

তথাপি এমনটি আর কখনও ঘটে নাই তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের অদ্ভুত পবিত্রতা, আত্মশক্তিতে অদম্য বিশ্বাস ও আচণ্ডালে অপকট প্রেম। এই তিনটি প্রধান গুণ অন্য সকল গুণের ভিত্তিভূমি হইয়া তাঁহার চরিত্রকে এত অনুপম করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এ গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গূঢ়রহস্য বা আধ্যাত্মিক অলৌকিকত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করি নাই। সে সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' অথবা শ্রীম-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত চতুর্থ ভাগ' পাঠ করিলে অনেকে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা শুধু সাধারণ হিসাবে লৌকিক জগতের দিক দিয়া তিনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরমহংসদেব তাঁহার সম্বন্ধে যে সব গুহ্য কথা বলিতেন তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবেন বা বিশ্বাস করিবেন কিনা সন্দেহ, আমরাও সেজন্য ঐসকল কথার অবতারণা করি নাই। তবে ঐসকল কথার উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্রের বিশেষত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে; দেখান যাইতে পারে এই অমানব পুরুষের গৌরবে সমগ্র জগৎ গৌরবান্বিত—ইনি মনুষ্যজাতির শিরোমণি।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই গ্রন্থপ্রণয়ন-উপলক্ষে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ উক্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামীজির ইংরেজী জীবনীর বঙ্গভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী তাঁহার 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে আবশ্যকমত ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং সর্ব্ব-শেষে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী এই গ্রন্থ যাহাতে কোনরূপ

অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট না হয় এবং সত্যঘটনা-পূর্ণ থাকে তজ্জন্য স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়াও অকাতরে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। এজন্য তাঁহাকে এস্থলে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমি স্বয়ং এই ব্যাপারে শুধু কাষ্ঠ-বিড়ালের কার্য্য মাত্র করিয়াছি বলিয়া মনে করি। ইতি

ভবানীপুর,
শ্রাবণ, ১৩২৬

গ্রন্থকার

স্বামী বিবেকানন্দ

সিমুলিয়ার দত্তবংশ

যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া নামক স্থানে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত ও পিতামহের নাম ৺দুর্গাচরণ দত্ত। নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাঁহার পিতা ও পিতামহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অনুরাগ একপ্রকার তাঁহাদের বংশগত ধারা।

দুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যায়ও তাঁহার সম্যক পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তদুপার্জ্জিত অর্থে দত্তবংশের যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল। দুর্গাচরণও আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ধনে মানে পিতার সমকক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। ধন মান যশঃ তাঁহাকে অধিকদিন আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণভার আত্মীয়স্বজনের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন এবং পাঁচ ছয় বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ৺কাশীধামে উপনীত হইলেন। সে সময়ে ৺কাশীধামে যাইতে হইলে

পদব্রজে বা নৌকাপথে যাইতে হইত, কারণ তখন এদেশে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। দুর্গাচরণের সংসারত্যাগের পাঁচ ছয় বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বারাণসীধামে যাইতেছিলেন। দেড় মাস পরে তাঁহারা বারাণসী পৌছিলেন। পথে নৌকার উপর খেলা করিতে করিতে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইয়াছিলেন এবং পুত্রবৎসলা জননী পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মজ্জমান পুত্রের উদ্ধারকল্পে ভাগীরথী-সলিলে ঝম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। সেদিন মাতা পুত্র উভয়েরই প্রাণনাশ হইত, কিন্তু বিধিকৃপায় নৌকার মাঝিমাল্লার যত্নে উভয়েই রক্ষা পান। যখন উহারা মাতা পুত্র উভয়কে জল হইতে তুলিল, তখন দেখা গেল, স্নেহময়ী জননী পুত্রের একখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন! বহুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের হস্তে ঐ দাগ ছিল।

৺কাশীধামে পৌছিয়া দুর্গাচরণ-পত্নী বহু দেবদেবী দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। দৈবক্রমে একদিন বৃষ্টি হওয়াতে তিনি ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া যান। জনৈক সাধু তাহা লক্ষ্য করিয়া "মায়ি গির্ গিয়া" বলিয়া দৌড়াইয়া আসিলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—কে এ সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় দুর্গাচরণ-পত্নীকে সযত্নে বহন করিয়া মন্দিরের সোপানে স্থাপিত করিলেন তখন পলকের জন্য চারি চক্ষুর মিলন হইল। উভয়েই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হা বিধিচক্র! সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং দুর্গাচরণ।

স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াই তিনি অস্ফুটস্বরে "মায়া হায়, মায়া হায়!" এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ত্যাগী পুরুষ ! রমণীও ত্যাগশীলা ! বহুদিনের পর অকস্মাৎ স্বামীর পবিত্র মুখদর্শনে দুর্গাচরণ-পত্নী আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাঁহাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।

তাহার পর মাতাপুত্রে ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। মাতা পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পুত্র খেলাধুলায় কয়েক বৎসর কাটাইয়া অবশেষে বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগ দিল।

সিমুলিয়ার সে দত্তবাড়ী আজও আছে। এখন আর সে পূর্ব্বের গৌরব নাই। সে দেউড়িতে দ্বারবান্ নাই, দাসদাসী, লোকজন, মক্কেল-মুহুরী, বন্ধুবান্ধবের নিত্য কোলাহল নাই, সে উৎসব, জাঁকজমক, ব্রতপূজা কিছুই নাই, শুধু বিপুলায়তন প্রবেশদ্বারটী জীর্ণচ্ছাদ, ভগ্ন-প্রাচীর অট্টালিকার লুপ্ত-গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি নীরবে বক্ষে বহন করিতেছে, আর অধিকাংশ জায়গাজমি এক্ষণে অপরের হস্তগত হইয়াছে। গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে যাইলে আজিও সে ভগ্নগৃহ প্রত্যক্ষ হয়। তখন ঐশ্বর্য্য ছিল, দত্তবংশের কীর্ত্তি-কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিত; দত্তবাড়ী চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীমধ্যে সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিত—সকলেরই সুপরিচিত ছিল। আর আজি—আজি সে বাটী এই প্রাসাদ-পরিপূর্ণ বিশাল কলিকাতা নগরীর একপার্শ্বে নগণ্য, ক্ষুদ্র, সাধারণের অপরিচিত। অহো! কালের কি বিচিত্র মহিমা!

যে দত্তবংশ একদিন মানসম্ভ্রমে সমুন্নত ছিল, পার্থিব সমৃদ্ধির হিসাবে আজি তাহার স্থান কোথায়!

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দত্তবংশ প্রকৃতই ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল।

দুর্গাচরণ-পুত্র বিশ্বনাথ শৈশবেই এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে, পরিবারস্থ সকলেরই মনে এইরূপ আশার উদয় হইল।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারে দ্বাদশ বৎসর পরে দুর্গাচরণ একবার জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে স্বগৃহে গমন না করিয়া এক বন্ধু-গৃহে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যেন তাঁহার আগমন-বার্ত্তা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচারিত না হয়। বন্ধু কিন্তু ঐ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া গোপনে দত্তবাটীতে সংবাদ দিয়াছিলেন। শ্রবণমাত্র দত্ত পরিবারের সকলে বন্ধুর গৃহে আসিয়া এক প্রকার জোর করিয়া সন্ন্যাসীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র বালক বিশ্বনাথ সাধুদর্শন করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে না লইয়া শুধু হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। বহুদিনের পর তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলের আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তাঁহারা আর ছাড়িয়া দিবেন না স্থির করিয়া সন্ন্যাসীকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাঁহাকে সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে একবার স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিয়াছে, সে কি আর পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে চায়? সন্ন্যাসী তিন দিবস চক্ষু নিমীলিত করিয়া জড়বৎ ঘরের এক কোণে বসিয়া

রহিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

এ বিশাল জগতে আবার একা! সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। স্ত্রী-পুত্রের কথা কি ক্ষণিকের জন্যও মনে উদিত হইয়াছিল?—কে বলিতে পারে? তিনি পুত্রমুখ দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে মুখ তাঁহার বৈরাগ্যদগ্ধ চিত্তপটে একটা ক্ষীণ রেখাও আঁকিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ। বরং মনে হয় তিনি আর তখন শিশুটীকে পুত্রজ্ঞান না করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে বিশ্বপিতার চরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন।

আর স্ত্রী?—সে পতিপ্রাণা স্বামি-বিরহিণীর দর্শন আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই! শুনিলেন এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মায়াবন্ধন ঘুচাইবার জন্য পরমেশচরণে প্রার্থনা করিতে করিতে সন্ন্যাসী দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

এ জীবনে আর কেহ কখনও তাঁহার দর্শন পায় নাই।

পিতামাতার পরিচয়

পুত্র বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত নানা ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ করত আইনব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি হাইকোর্টে এটর্নীগিরি করিলেও শীঘ্রই এরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মফঃস্বল হইতেও তাঁহার ডাক আসিত। তিনি প্রখর বুদ্ধি ও মেধা বলে ব্যবহারশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-পাঠে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং বিভিন্ন জাতির উন্নতি-অবনতির কারণানুসন্ধানে তিনি সাতিশয় কৌতূহল বোধ করিতেন। কিন্তু শুধু যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ও বহুদর্শিতা ছিল তাহা নহে, তিনি অতিশয় ভোগপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার মত ছিল, সংসারে থাকিতে হইলে বেশ ভালভাবে থাকা উচিত। যদি সংসার করিতে চাও ত পুরাদস্তরই কর, প্রাণ ঢালিয়া কর, সব সাধ মিটাইয়া, সব আকাঙ্ক্ষার শেষ করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ছাড়। আনো, ঢালো, খাও; যতদিন অর্থ আছে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাও; নিজে খাও, পরকে খাওয়াও, রাজার হালে চল। তাঁহার চালচলন ও জীবনযাপন-প্রণালীও ঠিক তাঁহার চিন্তা ও মতের অনুগামী ছিল। তিনি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করিতে জানিতেন না। প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং ব্যয়ও করিতেন অকাতরে। তাঁহার বিস্তর বন্ধু ছিল এবং খুব কম লোকই তাঁহার ন্যায় সহজে আলাপ জমাইয়া লইতে পারিত। সরসপ্রাণ বিশ্বনাথ এই সকল বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ও লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি নিজে

রন্ধনবিদ্যায় পটু ছিলেন। তাঁহার মত আদর-যত্ন করিয়া নানাবিধ ভোজ্যবস্তু দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতে অল্পলোকেই পারিত। তিনি প্রত্যহ স্বচক্ষে রন্ধনশালা পরিদর্শন করিতেন এবং একটা না একটা অভিনব আয়োজনের অবতারণা করিতেন। অতিথি-অভ্যাগতদিগকে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে নূতন প্রকারেব ত কিছু করাই চাই—তাও আবার স্বহস্তে।

তাঁহার আর একটী সখ ছিল—দেশভ্রমণ। আজি একস্থানে, কালি একস্থানে—কখন কোথায় যাইবেন কিছুমাত্র স্থির থাকিত না। হঠাৎ আসিয়া বলিতেন—চল অমুক স্থানে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানে কিছুকাল বাস করায় তিনি মুসলমান আচাব-ব্যবহারেব প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজনের প্রথা সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার পবিবারমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

মোটেব উপর বিশ্বনাথবাবু একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবনটী কাব্যেব ন্যায় মধুর ছিল।

কিন্তু তিনি যে শুধু সৌখীন বাবুটী ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার ছিল। পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ও পরোপকারার্থ তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি বহু আত্মীয়ের প্রতিপালক ও গরীবের মা-বাপ ছিলেন এবং কেহ তাঁহার সাহায্য চাহিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তাঁহার বাড়ীতে অনেক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেন এবং কেহ কেহ আবার নেশাভাঙ্গও করিতেন। নরেন্দ্র বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতার নিকট অনুযোগ করিলে তিনি বলিতেন, "জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি তখন

এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ করে তাদের পর্য্যন্ত দয়ার চ'খে দেখবি।" তাঁহার মত ছিল, জোর করিয়া লোককে সংশোধন করিতে যাওয়া অপেক্ষা যাহাতে সে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপন চরিত্র সংশোধন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। যতক্ষণ একটা ক্ষুদ্র বা নীচ বিষয়ে আসক্তি থাকে ততক্ষণ উচ্চ বস্তুর ধারণা হয় না। কিন্তু সে আসক্তির মোহ যখন আপনিই কাটিয়া যাইবে, তখন প্রাণে উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে পারে।

পরিবারবর্গের সুখবিধান ও আনন্দবর্দ্ধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পুত্রদিগের জন্য, বিশেষ জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাহারা সকলেই কালে মানুষ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল ও ফার্সি কবি হাফেজের বয়েৎসমূহের মধ্যে যেরূপ গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে আর কোথাও সেরূপ নাই। তিনি প্রত্যহ ঈশার পুণ্যচরিত ও হাফেজের কবিতাসকল পাঠ করিতেন এবং মাঝে মাঝে উহাদিগেব কিছু কিছু স্ত্রী-পুত্রদিগকেও শ্রবণ করাইতেন।

বিশ্বনাথ যে অবস্থায় থাকুন না কেন কখনও হৃদয়ের মহত্ত্ব হারান নাই। লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয় এ সকল তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। সাধারণতঃ তাঁহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও ব্যবহার অতি মধুর ছিল, কিন্তু তাঁহাতে গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালীও বড় সুন্দর ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আপনি আর আমার জন্য কি করিয়াছেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ

দর্পণের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যা, আর্শিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখ্‌গে, তা হ'লেই বুঝবি।' আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। পুত্র পিতৃবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন। আর এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ কোন একটি বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে দুই একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠাবসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—'নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য যথেষ্ট লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

'সংসারে কিরূপভাবে চলা উচিত' এই সম্বন্ধে নরেন্দ্র একদিন পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিও না' (Never show surprise)। বোধ হয় এই উপদেশানুসারে চলাতেই তিনি পরে স্বদেশে বিদেশে রাজার প্রাসাদে ও ভিখারীর পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ-পত্নী ভুবনেশ্বরীও সর্ব্বাংশে পতির অনুরূপা ভার্য্যা ছিলেন। পতির যেরূপ রাজতুল্য প্রকৃতি—পত্নীও তেমনি। যাঁহারা ভুবনেশ্বরী মাতাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার ন্যায় রমণীরত্ন এ জগতে দুর্ল্লভ। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী, কার্য্যকুশলা, সুরূপা ও দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং একাকী সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্য

অনায়াসে নির্ব্বাহ করিয়াও সূচীকর্ম্মাদি শিল্পাভ্যাসের জন্য সময় করিয়া লইতেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত স্বামী ও পুত্রগণের নিকট হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে শিখিয়া এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে তাঁহাকে বেশ শিক্ষিতা বলিয়াই বুঝা যাইত। তাঁহার ধারণাশক্তিও অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি রাজরাণীর তুল্য গরীয়সী ও অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন—মিতভাষিণী, গম্ভীরপ্রকৃতি, অথচ ব্যবহারে অতি মিষ্ট। অন্য রমণীরা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বা তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্যা মনে করিতেন।

ভগবান তাঁহাকে চারিটী কন্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি একটী পুত্র হইল না। ভুবনেশ্বরী সকালসন্ধ্যায় ইষ্ট আরাধনার সময়ে দেবতার নিকট একান্ত চিত্তে প্রাণের বেদনা জানাইতেন।

৺কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যেন তিনি বংশরক্ষার্থ একটী পুত্রের মানত করিয়া প্রত্যহ বীরেশ্বর শিবের অর্চ্চনা করেন। তদনুসারে বৃদ্ধা ক্ষীণযষ্টিসাহায্যে প্রত্যহ ৺বীরেশ্বর-মন্দিরে গিয়া পূজা ও অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী মাতা যথাসময়ে এ সংবাদ পাইয়া অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, ভুবনেশ্বরীর মনে পুত্রপ্রাপ্তির আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র শিবধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সহস্র সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও

শিবচিন্তায় বিরত থাকিতেন না। দেবাদিদেব কি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? যিনি চিরদিন ভক্তের অভীষ্টফলদাতা, তিনি কি এ প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন? ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপূজা, শিবমূর্ত্তিধ্যান ও শিবনামজপে তন্ময় হইয়া উঠিলেন। গৃহের সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—তাঁহার মুখের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, দেহ হইতে কি অপার্থিব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে!

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইল। একদিন ভুবনেশ্বরী মহাদেবের যোগীশ্বরমূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। সমস্ত দিন ঠাকুরঘরে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেই দিন রজনীযোগে ভুবনেশ্বরী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। নিশ্চয়ই কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহাব অন্তরের নিবেদন প্রভুর পাদপদ্মে পঁহুছিয়াছে, করুণানিলয় দেবাদিদেব তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, নতুবা এরূপ স্বপ্নের অর্থ কি? ভুবনেশ্বরী দেখিলেন যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! সেই রজতগিরিসন্নিভ বরবপু নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'শিব! শিব! শিব! এ কি স্বপ্ন না বিরাট্ সত্যজ্যোতিঃসাগরের একটা তরঙ্গ?' কে বলিবে বিশ্বেশ্বর কখন কি ভাবে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করেন!

নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নদর্শনের কয়েকমাস পরে নরেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী কৃষ্ণাসপ্তমীতিথিতে কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন পৌষ-সংক্রান্তি—মকরবাহিনী পূজার দিন, সুতরাং বাঙ্গলা দেশে ভারী ধুমধাম।

নবপ্রসূত শিশুর সহিত তদীয় পিতামহ দুর্গাচরণের অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, বুঝি দুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে পুনরায় এই কলেবরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক নামকরণের সময় কেহ কেহ বলিলেন, ছেলের নাম হউক দুর্গাদাস। কিন্তু ভুবনেশ্বরী শিশুর নেত্রমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—নাম? উহার নাম 'বীরেশ্বর'। এ নামে অবশ্য কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সেদিন হইতে শিশুকে বীরেশ্বর বা 'বিলে' নামে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বিলে ত হইল ডাকনাম, ভাল নাম কি রাখা যায়? স্থির হইল—নরেন্দ্রনাথ।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরে পড়িলেন। কিন্তু বালক বড় চঞ্চল। তাঁহার বিরুদ্ধে দিনরাত নানাবিধ শান্তিভঙ্গের অভিযোগ শুনা যাইতে লাগিল। মাতা পুত্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, পুত্র বড় একরোখা। যা ধরিবে তা করিয়া ছাড়িবে, কিছুতেই তাহাকে বশ করা যায় না। তাহার দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। বকুনি, ধমক, ভয়-প্রদর্শন—কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ

দেখিয়া মা বলিতেন, 'অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত'। ক্রোধ-প্রশমনার্থ অনেক সময় তিনি পুত্রের মস্তকে হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া দিতেন ও ভয় দেখাইয়া বলিতেন, 'যদি দুষ্টুমী করিস্ তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না'। বালক অমনি চীৎকার, ক্রন্দন ছাড়িয়া চুপ করিত।

অনেকদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্যেরা বৃদ্ধা ভুবনেশ্বরী মাতার নিকট এই সকল গল্প শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, স্বামিজী তা হলে ছেলেবেলায় বড় দুরন্ত ছিলেন?' মাতা উত্তর করিয়াছিলেন, 'কি বল গো! তাকে দেখ্বার জন্য দুটো ঝি অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো।' তিনি গল্প করিতেন, 'ছেলেবেলা থেকে নরেনের একটা মহৎ দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও রাগ হত তা হলে আর জ্ঞান থাকত না, বাড়ীর আসবাব-পত্র ভেঙ্গেচুরে তচ্‌নচ্ করত।'

বাটীতে সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে নরেন্দ্রনাথ অমনি দেখিতে ছুটিতেন। কোনরূপে তাঁহাকে তখন ধরিয়া রাখা যাইত না। সন্ন্যাসী কিছু চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থিত দ্রব্য আনিয়া দিতেন। ইহাতে অনেক সময় বড় মুস্কিল হইত। একবার তাঁহার নূতন কাপড় হইয়াছে, সেখানি পরিয়া তিনি সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত খুব আড়ম্বর করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে "নারায়ণ হরি!" "নারায়ণ হরি!" বলিতে বলিতে এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ আনন্দে তাঁহার পানে ছুটিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী একখানি ধুতি চাহিলেন। বালক অম্লানবদনে নিজ পরণের ধুতি খুলিয়া তাঁহাকে দিল। কিন্তু সে ছোট কাপড়, আধখানা কোমরে জড়াইতে কুলায় না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া তাহা পাগড়ী আকারে মাথায় পরিলেন ও বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সে সময়ে দত্তবাটীতে প্রায়ই পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বিশ্বনাথ বাবু সন্ন্যাসী ফকিরের প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং পরম যত্নে তাঁহাদের সেবা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে সন্ন্যাসী আসিলেই বালক নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর প্রস্থানকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বালক তাহা বড় গ্রাহ্য করিতেন না, যেই দেখিলেন নিকটে আর কেহ নাই, অমনি সম্মুখে যাহা থাকিত, জানালা গলাইয়া সন্ন্যাসীর নিকট ছুঁড়িয়া ফেলিতেন। পরিবারস্থ সকলকে এইরূপে জব্দ করিতে পারিলে বালক আনন্দে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেন।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সহিত নরেন্দ্রের মোটেই বনিত না। তিনি যখন-তখন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন এবং তাঁহারা তাড়া করিলে ছুটিয়া পলাইয়া নদ্দমা বা আঁস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন ও সেখান হইতে মনের সাধে নানাপ্রকার মুখবিকৃতি করিতেন। আর সেই মুখের ভঙ্গিমাই বা কি! আঁস্তাকুড়ে কেহ তাঁহাকে ছুঁইতে পারিত না, কিন্তু তিনি শুচি অশুচি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেন, আর মুখ ভেংচাইতে ভেংচাইতে বলিতেন, 'ধর্ না, ধর্ না।'

নরেন্দ্র জন্তু-জানোয়ার লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর—ইহারাই তাঁহার খেলার সাথী ছিল, ইহা ছাড়া তাঁহাদের বাটীর গাভীটিও তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার গলায় ফুলের মালা ও কপালে সিঁদুর লাগাইতেন এবং গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার সহিত নানাবিধ মিষ্টালাপ করিতেন।

শৈশবে তাঁহার একটি প্রধান বিস্ময়ের বিষয় ছিল—কলিকাতা সহরের অসংখ্য গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ। গাড়ীর শব্দ শুনিলেই তিনি লুকাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যাইতেন, আর অবাক হইয়া শকটশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। গাড়ীওয়ালা গাডোয়ান তাঁহার চক্ষে একটা উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হইত। তাহারা কি সোজা লোক! তাহাদিগকে কাহার না প্রয়োজন? তাঁহার মনে হইত, 'হায়, যদি আমি অমনি করিয়া কোচবাক্সে বসিয়া অশ্বযুগলের ত্রাসোৎপাদক চাবুক সপাৎ সপাৎ করিতে করিতে সহরের সমস্ত অজ্ঞাত প্রদেশে ঘুরিয়া আসিতে পারিতাম!'

একদিন গাড়ী করিয়া পিতামাতার সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন ও মা'র ক্রোড়ে বসিয়া পিতাকে অসংখ্য সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?' বালক ঝটিতি উত্তর করিল, 'সহিস কিংবা কোচোয়ান!' সহিস বা কোচোয়ান পদবী লাভ করাই যে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এ বিষয়ে বালকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই উচ্চ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি সদাসর্ব্বদা আস্তাবলে গিয়া দেখিতেন কে কি করিতেছে। সেইটাই তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। দিনের অধিকাংশ সময় সেইখানেই থাকিতেন; ঘোড়াগুলিকে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

ছেলেবেলায় রামায়ণের কথা শুনিয়া রামসীতার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। একদিন গুটিকতক পয়সা যোগাড় করিয়া পাড়ার একটি ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত বাজার হইতে একজোড়া মাটীর রামসীতা মূর্ত্তি আনিয়া নিজেদের বাটীর দোতলার ছাদের চিলে ঘরে খিল দিয়া দু'জনে ঠাকুরপূজায় লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের সম্মুখে উভয়ে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, এদিকে অনেকক্ষণ বিলেকে

দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ শব্দ। কোথাও বালকের সন্ধান নাই। এমন সময় কাহার মনে হইল ছাদের উপরটা একবার দেখা যাউক। ছাদে উঠিয়াই দেখেন সিঁড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া দ্বার খোলা না পাওয়াতে অবশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ব্রাহ্মণবালকটী বেগতিক দেখিয়া ভগ্নদ্বার-পথে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থির, নিশ্চল, মুদ্রিতচক্ষু! অবশেষে জোরে ঝাঁকুনি দিলে সেদিন তাঁহার চৈতন্য হয়।

ইহার দিনকতক পরে আর এক মজা হইল। নরেন্দ্রনাথ ত প্রায় আস্তাবলে থাকিতেন। সহিসের সহিত তাঁহার ভারী বন্ধুত্ব, কারণ সে একজন 'সবজান্তা' লোক। যখনই কোন গুরুতর মন্ত্রণা করিবার আবশ্যক হইত তিনি সহিসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন রামসীতার পূজার পর তিনি আস্তাবলে গিয়াছেন, কথায় কথায় সহিস গম্ভীরভাবে বলিল, 'বিবাহ করা বড় খারাপ।' ঐ ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণবশতঃ দাম্পত্য জীবনের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আপন অভিজ্ঞতাবলে সে বুঝিয়াছিল যে বিবাহ করিলেই সংসারে রাগারাগি, ঝগড়া প্রভৃতি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়, পোষ্যের সংখ্যা বাড়ে, পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিতে হয় এবং আরও নানা অসুবিধা ঘটে। এক কথায় বিবাহ হইলেই যে মানুষের সুখ স্বাধীনতা সব ঘুচিয়া যায় এইটী সে বিশদভাবে নরেন্দ্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইল, নরেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি কখনও বিবাহ করিবেন না; কিন্তু আর এক মুস্কিল উপস্থিত হইল। যে রাম-সীতাকে তিনি এত ভক্তি করেন, তাঁহারা যে বিবাহিত! মা'র কাছে শুনিয়াছিলেন, সীতারামের প্রেমের তুলনা নাই। সে প্রেম স্বর্গীয়

সুষমামণ্ডিত—অপার আনন্দময়। এখন সহিস যে উল্টা বলে! যে বিবাহ করে তার সুখ নাই! তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সাশ্রুনয়নে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। এক কথায় তাঁহার বাল্যস্বপ্ন যেন চূর্ণ হইতে বসিল! তিনি সীতারামের জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের চক্ষে জল দেখিয়া মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন—তারপর ফোঁপাইতে লাগিলেন। মা পুত্রকে কোলে লইলেন। বালক তখন একান্তে মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া তাঁহার মনের দুঃখ খুলিয়া বলিলেন। মা সব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিবপূজা কর।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে বালক একাকী ছাদের ঘরে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রাম-সীতার মূর্ত্তিপানে চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা পার্শ্বস্থ রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া শতখণ্ডে চূর্ণ করিলেন। পরদিন বাজার হইতে একটী শিবমূর্ত্তি আনিয়া রাম-সীতার আসনে বসাইলেন এবং আবার তাঁহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানাভ্যাসে রত হইলেন।

সন্ন্যাসী হইবার সাধ তাঁহার শৈশব হইতেই ছিল। বালক এক টুকরা গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মত কোমরে আঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াই-তেছেন। মা বলিলেন, 'এ কিরে?' বালক উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমি শিব হইয়াছি।' প্রাচীনেরা রহস্যচ্ছলে বলিতেন, ধ্যান করিলে মাথায় মুনি-ঋষিদের মত দীর্ঘ জটা বাহির হয় ও তাহা বটের শিকড়ের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত মাটির ভিতরে চলিয়া যায়। সরল বালক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাইতেন ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন মাথা হইতে জটা নামিয়া ভূতলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে কি না,

যখন দেখিতেন কিছুই হয় নাই তখন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন 'কৈ, ধ্যান ত করিলাম, জটা কোথায় হইল?' মা বলিতেন, 'বাছা, এক আধ ঘণ্টায়, কি এক আধ দিনে হয় না, অনেক দিন লাগে।'

এইরূপে বাটীর লোকেরা প্রায়ই দেখিতেন বিলে কখন একাকী, কখন বা প্রতিবেশী বালকগণের সহিত একত্রে ধ্যানে বসিয়া আছেন। বালক কি ভাবিতেন কে জানে! কিন্তু সময় সময় আপনভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে সহজে তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইত না।

একদিন এইরূপে ধ্যান চলিতেছে, সহসা একজন বালক দেখিল মেঝের উপর এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ। সে ভীত হইয়া সাপ, সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নরেন্দ্র ব্যতীত সকল বালকই ত্রস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে পলায়ন করিল। তিনি কিন্তু ধ্যাননিমগ্ন—সংজ্ঞাশূন্য। সাথীরা ডাকাডাকি করিতে লাগিল, তথাপি উত্তর নাই। তাহারা দেখিল মহা বিপদ। তাড়াতাড়ি তাঁহার পিতামাতাকে সংবাদ দিল। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন—ভয়ানক দৃশ্য! বালক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে; ঊর্দ্ধে আকাশে, ক্ষীণ চন্দ্র শোভা পাইতেছে—নিম্নে পৃথিবীর উপর অস্পষ্ট অন্ধকার। শব্দ করিলে পাছে সাপ কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে তাঁহারা চীৎকার করিতে সাহস করিলেন না। হঠাৎ সাপটী আপনিই সরিয়া গেল। এক মিনিট পরে আর তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্ষণকাল পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে নরেন্দ্র সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আমি ত কিছুই টের পাইনি।'

প্রসঙ্গক্রমে ইহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ের একটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটী তিনি নিজে এইভাবে বলিয়াছিলেন—'পঠদ্দশায় একদিন রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি;

ধ্যান শেষ হইয়া গেল—তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া আছি; এমন সময় দেখিলাম, ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করিয়া এক দেবতুল্য প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু এবং মস্তক মুণ্ডিত। মুখে অনির্ব্বচনীয় শান্তিচিহ্ন বিরাজিত। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কি বলিবেন, এইরূপ ভাব। আমিও প্রথমে অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু তারপর কেমন ভয় হইল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলাম। পরে কিন্তু মনে হইল, কেন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পলায়ন করিলাম, হয়ত তিনি কিছু বলিতেন।" যাহা হউক, তিনি আর কখনও সে মূর্ত্তির দর্শন পান নাই, বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই, তবে বলিতেন—'সে মূর্ত্তি খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের।'

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার নিদ্রা! তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় বিছানায় শুইবামাত্র নিদ্রিত হইতেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল উপুর হইয়া শয়ন করা। ঐ অবস্থায় নিদ্রিত হইবেন বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিন্দু দর্শন হইত। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত। তারপর হঠাৎ উহা তারাবাজীর ন্যায় ফাটিয়া গিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক আলো হইয়া যাইত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রত্যহ রাত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিত। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্য্যজনক—কিন্তু তিনি ভাবিতেন বুঝি সকলেরই ঐরূপ হয়। সেইজন্য কখন কাহাকেও ঐ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বহুদিন পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন

তখন কাহার কেমন ধ্যান হইতেছে জানিতে গিয়া এক সমবয়স্ক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা ভাই, তুমি কি ঘুমাইবার আগে একটা জ্যোতিঃ দেখ?' বালক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া থাকিল! কিন্তু আজীবন নরেন্দ্র নিদ্রার পূর্ব্বে এইরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তবে শেষ সময়ে আর এত ঘন ঘন ও এত বেশী স্পষ্ট হইত না।

পরমহংসদেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'এটা ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ।'

বহুবর্ষ পরে তাঁহার এক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে এই জ্যোতিঃ দর্শন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আজও বলিয়া থাকেন যে, স্বামীজি যেই তাঁহার কপালে হাত দিলেন অমনি বহির্জগৎ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার স্থলে তিনি শুধু এক অখণ্ড জ্যোতিঃ-সমুদ্র দেখিতে লাগিলেন।

এই জ্যোতিঃদর্শন গভীর ধ্যানের ফল। নরেন্দ্রের শৈশবাবস্থা হইতেই জ্যোতিঃদর্শন হইত শুনিলে স্বতঃই মনে হয় যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি অনেক ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য এ জন্মে ধ্যানটা যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

শিক্ষারম্ভ

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ একখানি কোরা ধুতি পরিয়া কোমরে খাঁকের কলম ঝুলাইয়া মাতুর বগলে পাঠশালায় গেলেন। প্রথম যেদিন পাঠশালায় যান সেদিন সকালে বাটীর পুরোহিত আসিয়া মাটিতে রামখড়ির আঁখর কাটিয়া তাঁহাকে শিখাইলেন—এটা 'ক', এটা 'খ'। নরেন্দ্রও বলিলেন—এটা 'ক', এটা 'খ'। কিন্তু দুই চার দিনের মধ্যেই এমন গুটিকতক অভিধান-বহির্ভূত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন যে, পিতামাতা আর তাঁহাকে ওরূপ শিক্ষালয়ে যাইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। পাঠশালা ছাড়াইয়া এক গুরুমহাশয়ের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হইল। পাঠশালাটি কিন্তু নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল; অনেকগুলি সঙ্গী জুটিয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে বসিয়া ভুষোর কালীতে তালপাতার উপর বিচিত্র রকমের লিখিবার ছাঁদ অভ্যাস করিতে বেশ আমোদ বোধ হইত। হঠাৎ এ সব ছাড়িয়া বাড়ীর গুরুমহাশয়ের শাসনটা প্রথম তাঁহার বরদাস্ত হইল না। কিন্তু তাঁহার পিতা কতকগুলি আত্মীয় বালককে তাঁহার পড়ার সঙ্গী করিয়া দিলেন। বাড়ীতেই একটা ছোটখাট পাঠশালার মত হইল।

চিরদিন তিনি মিষ্ট কথার বশ ছিলেন, কড়া কথা মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না—বাল্যেও এ স্বভাব ছিল। গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইয়া বা মারিয়া ধরিয়া তাঁহার নিকট পড়া আদায় করিতে পারিতেন না, যা কিছু করিতেন গায়ে হাত বুলাইয়া।

পোড়োদের মধ্যে তিনি শীঘ্রই দলপতির আসন অধিকার করিলেন। খেলাধুলাতেও সকলের অগ্রণী; পর্ব্ব-উৎসবাদি হইলে পড়াশুনা বন্ধ

করিয়া সমস্ত দিনরাত তিনি উৎসবের আমোদে মাতিয়া থাকিতেন। এক মকর-সংক্রান্তির দিন সুর ধরিলেন, সাথীদের লইয়া দল বাঁধিয়া গঙ্গায় যাইতে ও গঙ্গাপূজা করিতে হইবে। পিতার অনুমতি পাইলেন এবং খরচও মঞ্জুর হইল। তিনি সঙ্গী বালকদলকে লইয়া বাটী হইতে নিশান উড়াইয়া ফুলের মালা দুলাইয়া গঙ্গার দিকে চলিলেন, যেন একটা ছোটখাট শোভাযাত্রা। সারাপথ গাহিতে গাহিতে চলিলেন, 'জয় জয় সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'। পরে গঙ্গায় পৌছিয়া ফুল ও মালাগুলি ভক্তিভরে সলিলস্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ধ্যায় আবার সকলে একত্র হইয়া কলার খোলার ছোট ছোট নৌকায় দীপ জ্বালাইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিলেন; সে কি সুন্দর দৃশ্য! বালকদল সেদিন ঐরূপ শত শত দীপালোকে গঙ্গাগর্ভ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

শুনা যায়, নরেন্দ্রনাথের পড়া তৈয়ারী করিবার রীতি একটু নূতন ধরণের ছিল। গুরু মহাশয় প্রত্যেক দিনের পাঠ নিজে পড়িয়া যাইতেন—তখন নরেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিত—তাহাতেই তাঁহার পাঠ আয়ত্ত হইয়া যাইত। রাত্রিতে নরেন্দ্র এক প্রবীণ আত্মীয়ের (ভক্ত রামদত্তের পিতা) নিকট শয়ন করিতেন। এই ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানা ছিল এবং ইঁহার বিশ্বাস ছিল, কঠিন কঠিন বিষয়গুলি বাল্যকাল হইতেই মুখস্থ করাইলে বালকদিগের শিক্ষা খুব অগ্রসর হয়। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রতি রাত্রিতে নরেন্দ্রকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে নরেন্দ্র বৎসরাবধি কালের মধ্যে উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় সাত বর্ষ মাত্র।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নেতৃত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। সমবয়স্কদিগের সহিত খেলায় তিনি রাজা সাজিতেন। ছুটিতে ছুটিতে

পূজার দালানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে গিয়া বসিতেন। নীচের সিঁড়ির দিকে দেখাইয়া আর দু'জন সঙ্গীকে বলিতেন, 'তুমি হচ্ছ রাজমন্ত্রী, আর তুমি সেনাপতি, যাও ওখানে দাঁড়াও।' তাহার নীচের সিঁড়িতে সভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তারপর দরবার আরম্ভ হইত। কর্ম্মচারীরা একে একে ভূম্যবলুণ্ঠিতশিরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মন্ত্রি! রাজ্যের সংবাদ কি? প্রজারা বেশ সুখে আছে ত?' মন্ত্রী মহাশয় কখনও বলিতেন, 'আজ্ঞা হাঁ, প্রজারা পরম সুখে আছে,' কখনও বা বলিতেন, 'না মহারাজ, একজন দস্যু বড় উৎপাত করিতেছে'; তখন সেই অপরাধী দস্যুকে বিচারার্থ সভামধ্যে আনা হইত। যথারীতি বিচারান্তে সম্রাট আদেশ করিতেন, 'রক্ষিগণ! শীঘ্র দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।' অমনি রক্ষিবেশধারী দশ বার জন বালক সেই অপরাধী দস্যুকে বধ্যভূমে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইত, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ না করিয়া তীরবেগে দত্তবাড়ীর সদর দরজার দিকে ছুটিত। ক্রুদ্ধ রক্ষিদলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইত। দুপুর বেলা, বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতেছে, দেউড়ির ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। তাহাদের নিদ্রাচ্ছন্ন দেহের উপর দিয়া সশব্দে পলাতক অপরাধী ও রক্ষীর দল দৌড়াইত। তাহারাও চমকিত হইয়া উঠিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'দুর্ব্বৃত্ত বালকদের' শাস্তিবিধানের জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু বালকদিগের সহিত দৌড়ে না পারিয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিত। বালক নরেন্দ্র স্বস্থানে বসিয়া কৌতুক দেখিতেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেন; বোধ হয় ভাবিতেন— তাহারা তাঁহার কি করিবে? তিনি হচ্ছেন সম্রাট—দীন-দুনিয়ার মালিক!

ইহা ছাড়া তিনি আরও এমন অনেক খেলা খেলিতেন যাহাতে

একটু মাথা ঘামাইতে হয়। তখন কলিকাতায় সবে গ্যাসের আলো ও সোডা-লেমনেডের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনিও অমনি খেলা ঘরে গ্যাসের কারখানা ও সোডা-লেমনেড তৈয়ারী আরম্ভ করিলেন এবং নানা কল-কব্জা যোগাড় করিয়া খেলাঘরে রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বলেন—"কতকগুলো পুরোণো দস্তার নল, মেটে হাঁড়ী ও খড় লইয়া বাহির বাটীর উঠানে তিনি তাঁর গ্যাসঘর তৈরী করলেন।" খড়গুলি জ্বালাইলেই ধোঁয়া হইত; যখন তাহা নল দিয়া বাহির হইয়া উপরে উঠিত তখন বাল-বুদ্ধিবশতঃ তিনি ভাবিতেন যেন সারা কলিকাতা সহরের আলো ঐ গ্যাসে জ্বলিতেছে। সেই গ্যাসের কারখানায় যখন তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে সেই ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া থাকিতেন তখন এক মজার দৃশ্য হইত। যেন কত বড় একজন ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছেন! কথনও কথনও আবার নাক-সিঁটকাইয়া (ওটা বংশের ধরণ) বলিতেন—"নাঃ, এ কিচ্ছু হয়নি।" সঙ্গীদের বলিতেন, "আরও আগুণ দে, খুব ফুঁ লাগা—গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে।"

সে সময়ে বিশ্বনাথ দত্তের নিকট নানাজাতীয় মক্কেল আসিতেন। তাহার মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এ ব্যক্তি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সমুদয় বালিশগুলি উপরে উপরে সাজাইয়া তাহার উপর সটান লম্বা হইয়া হেলিয়া পড়িতেন এবং অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হুঁকা টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে 'ইয়া আল্লা,' 'খোদা, তুমিই সত্য' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিতেন ও যখন তামাকু সেবন করিতে ক্লান্তি বোধ হইত তখন সশব্দে একটি সুদীর্ঘ হাই তুলিতেন এবং কখনও কখনও বা সেই সঙ্গে 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লাহে' বলিয়া উচ্চ শব্দ করিয়া উঠিতেন। অন্যান্য মক্কেলগণ তাঁহার ঐ প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া

যেন দমিয়া যাইতেন ও হঠাৎ কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া নীরবে স্ব স্ব হুঁকায় গভীর মনোযোগ দিতেন। তাহার ফলে সেই বিস্তীর্ণ বৈঠকখানা গৃহটি কুণ্ডলায়মান ধূমপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

এই মুসলমান মক্কেলটী কিন্তু নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রও তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'চাচা' বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং তাঁহার পলাণ্ডুসুবাসিত মুখ হইতে পঞ্জাব আফগানিস্থানাদি দুর্গম দেশে উষ্ট্র, অশ্বগজাদি সাহায্যে বাণিজ্যযাত্রার সুদীর্ঘ কাহিনীসমূহ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। সে গল্পের আদি অন্ত ছিল না। কিন্তু শৈশবোচিত কৌতূহলবশতঃ তিনি সেই সব গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ অনর্গল বলিয়া যাইতেন—তিনিও বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সেই সব লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। মুসলমানটী আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দিতেন। নরেন্দ্রনাথও দ্বিধাশূন্য চিত্তে সেগুলি ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু অপর মক্কেলগণ (ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও সকলেই হিন্দু) ইহাতে শিহরিয়া উঠিতেন। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দু হইয়া মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য ভোজন! এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রষ্টাচার বালকের ভবিষ্যৎ দুর্গতি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভ্রুকুটীপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেন না। বিশ্বনাথ বাবু যখন গৃহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন তখন ব্যাপারটী বুঝিতে তাঁহার বাকী থাকিত না। কিন্তু তিনি নিজে আহারাদি বিষয়ে আচার-পালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন, সুতরাং পুত্রের এবম্বিধ আচরণে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতেন।

একদিন বড় মজা হইয়াছিল। বিষয়কর্ম্মের কথা উত্থাপিত হইবামাত্র নরেন্দ্র সেস্থান ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে গেলেন। তাঁহার

পিতা মক্কেলদিগের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তাহাদের সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন সেই অবসরে নরেন্দ্র কোথা হইতে ধাঁ করিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন ও সারি সারি যত হুঁকা ছিল তাহার প্রত্যেকটীতে মুখ দিয়া এক একবার ভুড়ুক করিয়া টানিলেন। মুসলমানের হুঁকাটী একটু বেশী আগ্রহের সহিতই টানিলেন, কারণ উহা থেকে বেশ খোশবায় বাহির হইতেছিল।

এরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। জাতিভেদ জিনিষটা বালক নরেন্দ্রের নিকট বড় দুর্ব্বোধ্য বোধ হইত। একজন আর একজনের সহিত খাইবে না কেন? ভিন্ন জাতি হইলেই বা দোষ কি? যদি জাতিভেদ না মানা যায় ত কি হয়? আকাশটা কি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, না মানুষ মরিয়া যায়? বালবুদ্ধিবশতঃ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুতগতি সকল মক্কেলের হুঁকা হইতে ধূম উদ্গীরণ করিলেন। কিন্তু কই, তিনি ত মরিয়া গেলেন না, বা পৃথিবীটা তো ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল না! তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন সব জিনিষ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এমন সময় বিশ্বনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কচ্ছিস্ রে?' পুত্র অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, 'দেখছি, জাত না মানলে কি হয়!' পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং 'বটে রে দুষ্টু!' বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।

আর একদিন যখন উপরোক্ত মুসলমানটি অন্যান্য মক্কেলের সহিত সম্রাট আকবরের গুণগ্রাম পর্য্যালোচনায় গভীরভাবে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে সহসা বিশ্বনাথ দত্তের বাটীতে এক মহা হুলস্থূল ব্যাপার সংঘটিত হইল। নরেন্দ্র অন্যান্য বালকের সহিত লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে হঠাৎ

পদস্খলিত হইয়া দোতলার সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া যান। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল, অনেক যত্ন ও চেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে বালকের চৈতন্য হইল। পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার বলিলেন যে আঘাত গুরুতর বটে, কিন্তু জীবনের কোন ভয় নাই। শুধু কপালের কিয়দংশ কাটিয়া গিয়াছিল; তাহার ফলে আজীবন তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে একটা দাগ ছিল।

পরমহংসদেব বলিতেন, 'যদি সেদিন ওই রকমে ওর শক্তি না কমে যেত, তাহলে ও যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলতো!'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতি শৈশব হইতেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বয়ঃক্রমের তুলনায় তিনি যথেষ্ট বাঙ্গালা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আবার সঙ্গীতেরও ভক্ত ছিলেন। সুতরাং যখন ভিখারী গায়কদল খোল বাজাইতে বাজাইতে গৃহদ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিত ও গান গাহিত তখন তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। একবার তাঁহাদের বাটির সন্নিকটে একস্থানে ঐরূপ একদল রামায়ণ-গায়ক পালা বিশেষ গাহিতে গাহিতে কয়েকটা পদ বিস্মৃত হইয়া অশুদ্ধভাবে গাহিতেছিল দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সে পদগুলি বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র যে বাল্যকালেই রামায়ণের শ্লোক ও পদের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শৈশবে তিনি যেখানেই রামায়ণগান হইত, শুনিতে যাইতেন, কারণ সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রকে তাঁহার আদর্শ পুরুষ বলিয়া বোধ হইত।

ভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্ভুতকর্ম্মা হনুমান তাঁহার অল্প শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তিনি হনুমানের দর্শনলাভের জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন—শুনিয়াছিলেন রাম-সেবককে তদ্গত চিত্তে ধ্যান করিলে নাকি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। একবার এক কথক কথকতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, হনুমান কদলীবনে থাকেন। ব্যস্তভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়?' কথক বালকের কৌতুকাবহ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'হ্যাঁগো, গিয়ে দেখ না।' সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার সময় নরেন্দ্রের মনে হইল যে বাটীর সন্নিকটেই কয়েকটা কদলীর ঝোপ আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃক্ষের তলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন এবং গভীর আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ হনুমানজীর দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল না তখন তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'ওরে বিলে, বোধ হয় আজ হনুমান প্রভুর কাজে অন্য কোথাও গিয়েছেন, তাই তাঁর দেখা পাস্‌নি।' ইহাতে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সোৎসাহে মহাবীর হনুমানের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। মহাবীরের মহচ্চরিত্র তাঁহার হৃদয়ে এত দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, এমন কি বেলুড় মঠে তিনি তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

শৈশবেই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সে সময়ের একজন দূরদর্শী প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, 'কালে এই ছেলে মস্ত লোক হবে।' ব্যাপারটা এইরূপ:—

১৮৬৯ সালে তদানীন্তন দত্তবংশের কর্ত্তা নরেন্দ্রের পিতামহ স্থানীয়

কালীপ্রসাদ দত্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত; শেষ মুহূর্ত্ত আগতপ্রায় জানিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলকেই তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন এবং বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে কেহ হউক তাঁহাকে একটু মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাক্, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ যখন কেহই একার্য্যে অগ্রসর হইল না, তখন ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নরেন্দ্র বৃদ্ধের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে গম্ভীরভাবে সেই বৃহদাকার পুস্তকখানি দুই হস্তে উঠাইয়া ধরিলেন এবং ধীর স্থির পরিষ্কার উচ্চ কণ্ঠে কয়েক পত্র পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অতীন্দ্রিয় লোকের সান্নিধ্যে প্রসারিত-দৃষ্টি বৃদ্ধ এই কয়েকটি কথা বলিয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিলেন, "ভাই, কালে তুই নিশ্চয়ই মস্ত লোক হবি।"

বালকের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে চিত্র বৃদ্ধের চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক দেখিবেন তাহা মিথ্যা হয় নাই।

বাল্যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বীজও তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। ছয় বৎসর বয়সের সময় একবার তিনি একজন সঙ্গীকে লইয়া চড়ক দেখিতে যান। চড়কতলা হইতে মাটির মহাদেব কিনিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গীটি কতকদূর আসিয়া পিছাইয়া পড়িল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিল। গাড়ীর শব্দে নরেন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিলেন যে সঙ্গের ছেলেটি একেবারে প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায়। বামহস্তের মধ্যে মহাদেবটি পুরিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সঙ্গীর জীবনরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। পথের লোকেরা বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ঘটনাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল যে কেহই বালকের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার সময় পায়

নাই। যাহা হউক বালকটি সে যাত্রা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। দর্শকবৃন্দের অনেকেই নরেন্দ্রের সাধুবাদ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পিঠ চাপড়াইলেন, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু তিনি গৃহে গিয়া মাতার নিকট ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে ভুবনেশ্বরী দেবী আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "বাছা, এই ত মানুষের মত কাজ। সব সময় এই রকম মানুষ হবার চেষ্টা কর্ব্বে।"

বিদ্যালয়ে

সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরেন্দ্র মেট্রপলিটান স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিখিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুলি ধরিলেন—'ও বিদেশী ভাষা, ও শিখিব কেন? তার চেয়ে আগে নিজের ভাষা ত শিখিলে ভাল হয়।' সকলে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কিছুতেই পরের ভাষা শেখা হইবে না। সকলে বলিল, 'আজকাল ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার, না শিখিলে চলে না' ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অটল। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতাকে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে সফলকাম হইলেন না। কয়েক মাস গত হইলে নরেন্দ্র কি জানি কি ভাবিয়া বৃদ্ধের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দিন স্থির করিলেন ইংরাজী পড়িতে হইবে, সেদিন হইতে এরূপ আগ্রহের সহিত উহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেল। বিধাতার কি অদ্ভুত চক্র! যে ভাষায় উত্তরকালে তিনি সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা না হইলে প্রতীচ্য জগতে হিন্দুধর্ম্ম এত শীঘ্র ও সহজে বিস্তারলাভ করিতে পারিত না, এক কথায় যে ভাষার সাহায্যে তিনি জগতে আপনার আগমনোদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার প্রথম সোপানেই বিজাতীয় ভাষা বলিয়া তাহার উপর বিরাগ!

মাতার নিকটে তিনি প্রথম ইংরাজী বর্ণমালা ও ইংরাজী শব্দ শিক্ষা

করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের গল্পও শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। এই গল্পশ্রবণের ফলেই তিনি পরে একজন উত্তম গল্পকথক হইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ইজের পরিয়া স্কুলে যাইতেন এবং অস্থিরতা-বশতঃ প্রত্যহই উহার কিয়দংশ ছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইত। তিনি বাল্যকালে এত অস্থির ছিলেন যে, কখনও বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন না। দাঁড়ান ও বসার মাঝামাঝি যত রকম উপায়ে শরীরকে রাখা যাইতে পারে তাহারই কোন না কোন একটা ভঙ্গীতে তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় বালক ছিলেন। খেলিবার সময় খেলায় এত মত্ত হইতেন যে, সে সময়ে অন্য কোন বিষয় আর চিত্তে স্থান পাইত না। মার্ব্বেল খেলা, ছুটাছুটি, হুটোপাটি, লাফান, ঘুসোঘুসি—এইগুলি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এ সকল বিষয়ে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন এবং প্রত্যহ পরদিন কি কি খেলা হইবে তাহার 'প্রোগ্রাম' করিতেন। বালকদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই সকলে মধ্যস্থ মানিত। তিনি নিজে বিবাদ-বিসংবাদ আদৌ পছন্দ করিতেন না, বিশেষতঃ যাহারা ক্রীড়ার নিত্যসঙ্গী তাহাদিগের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। যদি কখনও ঐরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত তবে নিজে প্রতিপক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে ছুটিয়া গিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ঐরূপ করিতে যাইয়া নিজেকেও দু এক ঘা প্রহার সহ্য করিতে হইত, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই সকলকে স্বমতে আনিতে পারিতেন। তিনি পরবর্ত্তী-কালে শিষ্যদের বলিতেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলুম,

তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আস্‌তে পারতুম রে!”

চলতি ভাষায় ডানপিটে শব্দের যে অর্থই হউক, বাস্তবিক শৈশব হইতে তাঁহার চরিত্রে আত্মশক্তি-অনুভব-জনিত প্রকৃত নির্ভীকতা ও তৎসহ ভাবী চঞ্চলতার আভাস প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু বালসুলভ চপলতা ব্যতীত আর একটি মহত্তর বৃত্তির অঙ্কুর এই সময়ে তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল, সেটি হইতেছে দয়া। তাঁহার জননী পুণ্যশীলা ভুবনেশ্বরী মাতা অতিশয় করুণহৃদয়া ছিলেন; নরেন্দ্র তাঁহার করুণকোমল হৃদয়খানি স্বীয় জননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ভুবনেশ্বরী মাতার সহৃদয়তার পরিচয় এখানে দিব। নরেন্দ্রের পিতা একটি বন্ধকী সম্পত্তি সহধর্ম্মিণীর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছিলেন। দৈন্যদশাগ্রস্ত এক মুসলমান পরিবার ঐ সম্পত্তি তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের সময় অর্থসংগ্রহ না হওয়াতে তাহারা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইয়া কাতরভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত ভুবনেশ্বরী মাতার নিকট নিবেদন করিলে তাহাদের অনশনক্লিষ্ট মলিন বদনের ভয়-চকিত কাতর দৃষ্টি উচ্চান্তঃকরণা রমণীর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি তাহাদের করুণ কাহিনী শ্রবণে বিগলিতচিত্ত হইয়া দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধকী দলিলখানি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে সর্ব্বাংশে জননীর অনুরূপ ছিলেন। সমবয়স্ক ক্রীড়া-সাথী সকলকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে তাহাদিগের মধ্যে তিনি কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক হইত। প্রত্যেকেই ভাবিত যে তাহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। ক্রীড়াকালে যদি কাহাকেও পীড়িত

যা আহত হইতে দেখিতেন তাহা হইলে তখনই ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। একবার তিনি কুড়ি পঁচিশ জন বালককে সঙ্গে লইয়া গড়ের মাঠে কেল্লা দেখিতে যাত্রা করেন। তাহাদের মধ্যে একজন কিছু অসুস্থ বোধ করিতেছিল, কিন্তু বালকগণ সত্য সত্যই যে তাহার কোন পীড়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে লইয়া নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। সে বালকটি কিন্তু ক্রমশঃই ক্ষীণশক্তি ও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিল। স্বামিজীও অন্যান্য বালকগণের ন্যায় কলহাস্যে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে যাইতে-ছিলেন, সহসা তাঁহার মনে হইল হয়ত পিছনের বালকটি সত্যই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে; অমনি তিনি ফিরিলেন। কিঞ্চিদ্দূর আসিয়াই দেখিলেন বালকটি পথের ধারে বসিয়া পড়িয়াছে ও প্রবল জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন তিনি ধরাধরি করিয়া একখানি গাড়ীতে চাপাইয়া স্বয়ং তাহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এই গুণেই বালকেরা এত সহজে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

এই সময়ে আর এক দিবস তিনি একটি বালক ও তাহার মাতাকে বিষম দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করেন। একখানি গাড়ী হঠাৎ তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়ায় তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্রগতিতে একহস্তে বালকটিকে ধরিয়া টানিলেন ও অপর হস্তে তাহার মাতাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে উভয়েই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল। পরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার সময় তিনি কখনও নিজের বিপদ গ্রাহ্য করিতেন না।

সহপাঠীদিগকে তিনি যেমন প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহারাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাল্যজীবনের যাহাতে পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। অশ্রান্ত চঞ্চলতা, ক্রীড়া, কৌতুক, রহস্য, হাস্য-পরিহাস প্রভৃতি যে সকল কমনীয় ভাবে শৈশবজীবনের পরিপুষ্টি, তাহা তাঁহাতে সম্যক্ বিকশিত হইয়াছিল। ক্লাসের প্রত্যেক বালককে তিনি এক একটা উদ্ভট নামে সম্ভাষণ করিতেন। ঐ সকল নাম কতকটা তাঁহার কল্পনাপ্রবণ-মস্তিষ্কপ্রসূত এবং কতকটা আবার বিবিধ উপকথা ও উপন্যাসাদি হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি বাল্যকালে ডানপিটে ছিলেন। এই ডানপিটে স্বভাব বা দুরন্তপনার জন্য বালকমহলে সকলেই তাঁহার অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিল। পড়াশুনার দিকে তাঁহার ঝোঁক সামান্যই ছিল। কারণ প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিতে তাঁহার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। বাকী সময়টা তিনি কেবলই নব নব ক্রীড়া-কৌতুক উদ্ভাবনে রত থাকিতেন। জল-খাবারের পয়সা জমাইয়া হয় লজেঞ্জস, না হয় মার্ব্বেল অথবা নূতন ব্যাট কি বল কিনিতেন, এবং খুব অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলায় পটু হইয়াছিলেন। বছরের নয় মাস এই ভাবে খেলিয়া-বেড়াইয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতে খুব পড়ায় মন দিতেন। এই সময়ে ইতিহাস, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিরাগ ছিল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পিতার অনুরূপ ছিলেন। অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহার পিতা বলিতেন, 'ও ত মুদীর দোকানের বিদ্যে।' প্রথম কয়েক বর্ষ মেট্রপলিটানে অধ্যয়ন-কালে তিনি অজীর্ণরোগে ভুগিয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন,

কিন্তু যে সকল খাদ্য এই পীড়ায় অনিষ্টকর, বালবুদ্ধিবশতঃ সুবিধা পাইলেই তাহা খাইতেন।

ক্লাসে কোন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষ, বিশেষতঃ ঠাকুরদা, সন্ন্যাসী ছিলেন কি না। সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অনুরক্তি বাল্যাবধি কখনও তাঁহার হৃদয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে—এটি তাঁহার বরাবর মনে মনে ছিল এবং শৈশবসুলভ আবেগ-বশতঃ সঙ্গীদিগের নিকট বলিতেন, 'বড় হইয়া আমি সন্ন্যাসী হইব, অমুক অমুক জায়গায় যাইব, অমুক অমুক করিব—ইত্যাদি।' কখন কখনও ছেলেরা একত্র হইয়া পরস্পরের হাত দেখিত। কিন্তু হাত-দেখার কাজটি তাঁহারই প্রায় একচেটিয়া ছিল। নিজের হাত দেখিয়া তিনি বলিতেন, 'আমি সাধু হইব, এতে আর কোন ভুল নাই, আমার হাতে সন্ন্যাসী হবার খুব বড় এক চিহ্ন আছে।' এই বলিয়া তিনি কতকগুলি কররেখা তাহাদিগকে দেখাইতেন। একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ওগুলি নাকি সন্ন্যাসযোগের পরিচায়ক। নরেন সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া অন্যান্য সকলেই সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। তারপর কথা হইত যে বড় বড় সাধুরা কি করেন। কল্পনাবলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনে একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেন, 'সন্ন্যাসী এই করে, এই করে।' কিন্তু নরেন্দ্র বলিতেন, 'না না, তোরা কিছু জানিস্‌নে, বড় বড় সাধুরা সব হিমালয়ের উপর থাকেন, সে সব জায়গায় মানুষে যেতে পারে না। তাঁদের সঙ্গে কৈলাস পর্ব্বতের উপর রোজ মহাদেবের দেখা হয়। তোরা যদি সন্ন্যাসী হতে চাস তবে ঐ সব পাহাড়ে বা গহন জঙ্গলে গিয়ে ঐ রকম মহাত্মাদের পায়ে পড়্‌তে হবে। তারপর তাঁরা এক একটা লম্বা বাঁশের উপর

শুতে দেন। যদি তার ওপর শুয়ে কেউ ঘুমুতে পারে তারপর গেরুয়া পরিয়ে চেলা করে নেন।'

আহা! শৈশবের কল্পনা কি সরল!

নরেন্দ্রের এক সহপাঠীর বাটীতে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। যখন আর কিছু ভাল লাগিত না তখন ঐ চাঁপাগাছের ডালে পা বাঁধাইয়া হাত ছাড়িয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুল খাইতে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। এমন কি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও তাঁহার ঐরূপ করিতে ভাল লাগিত। চাঁপাফুল শিবের প্রিয়, নরেন্দ্রও চাঁপাফুল ভালবাসিতেন। একদিন তিনি উপরোক্ত প্রকারে দোল খাইতেছেন এমন সময় ঐ বাটীর কর্ত্তা—উক্ত সহপাঠীর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা—নরেন্দ্রের গলা শুনিতে পাইয়া সেথায় উপস্থিত হইলেন। অতটুকু ছেলেকে ঐরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় গাছের উচ্চশাখায় দোদুল্যমান দেখিয়া ও চাঁপাফুলগুলির শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত-সমস্তভাবে বালককে গাছ হইতে নামিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে ঐ গাছে চড়িতে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, ও গাছটায় চড়্‌লে কি হয়?' বৃদ্ধ বলিলেন, 'ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি আছে, তার ভয়ানক চেহারা, নিষুতি রাতে সে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়!' ঐ অদ্ভুত ভূতের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভূতেরা কি করে, ঐরূপ বেড়াইয়া বেড়ান ছাড়া তাহাদের আর অন্য কাজ আছে কি না, ইত্যাদি। এমন সময় বৃদ্ধটি বলিলেন, 'আর যারা ঐ গাছে চড়ে সে তাদের ঘাড় মট্‌কে দেয়।' নরেন তখন কিছু বলিল না। কিঞ্চিৎ পরে বৃদ্ধ ঔষধে ধরিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যেই বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন অমনি নরেন্দ্র

পুনরায় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন,—উদ্দেশ্য ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাইলে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বলিল, "না ভাই, সাবধান, অমন কর্ম্ম করিস্ নি, তা হলে সে তোর ঘাড়টা মট্‌কাবে।" তাহাকে সত্য সত্যই ভীত দেখিয়া নরেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তুই ছোঁড়া কি আহাম্মক! একজন একটা কথা বলে গেল বলেই কি সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকরদা বুড়োর ঐ বেহ্মদত্যির কথা সত্যি হত তা হলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচ্‌ড়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

এটা অবশ্য একটা বালকের গল্প মাত্র। এখনও হয়ত অনেক বালকের সম্বন্ধে এরকম বা এর চেয়েও ভাল গল্প ঢের শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার উত্তরটি—'একজন বলেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে?' এই ভাবটা তাঁহার চিরদিন ছিল। তিনি বিনা বিচারে অন্ধের মত কোন জিনিষ বিশ্বাস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শেষ জীবনে বলিতেন—

"বইয়ে লেখা আছে অতএব সত্য, এমন ভাবে কোন জিনিষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। অমুক লোক বলিয়াছে অতএব সত্য, এই বলিয়া কোন জিনিষকে হঠাৎ সত্য বলিয়া মানিও না। সত্যটা যে প্রকৃত কি, তাহা নিজে জানিবার চেষ্টা কর।"

উপরোক্ত সহপাঠীর পিতা নরেন্দ্রকে বড় স্নেহ করিতেন এবং ভবিষ্যতে তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। একদিন নরেন্দ্রকে উপরোক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষ হইতে দোল খাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন— 'তুমি ছোক্‌রা বুঝি সমস্ত দিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রকম করে

খেলে বেড়াও! কখন পড়াশুনা কর কি?' নরেন্দ্র বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ, আমি দুই-ই করি—খেলি, আবার পড়িও।' তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইল—ভূগোল, অঙ্ক, কবিতা-আবৃত্তি সব বিষয়ের পরীক্ষা হইল। নরেন্দ্র চট্‌পট্‌ সব জিনিষের উত্তর দিলেন। পরীক্ষক ভদ্রলোকটি অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন, 'বটে? বেশ বেশ—আচ্ছা, তোমায় দেখে কে? তোমার বাপ ত লাহোরে।' নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, 'হাঁ, বাবা লাহোরে আছেন বটে, কিন্তু মা ত এখানে আছেন। তিনিই আমায় যা যা করতে হবে বলে দেন, আর আমি নিজেই পড়ি।' ভদ্রলোকটি প্রকাশ্যে আর অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, 'হাঁ, তুমি কালে নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। আমি প্রাণভরে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি।' তাহার পর হইতে তিনি বরাবর নরেন্দ্রের খোঁজখবর রাখিতেন ও বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার জীবনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন।

নরেন্দ্রের যখন সাত আট বৎসর বয়স তখনকার একটি ঘটনায় তাঁহার সাহসের খুব পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে একদিন তিনি কয়েকজন সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়া মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌএর ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ আলি সা'র পশুশালা দেখিবার জন্য চাঁদপাল ঘাট হইতে নৌকারোহণ করেন। ফিরিবার সময় একজনের শরীর অসুস্থ হওয়ায় নৌকার মধ্যে বমি করিয়া ফেলে। ইহাতে মুসলমান মাঝিরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিবার জন্য জেদ করিতে থাকে, কিন্তু বালকেরা অন্য কাহারও দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলে এবং তৎপরিবর্ত্তে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। মাঝিরা তাহাতে অসম্মত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে উহা সাফ্‌ করিবার জন্য অনুযোগ করিতে থাকে এবং বালকেরা উহা অস্বীকার করায় তাহাদিগকে

গালিগালাজ ও নানাবিধ কটূক্তি করিতে থাকে। অবশেষে ঘাটের কাছে আসিয়া উহা সাফ্ না করিলে নৌকা ঘাটে লাগাইবে না, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে। তখন বচসা হইতে হইতে ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতির উপক্রম হইল এবং ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। বালকেরা মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি ইত্যবসরে যেই নৌকাখানি একটু ঘুরিয়াছে, অমনি মস্ত এক লাফ দিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, দূরে দুইজন শ্বেতকায় পুরুষ বায়ুসেবনার্থ ময়দানের দিকে চলিয়াছে। অমনি তিনি ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাদের নিকটে গিয়া ভাঙ্গা ইংরাজীতে আপনাদের অবস্থা জানাইলেন। ঐ দুই ব্যক্তি পল্টনের গোরা, তখন তাহারা তত প্রকৃতিস্থ ছিল না, মদ্যপান করিয়া টলিতে টলিতে আসিতেছিল। কিন্তু নরেন্দ্রের সরল বিশ্বাস ও সাহস দর্শনে তাহারা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিল—'All right my boy, all right my boy, don't you worry.' নরেন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র হস্তে তাহাদের একজনের হস্ত ধারণ করিয়া তাহার অসংযত পদবিক্ষেপ যথাপথে পরিচালনে সাহায্য করিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাঝিমাল্লা ও বালকেরা সকলেই অবাক্। একে সাহেব, তায় গোরা, তায় আবার মাতাল! মাঝিরা ত তাদের দর্শনমাত্রেই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর যখন তাহারা হস্তস্থিত বেত উঠাইয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল, "আভি লেড়্কা লোগ্কো উতারনে দেও, নেহী তো মার ডালেগা।" তখন 'আচ্ছা সাহেব, বহুত আচ্ছা সাহেব, আভি সাহেব' বলিতে বলিতে মাঝিরা তখনই ঘাটে নৌকা ভিড়াইল ও আর সকলে ভয়ে যে যাহার নৌকায়

সরিয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সেদিন এরূপ প্রীত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তাহাদের সহিত থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সাহসের পরিচয়স্বরূপ তাঁহার বাল্যজীবনের আরও দুই একটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্-রূপে ভারতভ্রমণে আগমন করেন সেই বৎসর কলিকাতা বন্দরে বিলাত হইতে 'সিরাপিস্' নামক ড্রেড্‌নট্ জাতীয় একটা বড় মানোয়ারী জাহাজ আসিয়াছিল। তখন নরেন্দ্রের বয়স ১১ বৎসর। নরেন্দ্রের সঙ্গীরা ধরিয়া বসিল যে ঐ যুদ্ধের জাহাজখানা দেখিয়া আসিতে হইবে। জাহাজ দেখিতে হইলে বন্দরের বড় সাহেবের পাশ চাই, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি চৌরঙ্গীতে বড় সাহেবের আফিসে গেলেন। সেখানকার চাপরাশী তাঁহাকে বালক দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল, 'সরে পড় না এখান থেকে, অতটুকু মানুষ আবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! লড়ায়ের জাহাজ দেখ্‌তে যাবে! পালাঃ!' তাহার এবম্প্রকার সম্ভাষণে নরেন্দ্র প্রথমে একটু থতমত খাইলেন, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই তাঁহার ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিলেন পিছন দিকে একটা লোহার সরু সিঁড়ি রহিয়াছে। মনে হইল ঐখান দিয়া বোধ হয় বড় সাহেবের কামরায় যাওয়া যায়। অমনি ধীরে ধীরে চাপরাশীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, ঠিক জায়গাতেই আসিয়াছেন; তখন পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে অনেক লোক, সকলেই

সাহেবের নিকট আপন আপন আর্‌জী লইয়া উপস্থিত। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যেই তাঁহার পালা আসিল অমনি সাহেবের সম্মুখে তাহা ধরিলেন। সাহেবও দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র উহা লইয়া আর পূর্ব্বপথে না গিয়া সোজা পথ দিয়া নীচে নামিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বারবান ত তাঁহাকে দেখিয়াই অবাক, জিজ্ঞাসা করিল, "তুম্ ক্যায়সে উপর মে গিয়া থা ?" তিনি মুখভঙ্গীসহকারে "হাম্ যাদু জান্‌তা" এই বলিয়া তাহার উপর এক কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ এই সময়কার আর একটি ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"সিমলা পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে একটি 'জিম্‌ন্যাষ্টিকে'র আখড়া ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্ব্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক মিত্রজার সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন একটি 'ট্রাপিজ' (দোল্‌না) খাটাইবার জন্য বালকেরা অশেষ চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ 'নাবিক'কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল।

তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিলেন এবং সাহেব উহার পদদ্বয় গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে এমন সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে সম্মুখস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে শয়ন করাইয়া শীঘ্র একজন ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত নবগোপাল বাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরূপে বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।"

সকল প্রকারে তিনি আদর্শ বালক ছিলেন। অন্যান্য বালকেরা

যেমন খেলাধুলা করে তিনিও সেইরূপ করিতেন, বরং অন্যান্য বালক অপেক্ষা একটু বেশী রকমই করিতেন। কিন্তু নিভৃতে তাঁহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশে একটা উচ্চতর ভাবের ধারা সদাই প্রবাহিত হইত। দেশ কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা কখনও কখনও ব্যক্ত হইয়া পড়িত। তখন তিনি আর বালক নহেন—বোধ হইত যেন যুগযুগান্তরের জ্ঞানরাজ্যের একজন পুরাতন পথিক। এই জ্ঞান-ধারা আমরা প্রকটিত দেখি তাঁহার শৈশবধ্যানে বা তন্ময়ত্বে, দেব-বিশেষের প্রতি অনুরাগে, সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সন্ন্যাস-জীবনের আকাঙ্ক্ষায়। ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার পরিণত জীবনের আভাস সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।' তিনি আপনার মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করিতেন এবং এমন অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেন যাহা তাঁহার সমবয়স্ক শিশুদিগের সমক্ষে কখনও উপস্থিত হইত না বা হয় না। সে জিনিষগুলি তাঁহার ভিতরকার—নিজস্ব। অন্তরের গূঢ়শক্তি যে অনুক্ষণ আত্মপ্রকাশের জন্য একটা পথ খুঁজিতেছে—ইহা শৈশবের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও তিনি প্রায়ই অনুভব করিতেন। তিনি যে বাহিরে এত চঞ্চল ছিলেন, এটা সেই অন্তর্যুদ্ধের ফল। আনন্দের আশায় সেই শক্তি তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি অবয়বে ছুটাছুটি করিত এবং খেলাধুলা প্রভৃতি বহির্ব্বিষয়ে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু বৈরাগ্যসিদ্ধ পুরুষের মন বাহ্য বিষয়ে কত আনন্দ পাইবে? তিনি যে রস খুঁজিতেছেন, যে আনন্দ-পারাবারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সে ত বাহিরে নাই, সে যে ভিতরেই আছে! তাই তিনি যখন ধ্যানে তন্ময় হইতেন তখনকার তৃপ্তির নিকট খেলাধুলার তৃপ্তি যেন অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

পূর্ব্বে নিদ্রাবেশের প্রাক্কালে যে সকল অতীন্দ্রিয় দর্শনের

কথা বলিয়াছি সে সকল দর্শন বরাবর হইতেছিল, কিন্তু তাহা ছাড়া আর একটির উল্লেখ এখানে করিব। ধ্যানকালে প্রথম প্রথম তিনি জোনাকির আলোর ন্যায় বিন্দু বিন্দু আলোককণা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু পরে দেখিতেন যেন একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্য হইতে একখানা রশ্মিপূর্ণ মেঘ উড়িয়া আসিতেছে; ক্রমে সেটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত ও সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করিত। এই জ্যোতিঃ-দর্শনের সহিত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বাক্যে প্রমাণিত হয়।

পিতামাতার নিকট শিক্ষা

সন্তানের জীবনের উপর পিতামাতার প্রভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা সুবিদিত। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সাধারণতঃ বালকেরা পিতার নিকট হইতে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের আদর্শ এবং মাতার নিকট হইতে হৃদয়বৃত্তি ও নৈতিক আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই সিদ্ধান্তের ন্যূনাধিক ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার বিদ্যাবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনা-শক্তিকে এতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, অন্য কোনও লোককে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না কিন্তু যদি কখন পিতার কোন কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ না হইত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃমত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। এমন কি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পথ-প্রদর্শক পরমহংসদেবকেও তিনি প্রথম প্রথম অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করেন নাই, এবং যেখানেই তাঁহার সহিত মতের অনৈক্য হইত সেই-খানেই স্পষ্টবাক্যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই মত-বিরোধকে কেহ যেন আত্মগর্ব্বপ্রসূত প্রতিকূলাচরণ বলিয়া মনে না করেন। ইহা স্বমত-পোষণার্থ অন্ধ বিদ্রোহিতা নহে, কিন্তু প্রকৃত সত্যপরায়ণতা,—সত্যের জন্য যুক্তির সহিত যুক্তির সংঘর্ষ। তিনি প্রতি পদে বিচার করিয়া চলিতেন, বিচার ব্যতীত কাহারও বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যাহা স্বীয় বিচার ও যুক্তিপ্রমাণের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং যাহা প্রতিকূল

মনে হইত তাহার বিরুদ্ধে আপনার সমুদয় যুক্তিতর্ক নিঃশেষে প্রয়োগ করিতেন। এই যে স্বভাব—ইহা তাঁহার পিতারই শিক্ষার ফলে গঠিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশসাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনায় জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের আবশ্যক হয়, সেই সকল বিষয়েই তিনি পুত্রের সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিতেন এবং সর্ব্বদাই পুত্রকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিতেন। আপন মত ঘাড়ে চাপাইয়া উহার ভারে কোমল শিশুবুদ্ধিকে পিষ্ট করিলে যে তাহা ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেই জন্য স্মৃতিশক্তির পরিচালনা দ্বারা কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করাকেই তিনি শিক্ষা মনে করিতেন না;—যদ্দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ় হয় তাহাকেই জ্ঞানার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামিজী এইরূপে পিতার নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের মূলসূত্রগুলি লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্কীর্ণতার পরিধি অতিক্রম করিয়া উদার দূরদৃষ্টিতে সত্যকে অবলোকন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক জিনিষের শুধু উপরিভাগ না দেখিয়া তলভাগ প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উন্মেষিত হইয়াছিল, এবং পিতৃ-সাহায্যে তিনি জটিল যুক্তিতর্কের বহু-বিস্তৃত জালের মধ্য হইতে সারভাগ নিষ্কাশন ও তাহাকে অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লোকসমক্ষে স্থাপন করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসাদি সৎসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, এবং যে শিক্ষা দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও লৌকিক ব্যবহারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের জ্ঞান সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ শিক্ষা তিনি পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব সত্তার সহিত যে শিক্ষার সম্বন্ধ

বা পরিচয় নাই এরূপ শিক্ষা বা এরূপ চিন্তা ও জ্ঞানকে বিশ্বনাথবাবু নিতান্ত লঘুজ্ঞান করিতেন। বোধ হয় সেইজন্যই নরেন্দ্রনাথও ধর্মসম্বন্ধে মোটামুটি একটা প্রচলিত মত বা অন্ধবিশ্বাস এবং বস্তুতন্ত্রহীন দার্শনিক যুক্তিবাদের পরিবর্তে সজীব ও সাক্ষাৎ অনুভূতির এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং তাহাই লাভ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথবাবুর অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ছিল। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জাতি বা বংশ দ্বারা লোকের মর্যাদা নির্দ্ধারণ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না, যাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া পাইতেন তাহাকেই আদর ও সম্মান করিতেন। পরম্পরাগত জাতীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদিকেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তদ্বিষয়ে একটা গৌরব অনুভব করিতেন। নরেন্দ্র বাল্যজীবনে পিতৃ-প্রকৃতির এই সব বিশেষত্ব বিশেষ অভিনিবেশসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতার প্রত্যেক ভাব তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বহু বিষয়ে নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক টান ছিল জননীর উপর। জননীকে তিনি যথার্থ দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। সুখে দুঃখে, বাল্যে যৌবনে, সংসারে সন্ন্যাসে, স্বদেশে বিদেশে, সামান্য অবস্থায় এবং সম্মান ও যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়াও কখন তাঁহার কথা বিস্মৃত হন নাই। মাদ্রাজে অবস্থানকালে একবার কোন সূত্রে জননীর সাংঘাতিক পীড়ার

সংবাদ পাইয়া এতদূর কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না টেলিগ্রামে তাঁহার নিরাময়-সংবাদ পাইয়াছিলেন ততক্ষণ তাঁহার চিন্তা-বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই প্রশান্ত হয় নাই। শেষ জীবনে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "যে মাকে সত্য সত্য পূজা করিতে না পারে সে কখনও বড় হইতে পারে না।" তিনি একবার অনেক ভাবিয়া গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঋণী।"

ভুবনেশ্বরী মাতা পুত্রদিগকে সতত এই উপদেশ দিতেন—"আজীবন সত্যপথে থাকিও, পবিত্র হইও, নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিও এবং কখনও অপরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না বা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। খুব শান্ত হইবে কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।"

'স্বাধীনতা রক্ষা করা' যে অতিশয় মহৎ বস্তু তাহা নরেন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি উত্তরকালে কখনও অপরকে উপদেশ দিবার সময় জোর করিয়া নিজের মত গলাধঃকরণ করাইতেন না বা তাহাদিগকে আপন পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি শুধু পথ নির্দ্দেশ করিতেন, ও উচ্চ উচ্চ ভাব প্রদান করিতেন, তারপর যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহা গ্রহণ বা কার্য্যে পরিণত করুক।

বাল্যকালে নরেন্দ্র মাতার নিকট কোন কথা গোপন রাখিতেন না। মাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া ভাল হউক, মন্দ হউক, যখন যাহা করিতেন, দেখিতেন বা শুনিতেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে তাহা না শুনাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মেট্রপলিটান স্কুলে অধ্যয়নকালে একদিন ক্লাসের একটি বালকের কিম্ভুতকিমাকার

আচরণে ছেলেরা অত্যন্ত আমোদ বোধ করিতেছিল। শিক্ষক বালকটিকে ভৎর্সনা করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক বরং নির্লজ্জের ন্যায় উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্লাসের অন্যান্য বালকের পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র নিকটেই ছিলেন। তাঁহাকে ঐ হাসিতে যোগ দিতে দেখিয়া শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এমন ভাবে তাঁহার কান মলিতে লাগিলেন যে অবশেষে কর্ণ হইতে অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল। অপমানিত, ব্যথিত নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পুস্তক লইয়া ক্লাসের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এই নৃশংস শাসনবিধি প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিক্ষককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'আমি জানিতাম তুমি একজন মানুষ, এখন দেখিতেছি তুমি একটা পশু।' তারপর তিনি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করিলেন। অন্য বালকেরাও তাহাদের প্রণয়াস্পদ, দলপতি ও সর্ব্ববিষয়ে প্রধান সহপাঠীকে এবম্প্রকার অপমানিত হইতে দেখিয়া বিষম উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষককে সমুচিত তিরস্কার করায় সকলেই শান্ত হইল। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে মেট্রপলিটান স্কুল হইতে দৈহিক দণ্ডবিধান-প্রণালী উঠিয়া যায়।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে আর একজন শিক্ষক ভূগোল পড়ায় ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে প্রহার করেন। নরেন্দ্র শিক্ষককে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, 'আমার ভুল হয় নাই, আমি ঠিকই বলিয়াছি।' ইহাতে শিক্ষক আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হাতে

সপাসপ কয়েক ঘা বেত্রাঘাত করিলেন। নরেন্দ্র নীরবে সহ্য করিলেন। ক্ষণকাল পরেই শিক্ষক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন তাঁহার নিজেরই ভ্রম হইয়াছে। তখন নরেন্দ্রের নিকট তিনি আপনার ভ্রমস্বীকার করিলেন। তদবধি আর কখনও তাঁহাকে সামান্য ছাত্রজ্ঞানে উপেক্ষা করেন নাই।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই নরেন্দ্র গৃহে গিয়া জননীর নিকট বিবৃত করেন। জননী তাঁহার বেদনায় সান্ত্বনা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাছা, যদি তোমার ভুল না হইয়া থাকে তবে ইহাতে কি আসে যায়? ফল যাহাই হউক না কেন, সর্ব্বদা যাহা সত্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা করিয়া যাইবে। অনেক সময় হয়ত ইহার জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি সত্যকে কখনও ত্যাগ করিও না।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নরেন্দ্র মাতার এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। অনেক সময় এজন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক সময় প্রিয় ও নিকটতম বন্ধুদিগের সহিতও মনান্তর হইয়াছে, তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে তিনি কখনও এক পদ বিচ্যুত হইতেন না।

আরও একটি উপদেশ তিনি এই সময়ে শিখিয়াছিলেন এবং আজীবন পালন করিয়াছিলেন। সেটি হইতেছে এই—"জীবনে মরণে কখনও কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইও না"।

নরেন্দ্রের যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স (১৮৭৭ খৃঃ) তখন একবার তাঁহার পিতা মধ্য-প্রদেশে রায়পুর নামক স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন। এই সময়ে নরেন্দ্র মেট্রপলিটানের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর রায়পুর গমনের কয়েক মাস পরে

তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণও তথায় গমন করিলেন। তখন কেবল নাগপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন ছিল। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত ট্রেণে যাওয়া চলিত, কিন্তু তাহার পর গো-শকট ব্যতীত সেই দীর্ঘপথ অতিক্রমের অন্য উপায় ছিল না। এক পক্ষেরও অধিক-কাল ক্রমাগত গো-যানে যাইতে হইত। পথের দুই পার্শ্বে বিচিত্র বৃক্ষলতা-ফল-পুষ্প-শোভিত বিবিধ-বনবিহঙ্গ-কাকলী-পূরিত নিবিড় অরণ্য ও বিন্ধ্যাচলের গগনস্পর্শী শৃঙ্গমালা। 'ধীর মন্থরগতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থানে উপস্থিত হইল যেথানে পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।' বনস্থলীর অপূর্ব্ব শোভা-সন্দর্শনে নরেন্দ্রের প্রাণে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল। পর্ব্বত-পৃষ্ঠ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—একদিকে পর্ব্বতগাত্রের শিখর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাটলের মধ্যে 'মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন অনন্তের ভাবে এমন তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্য সংজ্ঞার এককালে লোপ হইল।' তিনি বলিতেন, "কতক্ষণ যে ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ বলেন, "প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম।"

রায়পুরে স্কুল ছিল না, সুতরাং নরেন্দ্র অধিকাংশকাল পিতৃ-

সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। তাহার ফলে তিনি প্রত্যহ বিবিধ নূতন শিক্ষালাভ ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতেছিলেন। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ের মামুলী শিক্ষা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বনাথবাবু কিরূপ সযত্নে পুত্রের মনোবিকাশ-সম্পাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রচলিত প্রথামত পুস্তক কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে পুত্রকে নিযুক্ত না করিয়া তিনি তাহার সহিত চিন্তার আদানপ্রদান দ্বারা উচ্চভাবের বীজ বপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার জন্য অনেক সময় পিতাপুত্রে ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া যাইত, ফলে কখনও পিতা, কখনও বা পুত্র জয়লাভ করিতেন। নরেন্দ্র-জননী পুত্রের বিজয়লাভেই সমধিক আনন্দিত হইতেন।

ইহা ছাড়া বিশ্বনাথবাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। ইহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় আলোচিত হইত নরেন্দ্র তাহা স্থির হইয়া শ্রবণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তৎসম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মতামতও ব্যক্ত করিতেন। বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে অনেক সময়ে তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এইরূপ একজন পিতৃবন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে বহু গদ্য ও পদ্যাংশ আবৃত্তি করিয়া এরূপ স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "বালক, একদিন না একদিন তোমার নাম আমরা শুনিতে পাইব।" যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে স্বামীজির বঙ্গসাহিত্য-রচনায় দক্ষতা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন ঐ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন সাহিত্যিকের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সার্থক হইয়াছিল।

তিনি আবাল্য এরূপ আত্মনির্ভরশীল ছিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে

কাহারও অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করিতেন না। তিনি যত বড়ই পণ্ডিত, জ্ঞানী, বয়োবৃদ্ধ বা সম্মানার্হ হউন না কেন, বালক নরেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিবার যো ছিল না। যদি কেহ কখনও বালক ভাবিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেন তবে আর তাঁহার নিস্তার ছিল না। একবার তাঁহার পিতার একজন বহুদিনের বন্ধু কোন বিষয়ে তাঁহাকে উপহাস করিয়া ঈষৎ অবহেলার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে সে ব্যক্তির উপর চটিয়া গিয়া ভাবিতে থাকেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমার পিতা আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন না, আর এ লোকটা আমায় তুচ্ছজ্ঞান করে!' তেজে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার মত কতকগুলি লোক আছেন যাঁদের ধারণা—বয়স কম হইলে বুঝি বুদ্ধি-বিবেচনাও কম হয়; এটা কিন্তু নিতান্ত স্পর্দ্ধা ছাড়া আর কিছু নয়।' তিনি এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

এইরূপে বয়সে সুকুমার হইলেও বুদ্ধি ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ দিন দিন প্রবীণত্ব লাভ করিতেছিলেন।

দুই বৎসর রায়পুরে যাপন করিয়া বিশ্বনাথবাবু সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নরেন্দ্র তখন সর্ব্বাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিজের প্রতি তখন তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, শরীর বেশ পুষ্ট ও সবল হইয়াছে এবং সমবয়স্কদিগের তুলনায় যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুই বৎসর বাহিরে বাহিরে থাকায় শিক্ষকেরা তাঁহাকে প্রথমে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অতিকষ্টে 'বিশেষ অনুমতি' (special permission)

পাইয়া তিনি ভর্ত্তি হইলেন। তারপর তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং অনায়াসে তিন বৎসরের পাঠ এক বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং মেট্রপলিটানের মধ্যে একমাত্র তিনিই সে বৎসর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পিতার নিকট হইতে স্বামীজি একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক প্রদর্শনীতে মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় (boxing competition) প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি মনোজ্ঞ রৌপ্যনির্ম্মিত প্রজাপতি উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নীও ঐ প্রদর্শনীতে মখমলের উপর সূচীকর্ম্মের জন্য সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পান।

বাল্যজীবনের শেষ কথা

নরেন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন বয়সের অনুপাতে তাঁহার বিদ্যাসঞ্চয় নিতান্ত সামান্য হয় নাই। সমগ্র পাটীগণিত ও উচ্চতর গণিতের কিয়দংশ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের বহু পুস্তক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস—এইগুলি তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তকের কীট ছিলেন না—রঙ্গ-তামাসা, আমোদ-প্রমোদ পড়াশুনা অপেক্ষা কম ভালবাসিতেন না। অভিনব ক্রীড়াকৌতুক উদ্ভাবনের জন্য তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিতেন।

নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট রন্ধনবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। 'সকলের চেয়ে ভাল রাঁধিব' এইরূপ একটা জেদ তাঁহার বরাবর ছিল। খেলার সাথীদিগের নিকট অবস্থানুসারে এক আনা দুই আনা চাঁদা লইয়া মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করা তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। খরচার বেশীর ভাগ অবশ্য তিনিই দিতেন এবং পাকের কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, তবে অন্যান্য বালকেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত। পোলাও, মাংস, নানাপ্রকার খিচুড়ী ও অন্যান্য বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করা হইত। রন্ধন অবশ্য খুব ভালই হইত। কিন্তু তিনি খুব ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া মাংস প্রভৃতিতে অতিরিক্ত লঙ্কা দিতেন।

এই সময়ে বালক নরেন্দ্রের নবোদ্ভিন্ন জ্ঞানচক্ষু সদা জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে মনের আহার অন্বেষণ করিতেছিল। রায়পুরে তিনি

দাবাখেলা শিখিয়াছিলেন এবং ভাল ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলাতেও জয়লাভ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হয়। তিনিও অমনি তদনুকরণে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বাটীর লোক ও পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট এক আনা দর্শনী-মূল্য আদায় করিয়া এই নূতন সখ মিটাইবার খরচা যোগাড় করিতে লাগিলেন। তিনি সকল রকম ক্রীড়ায় আমোদ পাইতেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করিয়া তৎসাহায্যে সকলকে ছবি-দেখান হইতে নৌকাচালান, অসিচালনা—কিছুই বাদ ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সঙ্গীতে। তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ; অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মিষ্ট ছিল, তাহার উপর শিক্ষা ও সাধনাগুণে উহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। *

তিনি আবাল্য কিরূপ তেজস্বী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার একস্থানে থিয়েটারের অভিনয় হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ আদালতের এক পিয়াদা রঙ্গমঞ্চের উপর গিয়া এক প্রধান অভিনেতাকে একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া বলিল, 'আমি আইন ও

---

* সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার পিতা মাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজি বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি গাহিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীদিগের ভজনগান একবারমাত্র শুনিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

আদালতের হুকুম অনুসারে আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।' সভামধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন সতেজ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও, যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাক গে। এরকম করে সব লোককে বিরক্ত করবার মানে কি?" সকলেই সেই তীক্ষ্ণ স্বর শুনিয়া চিনিল, সে সুস্পষ্ট আদেশবাণী আর কাহারও নহে—নরেন্দ্রের। অমনি বিংশতি-কণ্ঠে চীৎকার উঠিল, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, শীগ্‌গির বেরোও।' যাহারা নিকটে ছিল তাহারা নরেন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "বাহবা ভায়া—বাহবা, তুমি না থাক্‌লে আজ সব পণ্ড হত।"

এইরূপ তেজস্বিতার জন্যই তিনি সকলের এত প্রিয় ছিলেন। খেলাধুলা ও দুষ্টামিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেমানুষির ভিতরেও মনুষ্যোচিত তেজ ও দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি প্রতিবেশিগণের সকলেরই স্নেহভাজন ছিলেন। বড় হউক, ছোট হউক, উচ্চজাতি হউক, নীচজাতি হউক, সকল পরিবারের সহিত তিনি একটা না একটা সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ চৌদ্দ-পনর বৎসরের বালক অপর পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু নরেন্দ্রের এরূপ সঙ্কোচভাব বিন্দুমাত্র ছিল না। প্রতিবেশীরা সকলেই যেন তাঁহার আপনার লোক ছিলেন। তিনি কাহাকেও পিসী, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও খুড়ী, কাহাকেও মামী, কাহাকেও দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এমন কি একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককেও তিনি মাসী বলিয়া ডাকিতেন। কাহারও নিকট তাঁহার লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না। যে বাটীতে যাইতেন তাহাই যেন তাঁহার নিজের বাটী। এইরূপে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই

তাঁহাকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন এবং তিনিও নিকট আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাদিগের সহিত সরল হাস্যালাপ করিতেন, আবার তাঁহাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া বিপদে সাহায্য ও সান্ত্বনা দান করিতেন।

গল্পবর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। 'আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু' বা ঐরকম একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প বর্ণনা করিয়া কল্পনাপ্রবণ বাল্যসখাদিগের সরল প্রাণে কৌতূহলের তুফান সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল।

বাস্তবিক তিনি সর্ব্ববিষয়ে চূড়ান্ত বালক ছিলেন—সহৃদয়, তেজস্বী, প্রখরবুদ্ধি, উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, খেলাধূলায় আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত, যে কোন নূতন বিষয় দেখিবার ও শুনিবার জন্য ব্যগ্র এবং যে কোন বাধাবিঘ্ন অতিক্রমে উৎসাহশীল ও উদ্যোগী। এবিষয়ে তিনি আমাদের দেশের সাধারণ বালকদিগের মত 'মুখবোজা ভালমানুষ'টি বা 'সাতচড়ে কথা কয় না', 'নড়ে ভোলা' গোছের ছিলেন না। ঠিক সাহেবদের ছেলের মত,—কর্ম্মক্ষম, চঞ্চল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দীপ্ত হুতাশনের মত তেজঃপূর্ণ।

———

কলেজে

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়ার অবসান হইল। যে সকল সঙ্গীর সহিত নিত্য নূতন ক্রীড়া-কৌতুক অনুসন্ধানে রত থাকিতেন, এক্ষণে তাহাদের অনেকেরই নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাজনিত আনন্দের মধ্যেও তিনি দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। 'হায়! যাহাদিগের সহিত এতকাল আমোদপ্রমোদে কাটিল, যাহাদিগকে তিনি কত অদ্ভুত অদ্ভুত আদরের নামে সম্ভাষণ করিতেন, যাহারা তাঁহার নেতৃত্বে কত সুখ ও গৌরব অনুভব করিত, এক্ষণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! সেই বিদ্যালয় গৃহ—যাহা তাঁহার ক্রীড়াশব্দে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই ক্লাস—যেখানে তিনি সকলের প্রথম ছিলেন—সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কোমলহৃদয় নরেন্দ্রের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এখন কলেজে পড়িতে যাইতেছেন, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইতে হইবে, আর ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিবেন না, সৈনিকদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দূর দূর স্থানে 'মার্চ্চ' করিয়া যাইতে বা কৃত্রিম রণ-অভিনয় করিতে পারিবেন না—এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যথার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং তিনি নূতন জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যে শীঘ্রই আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পরবৎসর উহা ত্যাগ করিয়া জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে

ভর্ত্তি হইলেন। কলেজে প্রবেশের পর দুই বৎসর নরেন্দ্র পাঠাদিতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিলেন এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের অনুশীলনে রত হইয়া রচনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সমধিক উন্নতিলাভ করেন। Logic (ন্যায়) ও Philosophy (দর্শন) খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় রচনা, বক্তৃতা ও কথোপকথন শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিশ্রম করিয়া শীঘ্রই এ সকল বিষয়ে কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। বিদ্যার্জ্জন দ্বারা মনোমন্দির ভূষিত করিতে হইবে—এখন হইতে ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল।

ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বহুদিন হইতে সঞ্চিত ছিল। একবার মেট্রপলিটান স্কুলে ছাত্রগণের পারি-তোষিক বিতরণ-উপলক্ষে একটী সভা হয়, সেই সময় একজন শিক্ষকেরও বিদায় গ্রহণ করিবার কথা ছিল। নরেন্দ্রের সহপাঠীরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিল যে ঐ শিক্ষককে একটি বিদায়-অভিনন্দন দিতে হইবে; নরেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। সেদিন বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ভীক নরেন্দ্র সপ্রতিভ-ভাবে সকলের সমক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষকের স্থানান্তর-গমনে ছাত্রদিগের হৃদয়ে কিরূপ ক্লেশ হইতেছে তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করিলেন। ইহার বহু দিন পরে সুরেন্দ্রবাবু স্বামীজির সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "He was the greatest public orator India had ever known." (ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় বক্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই।) কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্র বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিতেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই বাক্‌পটু ছিলেন,—অভ্যাস না করিলেও বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন

সন্দেহ নাই।, সুবক্তা হইতে গেলে যে সকল গুণের আবশ্যক তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি, সুললিত অথচ মেঘমন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি, সুচারু বচনবিন্যাস ও আবৃত্তিপ্রণালী দ্বারা শ্রোতার চিত্তাকর্ষণের ক্ষমতা—সকলই তাঁহার ছিল।

যাঁহারা কলেজে নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে তিনি নিজের ক্ষমতা উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন। দেশী বিদেশী সব অধ্যাপকই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেন, 'এই বালকের মধ্যে প্রভূত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এমন দিন আসিবে যেদিন সমগ্র জগৎ তাহার পরিচয় পাইবে।'

দুই বৎসর পরে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ (এফ, এ,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে লাগিলেন এবং আর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল, পড়িতে সুরু করিলেন। ইতিমধ্যে—অর্থাৎ বি, এ, পাশ করার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি নানা সাংসারিক গোলযোগে ও বিষম অন্নকষ্টে পতিত হন। সুতরাং বি, এল, পাশ করিবার সুযোগ আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই (বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করার সময়ে) তাঁহার মনোরাজ্যে বিষম চিন্তা-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। সে বিষম অন্তর্ঝটিকা পিতৃবিয়োগে প্রবলতর রূপ ধারণ করে, কিন্তু পরিশেষে পরমহংসদেবের পদাশ্রয়ে এ ঝটিকা প্রশমিত হয় এবং তিনি সন্দেহ-তরঙ্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; এখানে শুধু সংক্ষেপে তাহার একটু

আভাস প্রদত্ত হইল। ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশের পর হইতে অর্থাৎ ১৮ বৎসর হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। যে বিরাট শক্তি শীঘ্রই সভ্যজগতে তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিবামাত্র সে আর ক্ষুদ্র রক্ত-মাংসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না—আত্মপ্রকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই দেখা যায় এই বয়ঃসন্ধিকালই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়। এই সময়েই তাঁহারা সাধারণ ও স্বীয় অসাধারণ গন্তব্যপথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 'কোন্ পথে যাই, কোন্ পথে গেলে ইষ্টলাভ—সত্যলাভ হইবে, জীবন ধন্য ও সফল হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও সার্থক হইবে'—এবংবিধ সমস্যাজালে নিপতিত হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা আপন পথ ঠিক করিয়া ফেলেন এবং এই জাল কাটিয়া বহির্গত হন। পাঠক দেখিবেন, নরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই প্রকার হইয়াছিল। উপস্থিত আমরা তাঁহার কলেজে অধ্যয়নকালীন চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

স্কুলের ন্যায় কলেজেও তিনি শীঘ্রই সকল বালকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পদে পদে অপর অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে সকলে আপনা হইতেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। প্রণালীবদ্ধ চিন্তা, তর্ক ও যুক্তিতে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্লাসে তর্ক আরম্ভ হইলে খেলার সময় পর্য্যন্ত তাহার জের চলিত। যুক্তি ও বিচার সাহায্যে প্রত্যেক জিনিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করা এখন হইতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল। বলা-কহায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রহস্যবিদ্রূপে, আমোদপ্রমোদে,

ক্রীড়ায়, সঙ্গীতে, সকল বিষয়েই তিনি সমান অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সিংহবিক্রমে সকলে যেন তটস্থ থাকিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ নূতন একটা কিছু শুনিলে বা করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ছুটিতেন। কিন্তু স্কুলে পড়িবার সময় যেমন তিনি অধিকাংশ কালই ক্রীড়ামগ্ন থাকিতেন, কলেজে পড়িবার সময় সেরূপ ছিলেন না। কলেজ-জীবনে তিনি খুব অধ্যয়ন-রত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতি তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। তাহা ছাড়া গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকারের দর্শনই তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি বিস্তৃত ও উদার ছিল। একবার একজন সহপাঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পরীক্ষাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না কেন। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"পরীক্ষাটা কিছুই নয়, পাশ করাই ত জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আর পাশের জন্য পড়া মুখস্থ করা মানে শুধু স্মরণশক্তির অপব্যবহার করা। পাশটা শুধু করিতে হইবে বলিয়া যতটুকু পড়া দরকার তাহাই করা উচিত।" তিনি বলিতেন, "এখনকার ছাত্রদের লক্ষ্য জ্ঞানার্জ্জন নয়, তাই দেখি ডিগ্রীটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনার শেষ। প্রকৃত জ্ঞানলাভ কাহাকে বলে, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং চরিত্রের উপর তাহার প্রভাব কতদূর—এ সম্বন্ধে এ দেশের ছাত্রদের বেশ পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত।" এ বিশ্বাস তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন নিজের পাঠ্যবিষয় স্থির করিয়া মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন।

কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্রনাথ যে সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য

বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অন্যতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'Godfrey's Astronomy' নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। বার বছর বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমুদয় সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং চৌদ্দ বৎসরে সংস্কৃতে বেশ সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল বাঙ্গালা ভাষার প্রতি।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত রকমের ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে তাঁহার জননীর সহিত তাঁহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার মাতার নিকট কোন কবিতা একবার পাঠ করিলে তিনি তারপর যে কোন সময়ে আগাগোড়া তাহা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথে এই শক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র যে কোন বিষয়ে অল্পক্ষণেই মনঃসংযম করিতে পারিতেন এবং তাহার পর সে বিষয় আর কখনও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সময়ে সময়ে যেন দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে হইত এবং তদ্দর্শনে সাধারণ লোকের বিস্ময় ও ভক্তির সীমা থাকিত না। তিনি যে জিনিষ একবার শুনিতেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রতি পংক্তি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, "শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, 'তিনি

বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত সেদিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপ ভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল স্থানের বানান ও অর্থাদি দুই তিনবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।' বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অন্য সময়ে আপন অভিরুচিমত অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনেক সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কথন কথন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভের দুই তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তথন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিথানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।' ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।"

পাঠানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি এই মেধাশক্তি নরেন্দ্রের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। অতীত বিষয়গুলি তিনি প্রয়োজন মত অতি সত্বর স্মৃতিপথে পুনরুদিত করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া তিনি এত অল্প সময়ে বহু বিষয় অধিকার করিতেন এবং সে সকল বিষয় এত দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ থাকিত যে, অন্যের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে যাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকে এখনও জীবিত থাকিয়া নিজ মুখে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছেন। সেই জন্য আমরা এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, যে পুস্তক তিনি একবার পাঠ করিতেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রায় সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবদের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া অধিক রাত্রিতে ইতিহাস বা দুরূহ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন হইতেন এবং ৪০।৫০ পৃষ্ঠা শেষ করিয়া উঠিতেন। ঐ ৪০।৫০ পৃষ্ঠা সেদিন হইতে তাঁহার মনের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া যাইত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া তিনি চা ও কফি পানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এত স্মৃতিশক্তি যাঁহার, তাঁহার পক্ষে অল্প দিনে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করা বিচিত্র কি? ইতিহাসপাঠে তাঁহার বরাবরই অনুরাগ ছিল। শুধু ঘটনাসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা তদন্তর্গত শক্তিশালী পুরুষদিগের ক্রিয়াসমূহ প্রকাশ পায়, ইতিহাসপাঠ দ্বারা সেই সকল অবস্থার পরিচয় লাভ ও পর্য্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেন। Green's History of the English People (ইংরাজ জাতির ইতিহাস), Alison's History of Europe (য়ুরোপের ইতিহাস) ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বিশেষভাবে পড়িয়াছিলেন Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire (রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস)। অতুলবিক্রম সম্রাট্ নেপোলিয়নকে

তিনি প্রকৃত বীর বলিয়া সম্মান করিতেন এবং নেপোলিয়নের সেনাপতিদিগের মধ্যে 'মার্শাল নে'-কে খুব উচ্চাসন প্রদান করিতেন। দুর্ব্বলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, বিশেষতঃ যখন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান এই সকল বীরবৃন্দের চিত্র তাঁহার কল্পনার সম্মুখে আনিয়া ধরিত। শক্তিসঞ্চয়ই যে মহৎ কার্য্যের দ্বারস্বরূপ ইহা তিনি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু অপরাপর দেশের ইতিহাসপাঠেই পরিতুষ্ট ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে, বোধ হইত যেন সকলই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় হিন্দু নৃপতি ও মোগল বাদশাহগণের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। উত্তরকালে যখন সন্ন্যাসীর বেশে সমস্ত ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন এই সব প্রাচীন কাহিনী, সেই বহুবর্ষাতীত ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহ-সন্দর্শনের সহিত যুগপৎ স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া ভারতের বিগত গৌরবের কল্পনাময়ী মূর্ত্তির নিকট তাঁহার হৃদয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া ফেলিত এবং ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি নিরীক্ষণ করিতেন যেন ঐ সব অতীত গৌরব শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে।

যুবকমাত্রেই সাধারণতঃ কাব্যানুরাগী হইয়া থাকেন। নরেন্দ্রও পঠদ্দশায় কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে Wordsworthকেই তিনি কাব্যগগনের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ শব্দবিন্যাসমাত্রকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত

চিত্রপটের ন্যায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প, সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল। তাঁহার ideal (আদর্শ) চিরজীবন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি এই স্বরচিত আদর্শজগতেই বাস করিতেন এবং মনে করিতেন, মানব-জীবনের ভিত্তি এই অন্তরের অন্তরতম আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আর জীবনের ব্যর্থতার কারণ শুধু এই আদর্শের সম্যগ্‌দর্শনাভাব। তিনি যাহা করিতেন, যাহা ভাবিতেন সবই তাঁহার হৃদয়নিহিত আদর্শের পরিপোষক ছিল। ইতিহাস, কাব্য, দর্শন বা বিজ্ঞান সবই তাঁহার চক্ষে সেই আদর্শের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু বোধ হইত না।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন প্রকৃত সত্যলাভের জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বি, এ, ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি পিপাসিত চাতকের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! পুস্তকের মধ্যে সে সত্য কোথায়! তাই পরবর্ত্তী কালে Song of the Sannyasin (সন্ন্যাসীর গীতি) শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—
'Where seek'st thou? That freedom, friend, this world
Nor that can give. In books and temples
Vain thy search.'

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর?
পাবে না তো হেথা, কিম্বা এর পর;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ;—

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দুর্ব্বোধ্য দর্শনের প্রতিই তিনি সমধিক আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন এবং উহা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্যাণ্ট ও শোপেনহয়ার নামক জর্ম্মন পণ্ডিতদ্বয়ের এবং অগষ্ট কোমৎ ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দার্শনিক মতও উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন আরিষ্টটল মতও উপেক্ষা করেন নাই। এই সকল অধ্যয়নের ফলে এসময়ে তাঁহার হৃদয়ে কি ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। এখন পাঠক শুধু এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এই সকল দার্শনিক মতবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন উত্তরকালে সাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে ও বিপক্ষবর্গের বিরুদ্ধমত-খণ্ডনে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সমুদয় টীকা-ভাষ্য নির্ভুল হইতে পারে, কিন্তু তিনি দেখিলেন উহাদিগকে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথম প্রথম হিন্দুদর্শনসমূহ পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, বুঝি ইহাদের ভিত্তি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত, এক আঘাতেই উহা চুরমার হইয়া যাইবে। এই বিষম সন্দেহ যতদিন পর্য্যন্ত না অপসৃত হইয়াছিল ততদিন তিনি নিদারুণ অন্তর্যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর বিশেষ একাগ্রতার সহিত পাশ্চাত্যদর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, হিন্দুদর্শন যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সত্যকে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে পাশ্চাত্য দর্শনের মূল সূত্রগুলি শুধু তাহারই ক্ষীণ আভাস মাত্র। তাহারা সেই পূর্ণ সত্যের দিকে কতকটা মাত্র অগ্রসর হইয়াছে।

অধ্যয়নের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আমোদপ্রিয়তা বর্জ্জন করেন নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও

কোন একটা নূতন জিনিষ বা বিষয় দেখিলেই সব ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রসিক কেহ ছিল না। কোন ঘটনায় কৌতুকের দিকটা সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় ছিলেন। একে এই রঙ্গপ্রিয় প্রকৃতি, তাহার উপর আবার যখন সকলে একত্র হইতেন তখন তাঁহাদের স্ফূর্ত্তির বহর দেখে কে? এমন অনেক দিন গিয়াছে যেদিন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া সকলে সারা কলিকাতার পথে গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, লম্ফঝম্প, জলক্রীড়া হইত ও সঙ্গে সঙ্গে হাসি-তামাসা-গল্পের বান ডাকিত। পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে রাজপথসমূহ আলোক-মালায় বিভূষিত হইলে এই সকল যুবকদল ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেন।

নরেন্দ্র ছিলেন ইঁহাদের দলপতি। যাহাতে সকলেই ষোল আনা আমোদ উপভোগ করিতে পায় সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু এই সকল আমোদের কোনটিতেই দোষের সংস্পর্শ থাকিত না। যৌবনে প্রাণ ও মনের স্ফূর্ত্তি প্রাকৃতিক নিয়ম, এ আমোদ তাহারই ফল; কিন্তু ইহাতে কলুষের লেশমাত্র ছিল না। এই সকল সরল, নির্দ্দোষ, পুরুষোচিত আমোদ উপলক্ষে নরেন্দ্রের সহিত অনেকের আমরণ সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। নরেন্দ্র-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা। এবিষয়ে তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং এ আদর্শ হইতে তিলপরিমাণ বিচ্যুতি বা খর্ব্বতা তাঁহার সহ্য হইত না। যৌবনকাল অতি সঙ্কটময়। আমোদপ্রমোদ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে পাপের পথে পদার্পণ করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু

বাল্যে মাতার নিকট নরেন্দ্র শিখিয়াছিলেন সৎ কি, সাধুতা কাহাকে বলে; আর যৌবনে নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন, বিচার ও চিন্তাশীলতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন পবিত্রতা কি, সাধুতা কি। সেইজন্য শত আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও তিনি চরিত্রের বিশুদ্ধতা হারান নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার একজন যৌবনসহচর (ইনি পূর্ব্বে সুনীতি কুনীতির বিশেষ ধার ধারিতেন না কিন্তু পরে স্বামীজির মতানুবর্ত্তী হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন) বলেন, "যৌবনে স্বামীজি পবিত্রতার জ্বলন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রায়ই over-puritanical (অতিরিক্ত মাত্রায় পবিত্রতাভক্ত) বলিয়া ঠাট্টা করিতাম, কিন্তু এক এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে গেলে যেন কথা আটকাইয়া যাইত,—স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম তাঁহার তুলনায় আমি কত হীন!" তিনি আরও বলেন, "নরেনের ভেতর থেকে যেন একটা আধ্যাত্মিক তেজ ফুটে বেরোত, তার কাছে তিষ্ঠান যেত না।" শুধু ইনি নহেন, নরেন্দ্রের অন্যান্য বন্ধুরাও তাঁহার মধ্যে ঐরূপ তেজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সারা জীবন নরেন্দ্র-চরিত্র এই পবিত্রতার মহিমময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। কি ধর্ম্ম, কি ঈশ্বর—সবই তিনি ইহার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। এই পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। তিনি স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগকে মাতৃরূপা জ্ঞান করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি রীতিমত গীতবাদ্যের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী গুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি

সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক্ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগরাগিণী শিক্ষা করেন ও তাল-মান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে নরেন্দ্র চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেথানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন,—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির-যত্ন করিত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন 'অথরিটি' (প্রমাণস্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং শেষে নিজেও কয়েকটী সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট অনেক হিন্দী, উর্দ্দু এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন। ঐগুলির অধিকাংশ মুসলমানদিগের পর্ব্বাদিতে গীত হয়।

জেনারেল এসেমব্লীজ কলেজের ছাত্রেরা প্রায়ই দল বাঁধিয়া তাঁহার

গান শুনিতে বসিত। একদিন একজন ইংরাজ অধ্যাপক ক্লাসে আসিতে কিছু দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ক্লাশে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাহারা সকলে নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল, কারণ সময়টা তাহা হইলে বেশ কাটে। নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন, আর সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ক্লাসের নিকট আসিয়া মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গান থামিলে সহর্ষবদনে ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। ক্লাসে প্রবেশ করিয়া তিনি গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন,—অবশ্য তাঁহার নাম কেহ তাঁহাকে বলিল না।

পাঠক দেখিবেন স্বয়ং পরমহংসদেবও নরেন্দ্রের এই সুকণ্ঠের সঙ্গীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং খেতড়ি রাজসভাতেও তিনি দরবারী, কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহারাও 'এনকোর' 'এনকোর' ('চলুক' 'চলুক') ধ্বনিতে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনিও উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশঃ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইত কেহই টের পাইতেন না। এখনও অনেকে বলেন, যখন তিনি একাকী থাকিতেন হয়ত গাহিতে গাহিতে এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে আহার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন এবং কতখানি সময় যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেন না। কোন কোন দিন এমন হইত যে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে তেল মাখিতে বসিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে গান ধরিয়াছেন—

এদিকে হয়ত খুব তাড়াতাড়ি খাইয়া বাহির হইতে হইবে,—কিন্তু গান আরম্ভ করিয়া আর স্নান বা খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে নাই, একেবারে তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের উপর এমনই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

তিনি যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে 'বীরোচিত কলা' বলিয়া নৃত্যবিদ্যার খুব আদর ছিল এবং ধর্ম্মোৎসবাদির সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগবশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গসঞ্চালনের মাধুর্য্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সঙ্গীতটী উচ্চভাবব্যঞ্জক হইত তাহা হইলে ভাবের প্রেরণায় নৃত্যসৌষ্ঠব আরও বর্দ্ধিত হইত। এ বিষয়ে তিনি ঠিক গ্রীকদের মত ছিলেন। আশৈশব সৌন্দর্য্যানুরাগী, স্বয়ংও সুন্দরদর্শন, তাহার উপর বহিঃসৌন্দর্য্যের সহিত আন্তরসৌন্দর্য্যের সম্বন্ধবেত্তা; সুতরাং তাঁহার সুকণ্ঠের সুধাস্রাবী সঙ্গীত ও তৎসহ ললিত বপুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী যুগপৎ শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণ হরণ করিত। এসময়ে বন্ধুবান্ধবদের কোন উৎসব-সভা হইলে তিনি যদি সে স্থলে উপস্থিত না থাকিতেন তবে মনে হইত যেন সভার অঙ্গহানি হইয়াছে। কারণ তাঁহার মত আনন্দ-তুফান তুলিতে কেহই পারিত না। তাঁহার সংস্পর্শমাত্রেই স্থানটি যেন চঞ্চল ও প্রাণময় হইয়া উঠিত, সভা-মধ্যে একটা হর্ষের হিল্লোল বহিয়া যাইত। তাঁহার সকল রকম গান জানা ছিল। যে যেমন চাহিত তাহাকে সেইরূপ গান শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে 'নরেন কোথা?' 'নরেন কোথা?' 'তাকে সঙ্গে আন নি কেন?'—এইরূপ একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আসর যেন বেশ জমিত না

এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। সমস্ত কলেজ-জীবনভোর তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগের নিকট এইরূপ প্রেমাস্পদ বন্ধু ছিলেন এবং গল্প রহস্য ও ক্রীড়া-কৌতুকাদি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

গান-বাজনার সঙ্গে আর একটা জিনিষের উপর তাঁহার ঝোঁক ছিল। সেটি হইতেছে অভিনয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে সময়টা এদেশে রঙ্গালয়ের জন্মকাল। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে এবং সামাজিক আমোদপ্রমোদে ভদ্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভিনয়ের বেশ প্রচলন হইয়াছে। নরেনও সখের অভিনয় আরম্ভ করিয়া বন্ধুদিগের হৃদয়ে অভিনয়-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিলেন। তবে তিনি যে সকল বিষয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন চিত্তের উন্নতিসাধনই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিত। কেশববাবুর নববৃন্দাবন নাটক অভিনয়কালে তিনি যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সুগঠিত অবয়ব দর্শনে সকলেই পুলকিত হইতেন। সে অবয়বে সিংহাবয়বের সৌন্দর্য্য ছিল। তার উপর প্রাণটী খোলা, সাদা ও সদাই স্ফূর্ত্তিসমুদ্রে ভাসমান। আর তিনি সহজেই সব কাজে গা ঢালিয়া দিতেন। সকল আমোদ-আহ্লাদ-রঙ্গস্রোতে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে সমর্পণ করিতেন।

উপরোক্ত আমোদপ্রমোদ ব্যতীত অন্য কয়েকপ্রকার ক্রীড়ায়ও নরেন্দ্র খুব যোগ দিতেন—এগুলিতে প্রভূত অঙ্গচালনার আবশ্যক হয়; যথা—দৌড়ান, লাফান, কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, দাঁড় টানিয়া গঙ্গাবক্ষে বিচরণ, ফাঁকা মাঠে বহুদূর পর্য্যন্ত দ্রুত ভ্রমণ ইত্যাদি। যে সকল খেলায় শরীর দৃঢ় ও সবল হয়, হৃদয়ে সাহস আসে, মনের তেজ বাড়ে তাহাতে তিনি বালককাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন।

তৎফলে তাঁহার মাংসপেশীগুলি শক্ত ও পুষ্ট হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধন করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই তিনি ঘোড়া ভালবাসিতেন। তাঁহার আত্মীয়ের একটা সাদা 'পনি' ঘোড়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। তিনি যে জিমন্যাষ্টিকের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন সেখানে লাঠিও খেলা হইত। লাঠির প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আসক্তি ছিল। কতকগুলি মুসলমানের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহাদের নিকটই লাঠিখেলা শিক্ষা হয়। কত অল্প বয়সে তিনি লাঠি-খেলায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর, মেট্রপলিটান স্কুলে পড়েন। একটা মেলা উপলক্ষে জিমন্যাষ্টিকের খেলা দেখান হইবার কথা ছিল। তিনিও দর্শকরূপে সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য খেলা শেষ হইলে লাঠিখেলা আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ খেলার উৎসাহ কমিয়া আসিল, এমন সময়ে সহসা নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন—তাহাদের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনে সম্মত, তিনি তাহারই সহিত খেলিতে প্রস্তুত। দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান সেই তাঁহার সম্মুখীন হইল। তারপর ঘোর শব্দে লাঠি-যুদ্ধ চলিল। দর্শকেরা ক্রীড়ার ফল দেখিবার জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, কারণ নরেন্দ্র অপেক্ষা নরেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়স ও শারীরিক শক্তি দুইই অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমান ওস্তাদদের শিক্ষাগুণে নরেন্দ্র লাঠি-চালনায় এমনি পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি-সামর্থ্যকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া পঁয়তাড়া কসিতে কসিতে হঠাৎ কৌশলে তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন; ফলে তাহার হস্তস্থিত

যষ্টিখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া ঝন ঝন শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে দর্শকবৃন্দের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। নরেন্দ্র জিতিলেন বলিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইলেন এবং সেদিন হইতে মেট্রপলিটনের বালকবৃন্দের গৌরবস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার শরীরে বা মনে বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না। সেজন্য যৌবনের সমস্ত উৎসাহ বাহ্যপ্রকৃতির অনুরাগে জ্ঞানস্পৃহায় পরিণত হইয়াছিল। খেলা ও পড়া এই দুইটী তাঁহার যৌবনের প্রধান কার্য্য ছিল, তবে এসময়ে পড়ার দিকে ঝোঁকটা ছিল কিছু বেশী। সতের বৎসরের শেষ হইতে আর তিনি শুধু খেলার ঝোঁকে খেলিতেন না, যে খেলায় শরীর বা মনের উপকার হয় শুধু এরূপ খেলায় যোগ দিতেন এবং বেশীর ভাগ গভীর বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার পর হইতে আমরা তাঁহাকে অধ্যয়নরত ছাত্ররূপে দেখি।

কলেজে পাঠকালে তিনি বাহ্য বেশভূষার পারিপাট্য আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও সৌখীনবাবু দেখিলে তিনি অনেক সময় তাহার মুখের উপর দু'কথা শুনাইয়া দিতেন —বিশেষতঃ যদি তাহার বেশে বা ভাবভঙ্গীতে নারীজনোচিত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত।

বি, এ, পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে নরেন্দ্র নিজ বাটীতে বালকদিগের চীৎকার, লোকজনের গণ্ডগোল ও অন্যান্য অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভ-মানসে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেই দিবারাত্রি থাকিতেন, শুধু আহারের সময় দুইবেলা বাটী যাইতেন। মাতামহীর আলয়ে বহির্ব্বাটীর একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে তিনি থাকিতেন। ঘরের সম্মুখে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। অন্দরমহলের সঙ্গে এ অংশের কোন সংস্রব নাই। এই গৃহে বসিয়া

তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং সাধারণতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৈনিক পাঠ আয়ত্ত না হইত ততক্ষণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। তিনি অনেকদিন পরে একজন বন্ধুর নিকট এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া গল্প করিয়াছিলেন, "আমি ঘরের ভিতর বই নিয়ে বস্‌তুম, আর পাশেই একটা পাত্রে গরম চা ও কফি থাকতো; ঘুম পেলেই পায়ে একটা দড়ী বাঁধতুম্‌, তারপর ঘুমের ঝোঁকে বেহুঁস হয়ে পড়লে যেই পায়ের দড়ীতে টান পড়তো অমনি আবার জেগে উঠতুম।"

কিন্তু পড়াশুনার ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল। বন্ধুবান্ধবরা যাঁহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং একবার তাঁহার তর্ক-যুক্তি বা গান-বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত "স্বামিজীর স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কালের একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। "নরেন নিজের এই অপূর্ব্ব ছোট ঘরটীর নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ্'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, 'চল টঙে যাই'। ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটী ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, মেজের উপর একটী ছেঁড়া মাদুর পাতা, এক কোণে একটী তাম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখনও বা ঐ খাটিয়ার নীচে পড়িয়া থাকে, কখনও বা তিনি তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকেন। ঘরের একপার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তাহার নিকট একটি তামাকের গুল ও ছাই ঢালিবার সরা, তাহার কাছে তামাক, টিকে

ও দেশলাই রাখিবার একটি মৃত্তিকাপাত্র, আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা-সেথায় ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ী খাটান, তাহাতে কাপড়, পিরাণ ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে—সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহারই নজীর। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা ও একটু ভাল ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া, দুই একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া আপনার ঘরটী বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহার ওসব দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সে জন্য ঘরের সর্ব্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব, প্রকৃত কথা আত্ম-তৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

"নরেন আজ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কোন বন্ধুর আগমন হইল—বেলা তখন এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, 'ভাই, রাত্তিরে পড়িস্, এখন দুটো গান গা।' অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, 'তবে বাঁয়াটা নে।' বন্ধু কহিলেন, 'ভাই, আমিত বাজাতে জানিনি, ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারবো?' অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, 'বেশ করে দেখে নে দিকি। পারবি বই কি, কেন পারবি নি? কিছু শক্ত কাজ নয়, এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।' সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই বার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল।

চলিল। তান-লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্পা, খেয়াল, টপ্খেয়াল, খেয়ালধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোল সহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে এক দিনে কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁক তাল পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজান কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই। হিন্দি গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-তরঙ্গের সহিত সুর-লয়ের অপূর্ব্ব ঐক্য দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটি মিট্‌মিটে প্রদীপ দিয়া গেল, ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হুঁশ হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"এই প্রকারে নরেনের পাঠে যে কতই ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন নরেন্দ্র নির্ব্বিকার।

"বি, এ, পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপনাপন বেতন ও পরীক্ষার ফি জমা দিল। হরিদাসের (নরেন্দ্রের একজন সহপাঠী) অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসর কাল

বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এ প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। যাহারা নেহাত সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু আবার তেমন তেমন স্থলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড়ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরাণীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা আশটা করেন, কিন্তু গরীব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্দ্ধ বেতনে, কাহাকেও বা বিনা বেতনে ভর্ত্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করেন, কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরাণীকে বড় ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোন উপায়ে ফির টাকা যোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকার কিন্তু যোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, 'তুই ভাবিস্‌নি, এক্‌জামিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব, তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব, কেবল ফির যোগাড়টা করিস্‌।'

"বন্ধু উত্তর করিলেন, 'ভাই, ফির যোগাড় আছে, মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়'।

"নরেন কহিলেন, 'তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।' দুই একদিন পরে তাঁহারা দুই বন্ধু একত্রে কেরাণী রাজকুমারের ঘরের

সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার আসিলেন। অনেক ছেলে একত্র দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকী-বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন, একটু জোর তাগাদা—'অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না'। ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখ-কাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আব্দার করিতে লাগিল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে, তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় পাকায়-কাঁচায় চুল, গোঁপও তদ্রূপ, কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুইপার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপকানের বা জামার বোতাম দেবার অবকাশ হইত না। কাঁধে চাদরখানি জাহাজি কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাঁধিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন, অমনি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, 'মহাশয়, অমুক দেখ্‌ছি মাইনেটা দিতে পারবে না, তা আপনি একটু অনুগ্রহ ক'রে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাস হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।'

"রাজকুমার দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিলেন, 'তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা।

আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।' নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, 'তুই হতাশ হচ্ছিস্ কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বল্‌ছি, তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করব। তোর একজামিন দিতে পেলেই ত হল? ভাবিস্‌নি ভাই, নিশ্চয় বলছি তোর উপায় করবো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।' বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল, নরেন বড় লোকের ছেলে, বাপ উকিল, তাঁহার গান শিখিবার জন্য বেতন দিয়া ওস্তাদ রাখেন, নরেন হয়ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন, তাই তাঁহার এত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না তখন নরেন নিশ্চয়ই টাকার যোগাড় করিবেন। বন্ধু এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যদিন সন্ধ্যার পরে আসেন, আজ একটু ব্যস্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিলেন, কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই একটি বৃহৎ গুলির আড্ডা। ইতোমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আড্ডাধারী বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া 'না'

বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঘেরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে, এমন সময় গলির সম্মুখে রাজকুমার অসিয়া উপস্থিত। অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। নিজ ভাব চাপিয়া কহিলেন, 'কিরে দত্ত, এখানে কেন?'

"নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু পাঠাতে হবে, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার কথাটি না রাখেন ত আমিও কলেজে আপনার কথা রটাব; কলেজে টেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না?' স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হস্ত জুড়াইয়া কহিলেন, 'বাবা, রাগ কচ্ছিস্ কেন? তুই যা বলছিস্ তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস্ আমি কি তা করব না?'

"নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন, 'তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন?'

"কি জানিস্, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে, তখন কাকে রেখে কাকে দেব, বাবা? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়ব। আমায় আড়ালে বলতে হয়, তুই ছেলে মানুষ, ওসব ত বুঝিস্নি, কারুর সামনে কি ওকথা বলে? তুই নিশ্চিন্ত হ।

মাইনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফির টাকা ত আর মাপ হয় না, সেটা দেবে ত ?'

"'সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। সে এক পয়সা দিতে পারবে না।'

"'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশে পাশে বেড়াইয়া নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

"নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্রনাথের বাসা হইতে বেশী দূর নহে, চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পর দিন প্রত্যূষে বন্ধুর বাসায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া গান ধরিলেন—

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল।

অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর প্রেম-মুখচ্ছায়া
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে॥
মধু সমীরণ বহিছে আজি শুভদিনে
তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে,
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত-নিকেতনে
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥

"নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, 'ওরে, খুব ফুর্ত্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।' এই বলিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান,

ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তাহার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

"পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই, বোধ হয় মাসখানেকও নাই, বিপুলকলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টাই তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়াশুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্ত্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর। এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোরকুঠরী বা দোছত্রীর ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া 'নরেন' বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, 'এই চোর-কুঠরীর ভেতর আছি।' সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া হইল, পরে বন্ধু শুনিলেন বিগত দুই দিন ঐ কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন যে একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। তিন দিনে

ঐ বিপুলকায়-পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোন উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

"আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির (হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল বাবু দাশরথি সান্ন্যাল) বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন :—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

"নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন। দেখিলেন নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছুটাইলেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সেদিন হইল না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত 'আমরা যে শিশু অতি', 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি' প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল।

পাশের ঘরে নরেনের অপর একটি সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিবার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা পরিত্যাগকালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, নরেন্দ্র একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন, এক্‌জামিনের দিন কোথায় একটু আধটু খুঁৎ খাঁৎ যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সকল বিপরীত, বেড়ে ফুর্ত্তি কচ্ছ।'

"নরেন উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ, তাই ত করছি, মাথাটা সাফ রাখ্‌ছি; মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই ত নয়। এতদিন পড়ে পড়ে যা হল না তা কি আর দু'এক ঘণ্টায় হয়? হয় না। এক্‌জামিনের দিন সকাল বেলাটা কেবল ফুত্তি, কেবল ফুর্ত্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই মলাই করে যেমন তাজা করে নিতে হয়, মগজটাকেও তাই করতে হয়।'"

এই কালে নরেন্দ্র কঠোর ব্রহ্মচারীর ন্যায় দিন কাটাইতেন এবং অর্দ্ধেক রাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। চিন্তা ও দর্শনালোচনার ফলে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য যে ধর্ম্মজীবনের প্রথম অপরিহার্য্য সোপান ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যপালন ব্যতীত প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। তজ্জন্য এখন হইতে তিনি ব্রহ্মচারীর মত থাকিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তবে

অন্যের পক্ষে ব্রহ্মচারী হওয়া বলিলে যেমন অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা হইতে বলপূর্ব্বক মনকে ফিরাইয়া শুদ্ধি বা পবিত্রতার দিকে লইয়া যাওয়া বুঝায়, তাঁহার পক্ষে ঠিক তাহা বুঝাইত না। আশৈশব তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সৎ, উচ্চ ও মহৎ। যৌবনারম্ভে শুধু এই প্রবৃত্তি আরও প্রখর ও বলবতী হইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সৎকার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে পাঠক মন্দের সহিত দ্বন্দ্বে জয়ী হইবার চেষ্টা বুঝিবেন না, কিন্তু ভালর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বুঝিবেন।

এই সময়ে তিনি পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে সাদরে তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া গান শুনিতেন বা গল্পগুজব করিতেন। মাতুলালয়ে অবস্থানকালে সামাজিক বা অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে সে বিষয়ের আলোচনায় নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। বয়স্যেরা তাঁহার সে ভাব দেখিয়া বলিত, "ওঃ নরেন, তুমি ভাই অদ্ভুত ছেলে, তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল!"

তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটি আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎরস আস্বাদনের ভাব। পর-বৈরাগ্যের জ্বলন্তমূর্ত্তি ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনের প্রথমে এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছিলেন। অদ্বৈতের একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়াও যিনি ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্মশীলতা ত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই এবং জগৎ প্রকৃতপক্ষে শূন্য হইলেও যিনি অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানুভূতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে শূন্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন, তিনি যৌবনারম্ভে গৃহস্থাশ্রমে জীবনটাকে কত

মধুরভাবে ভোগ করিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট জগৎসত্তা না থাকিতে পারে, কিন্তু আর সকলের নিকট ত আছে, সুতরাং জগৎটা ভোগের বস্তু; কিন্তু ইহা অজ্ঞানীর ভোগ নহে, স্বার্থ-বিজড়িত উদ্দাম লালসার তাড়নায় হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া ভোগের পশ্চাতে উন্মত্তবৎ দৌড়ান ও প্রতি পদে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া নয়, এ ভোগ প্রকৃত সম্ভোগ—স্বার্থের লেশমাত্র নাই, মলিন বাসনার ছায়াসম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ প্রেমের পরিপূর্ণ আনন্দের বিচিত্র লীলাবিলাস। অন্তরে বৈরাগ্যের দীপ্ত হুতাশন, সুতরাং আসক্তি নাই। আসক্তি নাই—কিন্তু আনন্দ আছে। পিউরিট্যানদের (Puritan) মত জোর করিয়া মনকে ভোগ-বিমুখ করিবার চেষ্টায় প্রাণে নিরানন্দের সৃষ্টি নাই, প্রতিহত বিষয়বাসনার নির্ম্মম দংশনে বিষজ্বালার উৎপত্তি নাই, পরন্তু সহজ সরল নিষ্কাম ভোগে পূর্ণ পরিতৃপ্তি, পরম শান্তি ও অজস্র আনন্দ আছে।

জগৎকে এইরূপ নিষ্কামভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াই বাটিতে অসংখ্য দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি প্রায়ই দরিদ্র বন্ধুবান্ধবদিগের দৈন্য, অভাব ও নিরাশার ম্লানচ্ছবির মধ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহাদের সংসর্গে তাঁহার যে আনন্দ হইত, প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও তিনি সে আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেন না।

এই সময়ে স্পেন্সারের দর্শনালোচনা তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ঐ মতবাদের কোন কোন প্রসঙ্গের সমালোচনা করিয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। দার্শনিকপ্রবর তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ও সাধুবাদ করিয়া একটী উৎসাহপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শুনা যায় নাকি

গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁহার সমালোচনানুযায়ী নিজমতের কতক কতক পরিবর্ত্তন করিবেন এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। স্পেন্সারের মত লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করাতে নরেন্দ্রের উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। অন্ততঃ তিনি বুঝিলেন যে চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন না, কথাটার মূল্য আছে। সে সময়ে রেভারেণ্ড হেষ্টি (Rev. W. W. Hastie) সাহেব জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তখন কেহই পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সুপ্রসিদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ও উক্ত হেষ্টি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। এই হেষ্টি সাহেব বলিয়াছিলেন:—"Narendra Nath Dutta is really a genius! I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in the German Universities, amongst philosophical students. He is bound to make a mark in life." (নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান বালক। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন একটী ছাত্র আর দেখি নাই, এমন কি জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদিগের মধ্যেও নহে। এ বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা নাম রাখিয়া যাইবে।) নরেন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করিতেন কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে।

বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্যান ও প্রার্থনা করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতগণের বিচারপূর্ণ

দার্শনিক গ্রন্থের সঙ্গে ঈশানুসরণ (Imitation of Christ) নামক ভক্তিগ্রন্থও তিনি আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

তাঁহার ইংরেজী জীবনীলেখকগণের এই উক্তি বাস্তবিক সত্য—নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক যুবকগণের মধ্যে একজন অদ্ভুত যুবক ছিলেন। দুষ্টামিতে বালক, সঙ্গীতে ওস্তাদ, বিদ্যাবুদ্ধিতে পণ্ডিত, এবং সাংসারিক ব্যাপারে চিন্তাশীল দার্শনিক—এমন একটি ছেলে আর কোথাও পাওয়া যাইত না।

মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

কলেজে পাঠকালে নরেন্দ্র যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার মনে অজ্ঞেয়বাদ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্পেন্সারের গ্রন্থাবলী তাঁহার মনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎপ্রণীত মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান (The Science of the First Principles) নামক গ্রন্থখানি ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে সহজেই প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করে। সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া নরেন্দ্রের বহুদিনের ধর্ম্মবিশ্বাস কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া গেল। কিন্তু তিনি নিজে অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, বিনা যুক্তিতে কোন বিষয় বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করিতেন না। যতক্ষণ সে বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইত ততক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিতেন না, বরং নিজের চিন্তারাশির মধ্যে সযত্নে একস্থানে রক্ষা করিতেন। এখন হইতে তিনি পুরোহিতশ্রেণীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রাধান্যে আস্থাশূন্য হইলেন। দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রভুত্ব ও জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস সমগ্র জাতির ধর্ম্মজীবন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং তিনি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। স্পেন্সারের যুক্তি তিনি অকাট্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও অনেকটা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন। হেগেল, শোপেনহয়ার এবং মিলকেও তিনি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার জীবনের পরিচালক বলিয়া মনে

করিতেন, কিন্তু স্পেন্সারকেই সর্ব্বাপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং পুরোহিত-দিগের সঙ্কীর্ণতা ও প্রতারণায় বিরক্তচিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সাধারণ নীতিকে অতিক্রম করা যে পাপ ও সর্ব্বতোভাবে অন্যায় ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে তিনি অগস্ত কোমতের দর্শনের (Positivism) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে উহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বোধে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞেয়বাদ অধিক দিন তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারিল না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতই কেহ স্রষ্টা নাই বা থাকিলেও তাঁহাকে জানা যায় না, ইহা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই বিদ্রোহী মন তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি যতই বিচার করিতে লাগিলেন—ততই ঘোরতর সন্দেহান্ধকার তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আরও প্রচণ্ড ভাবে ঘিরিতে লাগিল। তিনি মনোমধ্যে বিষম যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কোনদিকে সত্যের ক্ষীণতম আভাসমাত্রও না পাইয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নৈতিক জীবনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তাঁহার আবাল্য বিশ্বাস, গৃহের শিক্ষা ও জীবনযাপন-প্রণালী তাঁহাকে এই সত্যের দিক্ হইতে কিছুতেই বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে তাঁহার মনের এইরূপ ভাব হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে যতই গভীর সন্দেহ হউক না কেন, সেই ছলে ব্যবহারিক জীবনের বিশুদ্ধতা নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান মনুষ্যেরই উচিত নহে। মানুষের বিচারশক্তি যতই অগ্রসর হউক না, তাহার একটা সীমা আছে, অনেক বিষয় জানিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত

করিয়া তাহার স্থলে তিনি শুদ্ধ বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন না। হৃদয় যাহা উচিত বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছিল, কেবল বুদ্ধি বা বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই দিক অনুসরণ করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রেরণাতেই তিনি কঠোর ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বিধবার ন্যায় শুভ্র বস্ত্র পরিধান ও ভূশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে যে ত্যাগের ভাব বন্যাস্রোতের মত হু হু করিয়া আসিতে লাগিল তাহাকে রোধ করা আবশ্যক মনে করিলেন না,—বরং জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্য তাহার সম্যক্ উপযোগিতা আছে বলিয়া অনুভব করিলেন।

এদিকে বাটীর লোকেরা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতামাতা সকলেরই ইচ্ছা যে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতবারই তাঁহারা নরেন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছেন, ততবারই একটা না একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ বারে তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সেটা তাঁহার বি, এ, পরীক্ষা দিবার অল্পদিন পরেই ঘটে। পরিবার-মধ্যে তাঁহার বিবাহ লইয়া এত উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।* তিনি দর্শনশাস্ত্র

* তাঁহার পিতামাতার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পর তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন ও সেখানে তিনি সিভিল সার্ভিস কিংবা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন। কলেজে পড়িবার সময় নরেন্দ্রের মনেও 'বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস দিব' এইরূপ একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত হয় নাই; কারণ পরমহংসদেব তাঁহার বিবাহের বিরোধী ছিলেন ও ঐ কথা শুনিয়া কালীমাতার

আলোচনা ও চিন্তার ফলে ঐহিক ভোগ-সুখটাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ তাঁহাকে আর কিছু শিক্ষা দিক বা নাই দিক জীবনটা যে স্বপ্নবৎ অস্থায়ী ও অলীক এবং জগতের যাবৎ পদার্থই নিরর্থক, এইটুকু বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিল। এই অসার স্বপ্নসম জীবনের মধ্যে সত্যকে লাভ করাই যে চরম সার্থকতা, এইটি স্থির করিয়া তিনি ক্রমাগত বিচারের সাহায্যে তাহারই নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রতিপদে অবিশ্বাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা জিনিষ সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হইতেছিল ততক্ষণ তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু প্রমাণের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিরত ছিলেন না। নিজের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা তিনি অনেকটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, এতটা চেষ্টা ও সংগ্রাম বিফলে যাইবে না, এমন দিন আসিবে যেদিন তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা লাভ হইবে এবং সন্দেহ ও অজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দীপ্ত সত্যের সম্মুখে অবস্থান করিবেন। কিন্তু এত সন্দেহ ও বিচারের মধ্যেও তিনি পূর্ব্বাভ্যস্ত ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করেন নাই। ধ্যান যখন জমিয়া আসিত তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন, সেখানে আর সন্দেহ বা অবিশ্বাসের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ সময়টা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কারণ এ আর চিন্তা বা কল্পনা মাত্র নহে, প্রকৃতই একটা অনুভূতি,

নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, ওর বিয়ে টিয়ে ঘুরিয়ে দে।' নরেন্দ্রও সেই হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন কিছুতেই বিবাহ করিবেন না, এবং পিতার ভর্ৎসনায় ও ত্যজ্যপুত্র হইবার ভয়প্রদর্শনেও কোন ফল হয় নাই।

সাক্ষাৎ উপলব্ধি। নরেন্দ্র-চরিত্রে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সংশয়াকুল চিত্ত দুইটী পাশাপাশি অবস্থিতি করিত। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। সন্দেহবাদীদের ন্যায় তিনি অন্ধকারের মধ্যে আপনার পথ হারাইয়া ফেলেন নাই। অন্ধকারেও আলোর আশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল সত্যলাভের প্রতিজ্ঞা ততই তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদে অনুসন্ধিৎসু মন অধিক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না, নরেন্দ্রও পারিলেন না। 'জ্ঞানের সীমা এতদূর পর্য্যন্ত, এর বেশী আর জানিবার উপায় নাই' এভাবে বেশী দিন চলিল না। যদিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সন্দেহ ও বিচারের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া প্রায় প্রাণ হারাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তথাপি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের মাঝখানে একদিন তাহা ফিরিয়া আসিল এবং অজ্ঞেয়বাদকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার স্থানে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ও প্রেমময় ঈশ্বরকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিল। সেদিন হইতে তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, ঈশ্বর প্রকৃতই আছেন, যদিও আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না। সেদিন হইতে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার মস্তককে সহজেই সেই উপাস্য ঈশ্বরের চরণোদ্দেশে অবনত করিয়া দিল। সেদিন হইতে তিনি তাঁহাদের বাটীর পূজার দালানে সঙ্গীদিগের নিকট কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনের পিপাসা মিটিতেছিল না। তিনি এমন একজন প্রাণের দোসর খুঁজিতেছিলেন যিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে অভীপ্সিত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ কেহই জুটিল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যেমন করিয়াই হউক

ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সেইজন্য এমন একজনকে খুঁজিতে লাগিলেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও দর্শন করাইয়া দিতে পারিবেন। ভক্তের ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিতের সহিত মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাঠক দেখিবেন সহজে বা শীঘ্রই তাহা হয় নাই। মস্তকে অশেষ চিন্তাভার ও হৃদয়ে বিপুল বেদনার বোঝা লইয়া তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল এবং ধৈর্য্যের সহিত অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল—তবে সে বাঞ্ছিতের দর্শন পাইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যেদিন যেদিন তাঁহাদের উপাসনা বা বক্তৃতা থাকিত সেইদিনই তিনি উপস্থিত হইতেন এবং শীঘ্রই রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী ও ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। সে সময়ে বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন নব্যবঙ্গের নেতা। কেশববাবুর অনেক ভক্ত। তাঁহার গভীর ভাব, ধর্ম্মোৎসাহ ও আকর্ষণী শক্তিতে নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত—তিনিও যেন কালে কেশববাবুর মত হইতে পারেন। এক হিসাবে তাঁহার এ বাসনা পূর্ণও হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনিও বক্তৃতাকুশল লোকশিক্ষক বলিয়া কেশববাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, কেশববাবুর ন্যায় প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি নূতন কিছুর প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বরং স্বীয় মতকে পুরাতনেরই অভিব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

পুরাতন কঙ্কালসার সমাজের অত্যাচারে ব্যথিতচিত্ত নরেন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের সহিত একমত হইলেন। জাতি-ভেদের

দৌরাত্ম্য ও স্ত্রীজাতির শিক্ষাহীনতা তাঁহার চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহার মাতা ধীরভাবে সব শ্রবণ করিলেন কিন্তু পুত্রের সত্যপ্রিয়তা ও অকপটতার উপর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়া মুখে কিছু বলিলেন না, মনে করিলেন কালে তিনি আপনিই ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে রীতিমত খাতায় নাম লিখাইয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, যখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন তখনও হয়ত ব্রাহ্মদিগের খাতায় তাঁহার নাম ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার আদর্শ ব্রাহ্ম-আদর্শের বহু উপরে উঠিয়াছে এবং সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা ব্রাহ্মসমাজবদ্ধ সংস্কার অপেক্ষা আরও আমূল পরিবর্ত্তনের সংকল্প গঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই সংস্কারের পথ ও উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার মতের বিস্তর ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে বিনাশমূলক-সংস্কার অপেক্ষা গঠনমূলক-সংস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে বাহিরের আঘাতে জনসাধারণের দীর্ঘকালের বিশ্বাস ও ধারণার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত না করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে শিক্ষিত, মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া অন্তরের মধ্য হইতে স্বতঃই সেই সংস্কার-প্রবৃত্তিকে জাগাইতে হইবে, নতুবা কৃতকার্য্যতার আশা বড় কম। পুরুষপরম্পরাগত রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে নিন্দা বা অবজ্ঞা না করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে ও মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিদেশীয় ভাব বা বিজাতীয় আদর্শের পশ্চাতে দৌড়াইলে বা তাহাদের যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাকেই

অন্ধের ন্যায় আমাদিগেরও একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় বোধে গ্রহণ করিলে হিতে বিপরীত হইবে মাত্র, আর কিছু লাভ হইবে না। পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের অন্ধ-অনুকরণ প্রকৃত সংস্কার নহে, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে পুরাতনের উপর যে নবরশ্মি পতিত হইতেছে তাহার সাহায্যে পুরাতনের সারাংশকে চিনিয়া, বাছিয়া ও নূতনের সহিত তাহাকে কতকটা মিলাইয়া কর্ম্মজীবনে আপনাদের হৃদয় ও মনের অংশীভূত করিয়া লওয়াই প্রকৃত সংস্কার।

নরেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভারতের অনেক সমস্যাই তখন তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের প্রসার সাধন করিয়া তাহার মধ্যে জাতীয়ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলাই এখন তাঁহার প্রধান ধ্যেয় বস্তু হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া নরেন্দ্র সমবয়স্ক বয়স্যগণের নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় বিশৃঙ্খল ও অবনত হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত আর কিছু মনে করিতেন না। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু বলিয়া বিবেচনা করিতেন,—তবে সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

অকূল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া নরেন্দ্র কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই কেশববাবুর ন্যায় প্রচারক হইবার বলবতী বাসনা উদিত হইত। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেক চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াও তিনি বেশ প্রীতি লাভ করিতেন। দিন কতকের জন্য মনটা যেন শান্ত হইল, কিন্তু তাহার পর আবার পূর্ব্ববৎ অশান্তি আরম্ভ হইল। কেবল ভাবিতে লাগিলেন—কৈ, ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইল কৈ? ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি গান গাহিতেন, তখন ক্ষণিকের জন্য প্রাণে ভগবৎ-রসের আস্বাদ পাইতেন, কিন্তু সেও ক্ষণিক। সুতরাং তিনি আবার একান্তচিত্তে আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাণের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখনকার শিক্ষিত লোকদিগের নিকট একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি শান্তি ও সত্যকামনায় কতকটা ত্যাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং সদাসর্ব্বদা প্রায় ধ্যানধারণাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনিই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহির্ব্বিকাশ সাধন করেন। সুতরাং নরেন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার নিকট যাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মহর্ষি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র দল সংগঠিত হইল, সেখানে মহর্ষি প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করিতেছে

তাহার পরিচয় লওয়া হইত। নরেন্দ্র উপলব্ধি করিতেন যেন একটা জ্যোতির্ব্বিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তারপর যেন সেই জ্যোতির্মধ্য হইতে নানাবিধ অসংখ্য উজ্জ্বল রশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। তারপর তাঁহার জ্ঞান যেন সাধারণ সসীম ক্ষেত্র ছাড়িয়া এক অজ্ঞেয় অসীম রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, কিন্তু ঠিক এই স্থানে আসিলেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত এবং সেই আলোক-রশ্মি-উদ্ভাসিত বর্ণমালা অন্তর্হিত হইত। মহর্ষি বুঝিলেন, এ যুবকটি সাধারণ যুবক-সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং নিজে যতদূর পারিলেন এ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এমন কি অপরের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ সুপ্ত-শক্তিমান যুবক বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। নরেন্দ্র শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাতায়াত ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না—শান্তি মিলিল না।

একদিন তিনি মহর্ষির গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকামধ্যে গমন করিয়া দ্রুতগতি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি তখন উপাসনা করিতেছিলেন। নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি স্বয়ং ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" সহসা এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অপূর্ব্ব প্রশ্নে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। একবার—দুইবার—তিনবার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তিনি ক্ষণকাল নরেন্দ্রের নেত্রমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বৎস! তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক যোগীদিগের চক্ষের ন্যায়!"

ইহার পর কিছুদিন গেল, কিন্তু নরেন্দ্রের চিত্তের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহর্ষির উত্তরে তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি ত ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন একথা বলেন নাই,—কি করিয়া এখন ঈশ্বর লাভ করা যায়? তিনি জানিতেন যে, দর্শন আদি শাস্ত্র অতি তুচ্ছ। তাহারা শুধু ভগবানকে বুঝিবার একটুকু ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র। পুস্তকের মধ্যে ভগবদ্দর্শন লাভ অসম্ভব, তবে কি করা যায়? তখন তাঁহার মনে হইল পরমহংসদেবের কথা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি প্রথম পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে পরমহংসদেবের এক শিষ্য একদিন স্বকীয় সিমুলিয়ার বাসভবনে পরমহংসদেবকে আনয়ন করিয়া একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে একজন সুগায়কের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকে সাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। ঐ দিবস নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন; ভজনাদি সাঙ্গ হইলে সুরেন্দ্রবাবু ও রামচন্দ্র দত্তের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং এক দিবস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে যখন তাঁহার পিতা এক ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিতেছিলেন এবং কন্যার পিতা দশ সহস্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে ঈদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতারত্ন লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন, সেই সময়ে নরেন্দ্রকে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত দেখিয়া ও তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতৃ-অন্নে লালিত তাঁহাদেরই এক আত্মীয়

(রামদাদা—ভক্ত ৺রামচন্দ্র দত্ত) তাঁহাকে বলেন, 'ভাই, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? যদি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ও ঈশ্বরলাভ করিতে চাও তবে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাও।' তাহার পর একদিন জন দুই তিন বয়স্য সমভিব্যাহারে নরেন্দ্র উপরোক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। ঠাকুরকে দেখিতে এই তাঁহার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।* এদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে গান গাহিতে বলায় তিনি তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজাদৃত 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটি গাহিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। গাহিবার পর ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন ও ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি তা কি একটিবারও মনে কর্ত্তে নেই? বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মত হয়েছে!' এইসব বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমি জানি তুমি কে। তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নরনারায়ণ, জীবের

---

* শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন এইটি দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার (উদ্বোধন—আশ্বিন, ১৩২২); কিন্তু কথামৃতকার বলেন ইহাই স্বামিজীর পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন (কথামৃত ৩য় ভাগ, প্রথম সংস্করণ ২৮৬ পৃঃ)। কথামৃতকারের মতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে দর্শনের পর রাজমোহনের বাড়ীতে দ্বিতীয় দর্শন হয়। (কথামৃত ৩য় ভাগ ২৮৭ পৃঃ)

দুর্গতি নিবারণের জন্যই তোমার শরীর ধারণ হইয়াছে, ইত্যাদি।'* নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এবম্প্রকার কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে একপ্রকার উন্মাদ (monomaniac) বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং বেশী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে স্বহস্তে মাখন, মিছরী ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া একত্রে খাইবার কথা বলিলে ঠাকুর 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও না' বলিয়া সবটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া ছাড়িলেন। তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল শীঘ্র আর একদিন একলা আমার কাছে আসবি?' তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নরেন্দ্র আসিব বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েন।

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণ ও ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদবৎ অবস্থার কথা যদিও কয়েকদিন বারংবার তাঁহার মনে হইয়াছিল তথাপি কার্য্যগতিকে আর উক্ত অঙ্গীকার পালনের সুযোগ ঘটে নাই। মাসাধিক কাল পরে আবার একদিন তিনি একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর সেদিনও পূর্ব্বদিনকার মত ছোট তক্তপোষখানির উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে হাত ধরিয়া তক্তপোষেরই একধারে বসাইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্ফুটস্বরে কি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ভাবিলেন, পাগল বোধ হয় আবার কোন পাগলামি করিবে। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে ঠাকুর সহসা তাঁহার দক্ষিণ পদ দিয়া নরেন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ-

---

* লীলাপ্রসঙ্গপ্রণেতা বলেন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামিজীকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃত ৩য় ভাগের (প্রথম সংস্করণ) ২৮৭ পৃষ্ঠায় আছে প্রথম দিন নয়, অন্য আর একদিন।

মাত্রই নরেন্দ্রের বোধ হইল গৃহের ভিত্তিসমূহ ও চতুর্দ্দিককার জিনিষ-পত্র, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য্য সব যেন সবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার অস্তিত্বকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! তিনি হঠাৎ দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু-সম্ভাবনায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ওগো, তুমি আমায় এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' এতচ্ছ্রবণে ঠাকুর প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, পরে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'তবে এখন থাক, তাড়াতাড়িতে কাজ নেই, সময়ে হবে।' কিঞ্চিৎ পরে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন। সেদিনের ঘটনায় তাঁহার ধারণা হইল ঠাকুর সম্ভবতঃ খুব ভাল হিপ্‌নটিজম্ (Hypnotism) বা মেস্‌মেরিজম্ (Mesmerism) জানেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণমস্তিক লোকেরাই ত ঐরূপে বশ হয়; চিরদিন নিজের মানসিক দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস থাকায় ব্যাপারটা কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় সপ্তাহকাল পরে নরেন্দ্র পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তখন ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার ভাব তাঁহার মধ্যে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রাসমণির বাগানে জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী যদু মল্লিকের বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া উদ্যানমধ্যস্থ একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করার কিঞ্চিৎ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র ধীর-ভাবে উক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব্ব দিনের মত হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও নরেন্দ্র ঐ স্পর্শে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন

না। তবে এদিনে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় না হইয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা লাভ হইলে দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, ঐ দিন নরেন্দ্রের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে সে—কোথা হইতে আসিয়াছে—কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে)—কত দিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নরেন্দ্রও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা হইতে ঠাকুর জানিতে পারেন যে তিনি নরেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন সেগুলি সব সত্য এবং তিনি (নরেন্দ্র) প্রকৃতই যাহা, যেদিন তাহা জানিতে পারিবেন, সেদিন আর দেহ রাখিবেন না,—সংকল্প দ্বারা যোগমার্গে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি নরেন্দ্রকে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এইরূপে অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময় হইতে নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তখনও তিনি সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্র সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন নাই। কখনও মনে করিতেন, তিনি উন্মাদ—ঈশ্বরের ভাবনা ভাবিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কখনও ভাবিতেন, না, ইনি সত্যই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ,—কিন্তু ঠিক তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি নিজের আন্তরিক ধর্ম্মপিপাসা-শান্তি-মানসে ব্রাহ্মসমাজে ও অন্যান্য স্থানে মিশিতেন বটে, কিন্তু যখন কিছুতেই সত্যনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, যখন বুঝিলেন এমন কি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন পরমহংসদেবকে

এ সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে তিনিও বলেন, 'না, আমারও ঈশ্বরদর্শন হয় নাই।'

একদিন তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন এবং পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি না। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি।' পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে শুধু তিনি নিজে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন বলিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ দর্শন হইত প্রথম প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত বাহ্যযুক্তিমাত্রসহায় নরেন্দ্রনাথ তাহাদের বাস্তবসত্তায় সন্দিহান হইয়া ঐ সকল দর্শনের বিষয় হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি পরমহংসদেবের প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও অমৃতময় উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিতেছিল এবং অনেক অন্তঃসংগ্রাম ও তর্ক-বিরোধের পর অবশেষে তিনি পরমহংসদেবের সকল কথা সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দু' একদিনে হয় নাই, তিনি দীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল ধরিয়া প্রতিপদে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও সম্পূর্ণ প্রমাণ সহায়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন নাই।

পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

ইতোমধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিষম পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথবাবু পরলোকগমন করেন। তখন নরেন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। সবে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। পরীক্ষার দিনকতক পরে একদিন তিনি বরাহনগরের বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত গান বাজনা করিয়া আহারাদির পর সকলে একগৃহে শয়ন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, হৃদ্‌রোগে বিশ্বনাথবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে নরেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও শোককাতর হৃদয়ে যথাবিধি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন।

তারপর বড় কষ্ট আরম্ভ হইল। অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলেও মুক্তহস্ত বিশ্বনাথবাবু বড় কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সংসার চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। শোকাতুর নরেন্দ্রনাথ ভগ্ন-হৃদয়া জননীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও বলিলেন সব ঠিক হইয়া যাইবে। মাতা দুঃখের মধ্যে পুত্রের হৃদয়ের বল দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কয়েক সপ্তাহ একরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু তারপর প্রকৃতই অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র তখন বি, এল, পড়িতেছিলেন। অর্থাভাবে দীন-দরিদ্রের বেশে কলেজে যাইতেন। দূর দূরান্তরে যাইতে হইলেও কখন পদব্রজে ব্যতীত গাড়ীতে যাইতেন না। যে সকল গারোয়ানেরা

পূর্ব্বে তাঁহার নিকট অনেক বখ্‌শিশ পাইয়াছে তাহারা এখন তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া কখন কখন তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া বিনা ভাড়ায় তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিন্তু তিনি এই সকল সুযোগ গ্রহণ করিতেন না। সে সব দিন যে কি অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে তাহা তিনি ও তাঁহার মাতাই জানিতেন। বাহিরের লোকে তাহার শতাংশের একাংশও টের পায় নাই।*

---

* স্বামীর মৃত্যুর পর দারিদ্র্যে পতিত হইয়া ভুবনেশ্বরী দেবীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। ঐ স্বল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতি ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার নির্ব্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই অথচ তাঁহার সুখ-পালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্র সকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যে সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া ন্যায্য অধিকারসকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থিরভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তিশ্রদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ)

কয়েকমাস পরে পাদুকা ব্যবহারও তাঁহার পক্ষে যেন একটা বিলাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইল। পরণে মোটা গুণচটের মত কাপড়, উদরে অন্ন নাই, সমস্তদিন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অনাহারে নগ্নপদে চাকরীর চেষ্টায় দরখাস্ত হাতে অফিসে অফিসে ঘুরিতে হইয়াছে। কখনও কাহারও নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই, বরং পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পাইলে জীবন ধন্যজ্ঞান করিয়াছে, তাহারাও এখন অনেকে তাঁহার দুঃসময় দেখিয়া মুখ বাঁকাইতে লাগিল বা ক্ষমতা সত্ত্বেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইল। দেখিয়া শুনিয়া সংসারটা তাঁহার নিকট আসুরিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইত।

সারদানন্দ স্বামী বলেন—এই সময়ে এক দিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐস্থানে দুই একজন বন্ধু আসিয়া জুটিল ও তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য 'বহিছে কৃপাঘন নিঃশ্বাস পবনে' এই গানটি গাহিতে লাগিল। স্বামিজী বলিতেন, "শুনিয়া মনে হইয়াছিল যেন সে মাথায় গুরুতর আঘাত করিতেছে। বাটীতে বুভুক্ষিত জননী ও ভাইভগিনীদের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় ক্ষোভে, অভিমানে নৈরাশ্যব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, নে নে, চুপ কর্; ক্ষুধার তাড়নায় যাদের মা-ভাইকে কষ্ট পাইতে হয় না, দৈন্য অভাব যে কি তাহা যাহারা কখনও টের পায়নি, টানা পাখার তলায় বসিয়া এসব কল্পনা তাদের ভাল লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কিন্তু কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।" বন্ধুটি বোধ হয় তাঁহার কথায়

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ দিয়া ঐ সকল কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন! নরেন্দ্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিতেন গৃহে খাদ্যদ্রব্য কি আছে না আছে। যেদিন বুঝিতেন অনটন, অথচ হস্তে অর্থ নাই, সেদিন মাতাকে "আমার নিমন্ত্রণ আছে" বলিয়া বাহির হইতেন, বা নিজে সামান্য কিছু খাইয়া অধিকাংশ অপরের জন্য রাখিয়া দিতেন, কোন কোন দিন বা একেবারে উপবাসে কাটাইতেন।

কিন্তু এত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও নরেন্দ্র হৃদয়ে বল হারান নাই বা বাহিরে কোনরূপ দুর্ব্বলতার চিহ্ন ব্যক্ত হইতে দেন নাই। ভিতরে যতই দৈন্য থাকুক না কেন, বাহিরের লোকে তাহা জানিবে কেন? দত্তবংশ চিরদিন মানসম্ভ্রমে সমুন্নত ছিল, হঠাৎ সেই বংশগৌরবকে তিনি নত করিতে পারিলেন না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেক ধনী সন্তান বেড়াইতে যাইবার সময় পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন ও উদ্যানাদিতে গিয়া সঙ্গীতাদি আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু কখনও অন্তরের কথা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও ঐ বিষয়ে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। দেখিতেন বটে, তিনি দিন দিন শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছেন, তথাপি উহার মূলে যে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ ব্যতীত আর কিছু আছে, এরূপ সন্দেহ করিতেন না। স্বামিজী বলিতেন, "সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এইকালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল,

অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল।” এই অবস্থায় আর একদিন কয়েকজন ধনিপুত্র তাঁহাকে এক বাগান-বাটীতে লইয়া গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য আহ্বান করে ও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অমোঘ ঔষধ বলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিবার পরামর্শ দেয়। এমন কি বলিতে লজ্জা হয় যে, উক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবর্গ একজন বারাঙ্গনাকেও তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্ব পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন ও কেন সে ঐরূপ জঘন্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, উহাতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ আছে কিনা এবং সে পরকালের সম্বল কিছু করিয়াছে কিনা ইত্যাদি এমন কতকগুলি কথা উত্থাপন করেন যে, স্ত্রীলোকটী লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করে, এবং আর সকলের নিকট গিয়া বলে, ‘ওরূপ লোকের নিকট কি আমায় পাঠাতে আছে?’ সেখান হইতে বাহির হইয়া নরেন্দ্র পরিচিত যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন, ‘আমি আজ মদ ও মেয়েমানুষ লইয়া আমোদ করিয়াছি।’ বাটিতে স্বীয় জননীর নিকটও ঐ কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ কয়েক ব্যক্তি পরমহংসদেবের কর্ণে এই কথা তুলিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “নরেনের জন্য তোমাদের মাথা ব্যথার দরকার নাই, আমি জানি তাহার দ্বারা জীবনে কখনও যোষিৎসঙ্গ হইবে না।”

এইরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, গোপনে কোন কার্য্য করা চিরদিন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন

ভয় বা লজ্জায় কোন বিষয় লুকাইবার অভ্যাস তাঁহার হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, বা থাকিলেও তাঁহাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি থাকা না থাকাতে কাহারও কিছু আসে যায় না,—নিরাশা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এরূপ ধরণের অভিমানসূচক কথা স্পষ্টবাক্যে লোকের নিকট প্রকাশ করিতে এখন তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হইত না। তাহার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকায় শীঘ্রই রব উঠিল তিনি নাস্তিক হইয়াছেন এবং দুশ্চরিত্র লোকের সংসর্গে মদ্যপান ও বেশ্যালয়ে গমন পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। এই অযথা নিন্দায় তাঁহার আবাল্য-তেজস্বী হৃদয় আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং তিনি আরও ইচ্ছা করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ নিজ দুর্দ্দশা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান বা বেশ্যা-গৃহে গমন করে তাহাতে দোষই বা কি? শুধু তাহাই নহে, যদি তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ করিলে প্রকৃতই সুখ হয়, তাহা হইলে তিনিও ঐরূপ করিতে রাজী আছেন, সেজন্য লোকনিন্দাভয় গ্রাহ্য করিবেন না।

স্বামীজি বলিতেন, "ঐরূপ অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকলের কথা উজ্জ্বলবর্ণে মনে উদিত হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; জীবনে যতই কেন দুঃখকষ্ট আসুক না, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপ দিনের পর দিন যাইতে

লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবের হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, এখনও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না! এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"*

নরেন্দ্র সংসার চালাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'ফ্রী-মেসন' হইলে যদি কোন সুবিধা হয় এই ভাবিয়া

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—৫ম ভাগ।

দিনকতক উহাদের দলে মিশিলেন। কয়েকমাস বিদ্যাসাগরের বহু-বাজারের স্কুলে শিক্ষকতা করিলেন, কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। দিনকতক এটর্ণি নিমাই বসুর articled clerk (এটর্ণি হইবার জন্য শিক্ষানবীশ) হইয়াছিলেন কিন্তু টাকার যোগাড় না হওয়াতে ছাড়িয়া দেন। ফলে এটর্ণির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জ্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণ-পোষণের একটা স্বচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না।

দিনকতক পরে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার কয়েকজন জ্ঞাতি ভদ্রাসনখানি ভাগাভাগি করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। ভদ্রাসনের যে অংশ অপেক্ষাকৃত ভাল ও অধিক পরিসর-

তাঁহারা সেই অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে আদালতে না গেলে মিটে না। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম যাহাতে গৃহের গোলযোগ প্রকাশ্য আদালতে গিয়া লোকের কর্ণে না উঠে তাহার জন্য আপোষে মিটাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু যখন তাহা হইল না তখন তিনি আহত সিংহের ন্যায় দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (Barrister W. C. Bonarji) তাঁহার পক্ষে মকদ্দমা গ্রহণ করিলেন। মামলা অনেক দিন ধরিয়া চলিল, এই উপলক্ষে নরেন্দ্রের সাহস ও বুদ্ধিনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষের ইংরাজ ব্যারিষ্টার তাঁহাকে আদালতের সমক্ষে একজন খেয়ালী ছোকরা (fanatic) প্রতিপন্ন করিবার মানসে 'চেলা' বলিয়া সম্বোধন করেন, কিন্তু নরেন্দ্র ঘাবড়াইবার

পাত্র নহেন। তিনি জানিতেন সাহেব বিদেশী লোক, সুতরাং নিজে চেলা শব্দের অর্থ অবগত নহেন। এজন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Do you know, sir, what a chela is?' (মহাশয় চেলা কাহাকে বলে আপনি জানেন কি?) সাহেব দেখিলেন ছেলেটি বড় সোজা নয়, তিনি আরও অনেক জেরা করিলেন কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। বিচারক নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও তাঁহাকে আইন ক্লাসের ছাত্র জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Young man, you will make a very good lawyer" (যুবক, তুমি একজন ভাল উকীল হবে)। অপর পক্ষের এটর্ণিও আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, "জজ সাহেবের যা মত আমারও তাই, বাস্তবিক আইন-ব্যবসায়ই তোমার উপযুক্ত। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।" মকদ্দমাটি মিটিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়া তাঁহার দেহত্যাগের পরও কিছুদিন চলিয়াছিল; ফলে বিশ্বনাথবাবুর পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু খরচার দায়ে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যে দুঃখকষ্ট গিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। নরেন্দ্র একদিন দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া পরমহংসদেবের কৃপা ভিক্ষা করিতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পা হইতে চটি পড়িয়া গিয়াছিল, পথের ধারের জঙ্গলে হাত পা ক্ষতবিক্ষত কিন্তু তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া পরমহংসদেবের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কি করি বলুন, কি করি? কোন আশা দেখ্‌ছি না। আপনি মা কালীকে বলিয়া কহিয়া

আমাদের সাংসারিক দুঃখ নিবারণের একটা উপায় করিয়া দিন।" পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বয়ং মার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে সম্মত হইলেন না, কারণ দেবদেবীতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু পরে পরমহংসদেবের পুনঃ পুনঃ আদেশে ৺ভবতারিণী দেবীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যাঁহাকে তিনি এতদিন পাষাণময়ী বলিয়া ভাবিতেন তিনি পাষাণময়ী নহেন, সত্যই চৈতন্যরূপিণী, অনন্তস্নেহময়ী, বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। তিনি দেবীর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন, টাকা-পয়সার কথা মনেই হইল না। মাকে দর্শন করিয়া পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, মাকে বলিয়াছিস্ ত?' তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; বলিলেন, 'না মহাশয়, সে-কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।' পরমহংসদেব পুনরায় তাঁহাকে কালীঘরে পাঠাইলেন, কিন্তু সেবারও ঐ প্রকার হইল। এইরূপে নরেন্দ্র সাংসারিক অভাব জানাইবার জন্য তিন তিন বার দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনবারই ধনরত্ন প্রার্থনার পরিবর্ত্তে বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। শেষে পুনরায় পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'যা, মার ইচ্ছায় আজ থেকে আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'

বিশ্বনাথবাবু ইতিপূর্ব্বে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির (ব্যারিষ্টার আর, মিত্রের) কন্যার সহিত নরেন্দ্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন এই দুর্দ্দশার সময়ে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে সংসারের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কারণ কন্যার পিতা যৌতুকস্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ-

বিমুখ নরেন্দ্র কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন এবং এ সময়ে একরূপ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিলেন। মাতা বরাবরই পুত্রের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহার শঙ্কা হইল পাছে সাধুসংসর্গের প্রভাবে তিনি একেবারে সংসার ত্যাগ করেন। অনেক সময় ঐ বিষয়ে কথা উত্থাপিত হইত, কিন্তু নরেন্দ্র স্পষ্ট কোন জবাব দিতেন না। তবে তাঁহার আচরণে বেশ বুঝা যাইত যে, মাতাকে তিনি দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিয়া সহসা কোথাও যাইবেন না। কিন্তু তিনি বিবাহবিষয়ে মাতৃ-অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বাটীর সকলেই তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিলেন। তারপর যখন বুঝিলেন যে তাঁহার উপর আর নির্ভর না করিলেও সংসার চলিবে তখন তিনি অল্প অল্প করিয়া সংসার ছাড়িলেন। প্রথম প্রথম অধিকাংশ সময়ই দক্ষিণেশ্বরে কাটাইতেন, তার পর পরমহংসদেব পীড়ার নিমিত্ত কাশীপুরের বাগানে আনীত হইলে প্রায় সেখানেই থাকিতেন। ক্রমে যত তাঁহার পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই অধিকক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি দিবারাত্রের মধ্যে কখনও তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই।

সংসার ত্যাগ করিলেও নরেন্দ্র একেবারে সংসারের সহিত সকল

সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন না। যখন তিনি কলিকাতায় থাকিতেন তখন মাঝে মাঝে গৃহে যাইতেন। শত-স্মৃতি-বিজড়িত গৃহপ্রাঙ্গণটি তাঁহার নিকট তীর্থের ন্যায় পবিত্র ছিল। তাহার উপর উহা তাঁহার জননীর পদধূলিপূত। জননীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ভগ্নীদেরও এত ভালবাসিতেন যে প্রব্রজ্যাকালে তাহাদের কষ্টে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হইয়াছিলেন। জননীও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। তিনি স্বামিজীর একজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'আমার ছেলে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল।' কিন্তু পরমহংসদেব আরও অধিক দূর যাইতেন। তিনি বলিতেন, 'নরেন আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী', 'নিত্য সিদ্ধের থাক'।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

প্রথম দর্শন হইতে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তাঁহাকে না দেখিলে অধীর হইয়া উঠিতেন ও যাহাকে পাইতেন জিজ্ঞাসা করিতেন—কেন এমন হইতেছে? তিনি বলিতেন, 'নরেন্দ্রের জন্য বুকের ভিতর যেন মোচড় দিচ্ছে।' নরেন্দ্র যে খুব উচ্চ আধার তাহা তিনি প্রথম দিন দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'কল্‌কাতার মত স্থানে এমন সত্বগুণী আধারও থাকিতে পারে!' এবং তাঁহাকে পৃথক্ ডাকিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে অন্য সকলে তাঁহাকে একদেশদর্শী বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে এত ভালবাসিতেন যে সহজে তাঁহার কথা উড়াইয়া দিতেন না। নরেন্দ্র যখন বলিতেন 'রূপ টুপ আপনার মাথার খেয়াল', তখন তিনি কাঁদিয়া মা কালীকে বলিয়াছিলেন, 'মা, নরেন্দ্র বলে এসব আমার মাথার ভুল, সত্যি কি?' মা তাঁহাকে বলিয়া দেন, 'না, ওসব ঠিক—ভুল নয়, নরেন্দ্র ছেলেমানুষ তাই অমন বলে'। তখন আবার তিনি নরেন্দ্রকে বলেন, 'তুই যা খুসি বল্ না কেন, আমি গ্রাহ্য করি না'। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম বুঝিতে পারিতেন না—তাঁহার জন্য পরমহংসদেব অতটা করেন কেন? সেই জন্য একদিন বলিয়াছিলেন, 'আপনার শেষকালে না ভরতরাজার যো হয়! ভরতরাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণ-জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।' পরমহংসদেব এ কথার কোন উত্তর দেন নাই। এক এক সময়ে তাঁহার নিজেরও মনে হইত—কেন এমন

হয়? সামান্য একজন বালক, তাহার জন্য তাঁহার এত চিত্তচাঞ্চল্য হয় কেন? তিনি মার নিকট কাঁদিয়া ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, 'তার ভেতর নারায়ণের সত্তা দেখতে পাস্ বলে অমন হয়।' হাজরা নামে এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে থাকিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি দিনরাত এই সব ছোঁড়াদের ভাবনা ভাবো, ভগবানকে ভাববে কখন?' তাহাতে পরমহংসদেব মার নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, হাজরা বলে নরেন্দ্রের আর এইসব ছেলেদের জন্য এত ভাবি কেন?' তাহাতে মা তাঁহাকে স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন যে, তিনিই সব মানুষ হয়েছেন, তবে শুদ্ধ আধারে তাঁহার প্রকাশ বেশী। তিনি গল্প করিতেন, "সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো হাজরার উপর রাগ করলুম। বল্লুম, 'শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল,' আবার ভাবলুম ও বেচারীরই বা কি দোষ? কেমন করে জানবে?" তিনি আরও বলিতেন, "আমি দেখি ছোকরারা যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রকে যখন প্রথম দেখি তখন তার শরীরের হুঁশ ছিল না। যেই ছুঁলুম অমনি বাহ্যজ্ঞান হারালো। তারপর তাকে দেখবার জন্য প্রাণের ভেতর আকুলি-বিকুলি কর্ত্তে লাগলো। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হতো যে, মনে হত বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা নিংড়োবার মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। তখন আর সাম্‌লাতে পার্ত্তুম না, ছুটে বাগানের উত্তরাংশে চলে যেতুম, ঝাউতলায় যেখানে বড় একটা কেউ যায় না—সেইখানে গিয়ে চীৎকার কর্ত্তাম, 'ওরে তুই আয়রে—তোকে না দেখে আর থাক্‌তে পার্‌ছি না রে।' খানিকটা এই রকমে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌লে তবে মনটা ঠাণ্ডা হতো। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস

ঐ রকম হয়েছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে তাদের কারও কারও জন্য কখন কখন মন কেমন করেছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হয়েছিল তার তুলনায় সে সব কিছুই নয়। একদিন ভোলানাথকে * বল্লুম, 'হ্যাঁ গা, আমার এমন হচ্ছে কেন ?' ভোলানাথ বল্লে, 'এব মানে ভারতে (মহাভারতে) আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে, সত্ত্বগুণী লোক দেখ্‌লে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবুও আবার মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখ্‌বো বলে বসে বসে কাঁদতুম।"

নরেন্দ্রের অদর্শনে তাঁহার এদিকে যেমন এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত, নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতে আবার সেইরূপ অসীম আনন্দ উথলিয়া উঠিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় স্বামীজির বি, এ, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার একদিনের কথা ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের টঙে আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন, আবার কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন পরমহংসদেব আসিয়াছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী।

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন সিঁড়ির মধ্যস্থলেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুই এতদিন যাস্‌নি কেন? তুই এতদিন যাস্‌নি কেন?" বারম্বার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন। পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল, খুলিয়া নরেনকে 'খা, খা' বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনি আসেন তখনি কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁহার জন্য বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোকদ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, "ওরে তোর গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্ম-বাসিনী॥ ইত্যাদি।

"গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন উর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষে এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি বা শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি

জল আনিয়া তাঁহার মুখে সেচন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ‘জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন্ নি—ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুন্‌তে শুন্‌তেই জ্ঞান হবে এখন।’ নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরিলেন—‘একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ্ মা শ্যামা’। শ্যামাবিষয়ক অনেক গান হইল, কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখনও বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, ‘দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন ত যাস্ নি, চল্ না—আবার এখনি ফিরে আসিস্।’ নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটী যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।”

নরেন্দ্রের উপর পরমহংসদেবের ভালবাসা কত গভীর ছিল ও কিরূপ স্নেহচক্ষে তিনি তাঁহাকে দেখিতেন সামান্য লেখনী দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। যে সময় নরেন্দ্র পরিবারবর্গের অন্ন-সংস্থানের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত, তখন তাঁহার মনে হইল যে সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই তাঁহার জন্ম হয় নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইবার সমস্তই ঠিক, এমন সময় পরমহংসদেব একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে জনৈক ভক্তের বাটীতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ভালই হইল, গুরু দর্শন করিয়া এইবার চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিবেন। এই মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পরমহংসদেব

তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র নানা ওজর-আপত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। অগত্যা ঠাকুরের প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, তখন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া পরমহংসদেব সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া নরেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিলেন—

'কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই, (আমার) মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই হা—রাই।' নরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্তরের রুদ্ধ ভাবরাশি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ঠাকুরের ন্যায় তাঁহারও বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুর নিশ্চয়ই সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ আচরণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইবার পর কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' সেই দিন রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া 'জানি আমি তুমি মার কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনও থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক'—এই বলিয়া হৃদয়ের আবেগে পুনরায় অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি ও তাহার স্মৃতি কত মধুর তাহা উপরিলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। যে ভালবাসায় ভেদাভেদ থাকে না, যাহা পরকে আপন করিয়া লয়, যে ভালবাসা বিশ্বপ্রেমের নামান্তর মাত্র, এই চিত্রে পাঠক তাহারই আভাস পাইবেন। স্বামীজি বলিতেন, 'ঠাকুরের এই ভালবাসাই

আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।'

পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'খুব উঁচু ঘর, পুরুষের সত্তা; এত ভক্ত আস্‌ছে, ওর মত একটিও নাই।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি নরেন্দ্রকে কত বড় আধার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সকলেরই ভিতরের অবস্থা উত্তমরূপে জানিতেন এবং সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেন্দ্রের সে রকম আঠারোটা শক্তি আছে।' আর একবার বলিয়াছিলেন, 'দেখ্‌লুম যেন কেশবের ভিতর একটা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বল্‌ছে, আর নরেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাচ্ছে।' অন্যান্য শিষ্যের নিকট হইতে তিনি সেবা গ্রহণ করিতেন, কেহ তাঁহাকে বাতাস করিত, কেহ পা টিপিয়া দিত, কিন্তু নরেন্দ্রকে তিনি কখনও সেবা করিতে দিতেন না। বোধ হয় তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন বলিয়াই ঐরূপ করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, 'তোর পথ আলাদা।'

পরমহংসদেব যে নরেন্দ্রকে অতিশয় উচ্চ আধার বলিয়া মনে করিতেন, একথা তিনি নরেন্দ্রের সম্মুখে এবং তাঁহার অসাক্ষাতে অন্যান্য ভক্তদের নিকটও বহুবার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন—'ও খাপ-খোলা তলোয়ার', 'পুরুষের ভাব ওর ভেতর', 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর', 'সপ্তর্ষির* একজন,' 'নর-

---

* এই সপ্তর্ষি পুরাণোক্ত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নহেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিপথে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন, 'অখণ্ডের রাজ্যে

নারায়ণ ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সাধারণ গুণের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তাঁহার নিকট যে কেহ যাইতেন প্রায় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি নরেন্দ্রকে জানেন কিনা, পরক্ষণেই বলিতেন, 'খুব ছেলে, গাইতে বাজাতে, লেখায় পড়ায়, সব দিকে আছে; যে দিকে যাবে একটা কাণ্ড করে তুলবে' ইত্যাদি।

নরেন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে প্রথম প্রথম অনেকটা অর্দ্ধোন্মাদ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মনে করিতেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এরূপ মনে করা সত্ত্বেও তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র, অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিজে তখন কালী, রাধা প্রভৃতি দেবদেবী কিছু মানিতেন না, আবার অদ্বৈততত্ত্বও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। আমরা শুনিয়াছি একদিন তিনি "সবই ব্রহ্ম"—এই কথা শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ—তাও কি কখন হয়? তা হলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।" কিন্তু অন্য লোকের কথার সহিত পরমহংসদেবের কথার এই পার্থক্য ছিল যে, অন্যে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মের কথা বলে, পরমহংসদেবের পুঁথিগত বিদ্যা মোটেই ছিল না, সমস্তই সাধনলব্ধ জ্ঞান। সুতরাং তিনি যে কথা বলিতেন, তাহার মধ্যে খুব একটা জোর আছে বুঝিতে পারা যাইত। তা ছাড়া পরমহংসদেব শুষ্ক বিচার অপেক্ষা বিবেক-বৈরাগ্য-যুক্ত বিচার ও প্রেমভক্তিকে ঈশ্বরলাভের পক্ষে অধিকতর অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। নরেন্দ্রকেও তিনি ক্রমশঃ এই পথে

'দিব্য-জ্যোতিঃঘন-তনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সমাধিস্থ হইয়া আছেন' এবং নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহাদেরই একজন বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতীর্ণ বুঝিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ে এই বিষয় সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে।)

পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী মহা-শুদ্ধ-সত্ত্ব আধার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই বলিতেন, "এ নিত্যসিদ্ধের থাক।" আরও বলিতেন, "এ যেদিন নিজেকে জানতে পারবে সেদিন আর দেহ রাখবে না।" নরেন্দ্রের মায়া-রাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কিঞ্চিৎ মায়ার প্রভাব না থাকিলে পাছে তিনি জগতের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে স্ব-স্বরূপে প্রয়াণ করেন, এই ভয়ে তিনি মহামায়ার নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেন—"মা, ওর ভেতর একটু মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজ হবে না।" এইরূপ উত্তম অধিকারী প্রাপ্ত হইয়া পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহারই সাহায্যে আবার সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইবে। তাই তিনি সযত্নে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের ভ্রান্ত সংস্কারগুলির উচ্ছেদ-সাধন করিতেছিলেন। যে নরেন্দ্র প্রথমে কিছুই মানিতেন না, ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন, তিনি ক্রমে সবই মানিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিপদে পরমহংসদেবকে বাজাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কথা বা উপদেশ বিনা প্রমাণে সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই। প্রথমে তাঁহার প্রত্যেক কথায় সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিতেন, তারপর পুনঃ পুনঃ তাহাদের সত্যতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়া শেষে ওরূপ অভ্যাস অনেকটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। অনেক সময় পরমহংসদেব যাহার-তাহার হাতে জল খাইতেন না, বা যাহার-তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না। নরেন্দ্র মনে করিতেন উহা কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ লোকগুলি

বিশুদ্ধচরিত্র নহে। প্রথমে একথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস হয় নাই; পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলা অতি হীনচরিত্রের!

ভদ্রবেশী সাধারণ লোকদিগের অতি গোপনতম পাপ বা নিন্দনীয় আচরণও যে পরমহংসদেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর ছিল না, তাহা উপরোক্ত ব্যাপার হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু নরেন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার উপর এই সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষের এরূপ অটল বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রায় বলিতেন, "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। ও যদি শোর গরুও খায় কোন দোষ হবে না।" ইহা দ্বারা বোধ হয় তিনি নরেন্দ্রকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পর্য্যায়ে ফেলিতেন।*

এদিকে নরেন্দ্র সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা, কিন্তু তাঁহার ভুল-ভ্রান্তি দেখিলে তিনি কখনও তাহার সমর্থন করিতেন না।

---

* ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংসদেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভক্তসকলকে তদ্রূপ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; তিনিই আবার বলিতেন—'নরেন্দ্র ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার কোন প্রত্যবায় হইবে না। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্যদোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, সেজন্য যেখানে-সেখানে যা-তা ভোজন করিলেও তাহার মন কখন কলুষিত হইবে না—জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা সে সর্ব্বদা মায়ার সমস্ত বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোনমতে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না'—এইরূপ কত কথাই তিনি তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মাড়ওয়ারী ভক্তেরা পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, 'ওরা নিষ্কামভাবে দান করিতে জানে না, এক খিলি পান দিবার সময়ও ষোলটা কামনা করে দেয়, ঐরূপ দ্রব্য ভোজনে ভক্তির হানি হয়'; কিন্তু তাহাদের প্রদত্ত ঐ সকল দ্রব্য নরেন্দ্রকে খাইতে দিতেন ও বলিতেন, 'ওতে ওর কোন হানি হবে না, ও সব হজম করে ফেলবে।'

নরেন্দ্র একবার পরমহংসদেবের নিকট ভক্তের ভগবদ্-বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তিনি তদুত্তরে বলেন—"বিশ্বাসের আবার অন্ধ কি করে? বিশ্বাসমাত্রেই ত অন্ধ! বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বল্ শুধু 'বিশ্বাস', না হয় বল 'জ্ঞান'। তা না হয়ে আবার 'অন্ধবিশ্বাস', 'চোখওয়ালাবিশ্বাস'—এ কি রকম!"

নরেন্দ্র ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, বই পড়িয়া বা পরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা ধর্ম্ম নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম অনুভূতিসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে দর্শন করা চাই, তাই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কিনা। কারণ যদিও তিনি তৎপূর্ব্বে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে একজন ধর্ম্মোন্মাদ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তখন বাঙ্গলার নব্য যুবকগণের নেতা। নরেন্দ্র নিজেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন, দেবদেবী কিছুই মানিতেন না। কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে যখন তাঁহার ধারণা হইল যে, ঈশ্বর অনুভূতির গোচর, অথচ সেই ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে মহর্ষির নিকট হইতে কোন প্রকার আভাস প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়িয়া পরমহংসদেবের চরণাশ্রয় করিলেন এবং ধ্যানধারণা, তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য ও বিচারসহায়তায়, সর্ব্বোপরি অবতারকল্প সদ্গুরুর কৃপায় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লাভ করিলেন। পরমহংসদেবের শিক্ষায় ও তাঁহার জীবনদৃষ্টে তিনি শেষে সাকার নিরাকার দুই-ই মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মও মানিতেন, আবার কালী, কৃষ্ণ, শিবও মানিতেন। এ বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কিন্তু ইহা বিষম সংগ্রামের ফলে সাধিত হইয়াছিল। এ সংগ্রামে দাঁড়াইয়াছিলেন—একদিকে

মূর্ত্তিমান সনাতনধর্ম্ম, অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নব্যতন্ত্র; এ দুয়ের সংঘর্ষে পরিশেষে কিন্তু সনাতনধর্ম্মেরই জয় হইল!

পরমহংসদেবের মহিমময় চরিত্রে যুবক নরেন্দ্র এতদূর মোহিত হইলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর সংসারের অনন্ত দুর্দ্দশা, জননী ও ভাইভগিনীগুলির বিষাদকরুণ মুখচ্ছবি, অনশন অর্দ্ধাশন কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন। দারুণ দুঃখে হৃদয় জর্জ্জর, তথাপি যেন হৃদয়ের মধ্যে কাহার ডাক শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহাকে কালীঘরে গিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ধনরত্নাদি প্রার্থনা না করিয়া তিন তিন বার শুধু জ্ঞান-ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রথম প্রথম তিনি অদ্বৈতবাদ বুঝিতে পারিতেন না। 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ'—এরূপ মনে করা কি ঘোর অপরাধ ও স্পর্দ্ধা নয়? কিন্তু পরমহংসদেব তাঁহাকে কেবল অদ্বৈত প্রতিপাদক শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে উপদেশ দিতেন। অন্যান্য শিষ্যদিগকে তিনি সাধারণতঃ ভক্তিশাস্ত্রই পাঠ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈতমূলক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছিলেন, এবং তিনিও প্রথম প্রথম ঐ সকল গ্রন্থ স্বয়ং পাঠে অনিচ্ছুক থাকিলেও পরমহংসদেবের কথায় তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে তিনি বুঝিলেন, অদ্বৈততত্ত্বই চরম ও পরম সত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন বেদান্তাদি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। ১৮৮৫ সালে কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেবের পীড়ার সময় নরেন্দ্র এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই অনেকটা দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তিনি খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন ও হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেন। কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র

সত্যলাভের জন্য বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, মনে দারুণ অশান্তি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী ও বিল্বতরুমূলে সাধন করিবার জন্য পরমহংসদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; পরমহংসদেব সহর্ষে বলিলেন, "পড়াশুনো কি ছেড়ে দিবি নাকি?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "মশায়, যদি এমন একটা ওষুধ পাই যা খেলে এ পর্য্যন্ত যা কিছু শিখেছি সব ভুলে যেতে পারি, তাহলে প্রাণটা যেন বাঁচে।" এই সময়ে তিনি প্রায় প্রত্যহ রাত্রে কাশীপুরের বাগান হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়া পঞ্চবটীতে ও বিল্ববৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া সাধনা করিতেন। অনেক সময় ধ্যান করিতে করিতে ললাটের অভ্যন্তরে একটা ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন। উহাকে পরমহংসদেব ব্রহ্মযোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অনেক সময় আবার দেখিতেন ধুনির ধারে নানা দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। ঐরূপ সাধনের ফলে ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক অশান্তি ও সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং কিছু শক্তিও লাভ হইয়াছিল। কালী (অভেদানন্দ) নামক একজন গুরুভ্রাতাকে একদিন তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে বলেন, তিনি ঐরূপ করায় যেন একটা বৈদ্যুতিক্ তেজের ন্যায় কি অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অন্তঃসুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট অনেক ভক্ত যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণে নরেন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। একদিন তিনি বৈষ্ণব-মতের সার মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, "তিনটী বিষয় পালন করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম ও নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে। সেইরূপ ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা ও পূজা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার—

এ কথা ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় আসিয়া বলিতে বাগিলেন—“জীবে দয়া!—দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!”

লীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, “ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎসংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া, তাহাদিগের উপর ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল যে, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে। জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে,

যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—সবই তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে অল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিবে।

"এই বলিয়া দেখাইলেন, ঠাকুরের ঐ কথায় শুধু জ্ঞানমার্গ নহে, ভক্তি, কর্ম্ম, রাজযোগাদি সকল মার্গের লোকই বিশেষ আলোক পাবেন।"

নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর পরে পরমহংস-দেবের গলাভ্যন্তরে ক্যানসার (কর্কট রোগ) নামক ক্ষত হয় ও তন্নিবন্ধন তিনি চিকিৎসার্থ প্রথমে কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে ও তাহার কিছুদিন পর কাশীপুরের বাগানে আনীত হন। ইহার প্রায় আট মাসকাল পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শেষের এই কয় মাস গৃহস্থ ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার চিকিৎসাদি ব্যাপারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শশী প্রভৃতি কয়েকজন যুবকভক্ত প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য সতত তৎসান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নরেন্দ্রই এই যুবক সেবকগণের অগ্রণী ছিলেন। এই সময়েই কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ পরমহংসদেবকে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং কঠিন ও ক্লেশকর পীড়াসত্ত্বেও পরমহংসদেব সতত তাঁহা-দিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত; চিকিৎসকগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি জগৎ-কল্যাণ-সাধনে বিরত থাকিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণের ভিতর বৈরাগ্য, নিরভিমানিত্ব প্রভৃতি

জাগাইয়া তুলিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে সমীপস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া মাধুকরী করিতে আদেশ করিতেন এবং তাঁহারা ঐরূপ করিলে তিনি বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিতেন। এই সময়ে একদিন পরমহংসদেব তাঁহাদের ডাকিয়া ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারাও তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষাপাত্র হস্তে পল্লীমধ্যে বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। এইকালে তিনি একদিন যুবক ভক্তদের যাঁহারা সেবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেন তাঁহাদিগকে গেরুয়া প্রদান করিয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন ও তদবধি তাঁহাদের যেথানে-সেথানে আহারাদি করিলেও কোন দোষ স্পর্শিবে না বলিয়া দেন।

রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের কয়েক দিবস পূর্ব্বে, তাঁহার শিষ্যেরা একদিকে যেমন তাঁহাকে পাছে হারাইতে হয় মনে করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ধ্যান-ধারণা ও তপস্যাদিতে অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইতে-ছিলেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের যন্ত্রণানিবারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া নিতান্ত হতাশভাবে ছুটাছুটি করিতেন। একদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে করিয়াই হউক পরমহংসদেবের যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সন্ধ্যার পর হইতেই 'রাম', 'রাম', শব্দ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বাগানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল মানসিক আবেগে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু ভিতরে দারুণ অশান্তির আগুণ জ্বলিতেছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি ঐরূপ করিয়া বেড়াইলেন এবং যতই রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, ততই

তাঁহার কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। রজনীর শেষ যামে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার উক্তবিধ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখে, সেইজন্য একজনকে বলিলেন, "যা নরেনকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।" কিন্তু নরেন্দ্রকে কেহই থামাইতে পারিল না। তখন সকলে তাঁহাকে এক প্রকার জোর করিয়া ধরিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই ও রকম কচ্চিস্ কেন? ওতে কি হবে?" কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় বলিলেন, "ত্থাখ্, তুই এখন যেমন কচ্চিস্ এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি বাবা!"

কাশীপুরের বাগানটি ক্রমশঃ একাধারে তীর্থ ও শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। নিত্য মহা মহা পণ্ডিত ও ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল এবং দর্শনাদি শাস্ত্র বিষয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও স্তোত্রাদিরও অভাব ছিল না। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে বলিতেন, "মশায়, এমন একটা ওষুধ দিন যাতে আমার মনের ব্যারামগুলো যায়!" পরমহংসদেব তখন হয় তাঁহাকে গান গাহিতে বলিতেন, অথবা বলিতেন, "যা, ধ্যান কর্‌গে"; এবং ঐ সকল ধ্যানকালে নরেন্দ্রের বহুবিধ বিচিত্র অনুভূতি হইত। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।" তাহাতে নরেন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, "হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্যি বলে না বোধ হয় ততক্ষণ কিছুই বলব না।" পরমহংসদেব তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও মুক্তকণ্ঠে নিঃসন্দেহে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস দেখিয়া প্রীতই হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র এমন কি এ কথাও বলিয়া-

ছিলেন, "আমি ঈশ্বরও চাই না। আমি চাই শান্তি,—সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্।'

এই কালে সাধনপ্রভাবে নরেন্দ্রের এক অদ্ভুত রকমের দর্শন হইত। ধ্যানাবস্থার পরে দেখিতেন, যেন ঠিক তাঁহারই মত আর একজন কে আসিয়াছে। আকার-প্রকার ও অবয়বাদির গঠন অবিকল তাঁহারই মত। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, "এ আবার কে?" সে মূর্ত্তিটি অনেক সময়ে এক ঘণ্টারও উপর তাঁহার নিকট থাকিত। তিনি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেও ঠিক সেই সময়ে কথা বলিত। তিনি যেরূপ করিতেন, সেও ঠিক সেইরূপ করিত, তিনি কখনও তাহাকে ভেংচাইতেন, সেও ঠিক সেইরূপ করিত। প্রথম প্রথম এইরূপ হইলে তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, "ইহা ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ।"

১৮৮৬ সালে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে (শিবানন্দ ও অভেদানন্দ) সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়া দর্শনে গমন করেন। ললিতবিস্তর ও ত্রিপিটক পাঠে ভগবান বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগ ও বৈরাগ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সাধনস্থল দেখিবার জন্য নরেন্দ্রের মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল; বুদ্ধগয়াযাত্রা তাহারই ফল। গয়ায় পৌঁছিয়া ফল্গুতে স্নান ও ভিক্ষাদি করিয়া তাঁহারা পদব্রজে বোধগয়ায় গেলেন ও সেখানকার মোহান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহান্তজী তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধগয়ার প্রত্যেক স্থল বিশেষ অভিনিবেশসহকারে দর্শন করিলেন। সেই শত শত বৎসরের অতীত কীর্ত্তিধামের প্রতিরেণু একদিন ভগবান তথাগতের চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল—স্মরণ

করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয় ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে বোধিবৃক্ষতলস্থ প্রস্তরবেদীতে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দ্দিকে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্র সহসা দরবিগলিতাশ্রু হইয়া সমীপবর্ত্তী গুরুভ্রাতার কণ্ঠে হস্তার্পণপূর্ব্বক অতি প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। গুরুভ্রাতা তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, নরেন্দ্র আবার গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। তিনি কেন যে ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে রহস্য ভেদ করিবার আর উপায় নাই। খুব সম্ভবতঃ ধ্যানযোগে তথাগতের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া যেন তাঁহারই চরণালিঙ্গন করিতেছেন, এই ভাবিয়া সম্মুখে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

যাত্রাকালে তাঁহারা পরমহংসদেব বা আর কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহাদের অকস্মাৎ অদর্শনে সকলেই বিচলিত হইয়া-ছিলেন। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। একে অপরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার উপর নরেন্দ্র সকলেরই নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। সেই নরেন্দ্রের এইরূপ অদর্শনে তাঁহারা কি হইল কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং সকলে মিলিয়া পরমহংসদেবের কাণে একথা তুলিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু মৃদুহাস্য করিলেন। তারপর বলিলেন, "সে কোথায়ও যাবে না, তাকে এখানে আস্‌তেই হবে।" এই বলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটী বলিলেন,—"দেখ্, একটা ময়ূর একজনের বাগানে রোজ আস্‌ত, সে লোকটা খাবারের সঙ্গে একটু আফিঙ্ মিশিয়ে ময়ূরটাকে রোজ খেতে দিত। দিনকতক পরে ময়ূরটার এমনি

অভ্যাস হয়ে গেল যে বাগানে না এসে আর থাকতে পারত না। নরেনেরও জানবি সেই অবস্থা। এদিক ওদিক যাচ্ছে বটে কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে কোথায়?"

কিন্তু তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন নরেন্দ্রাদি ফিরিলেন না, তখন তাঁহারা উদ্বিগ্নচিত্তে নরেন্দ্র যাহাতে ফিরিয়া আইসে তাহার উপায় করিবার জন্য পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। পরমহংসদেব তাহাতে মাটিতে একটি দাগ কাটিয়া বলিয়াছিলেন, "এর বেশী আর তাদের যাবার ক্ষমতা নেই।" এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নরেন্দ্রাদি প্রত্যাগমন করিলেন। বুদ্ধগয়ায় তাঁহারা তিন দিবস রহিলেন। নরেন্দ্রের আরও অধিক দূর ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদ্বয় পরমহংসদেবের সংবাদ না পাইয়া কাতর হইয়া পড়ায় তিনি অগত্যা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইলেন ও নৃত্যগীতবাদ্য করিয়া আনন্দের হাট বসাইলেন।

কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি ভাল হ'লে তুই যা চাইবি, দেব।" তাহাতে নরেন্দ্র একদিন বলেন, "কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন, তা হলে আমার কি হবে?" পরমহংসদেব অন্যমনস্ক ও কতকটা স্বগতভাবে বলিয়াছিলেন, "শালা বলে কি?" বোধ হয় তিনি প্রাণতুল্য প্রিয় শিষ্যের অমূলক আশঙ্কা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন নরেন্দ্রের ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি কোনও গুরুর বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে না। যাহা হউক, তারপর তিনি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন,

"আচ্ছা তুই কি চাস্ বল্।" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ছি ছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্? এ তো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। নারে, অত ছোট নজর করিস্‌নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্ত্তির ভিতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর্। একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত দু'ই হ।"

উপরোক্ত তিরস্কারসূচক বাক্যে নরেন্দ্রের চক্ষু হইতে অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পরমহংসদেবের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে পরমহংসদেব তাঁহাকে সমাধিলাভ করিতে নিষেধ বা নিরুৎসাহ করিতেছেন না, কিন্তু সেই অবস্থালাভই তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, ইহাই বলিতেছেন। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে কোটি কোটি জীব ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে তাহাদেরও উপায় করা তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধারণ লোকেরাই আপন মুক্তির প্রয়াসী হয়, কিন্তু নরেন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ পুরুষের পক্ষে (যাঁহাকে তিনি নিত্যসিদ্ধ বা আচার্য্যকোটির থাক বলিয়া উল্লেখ করিতেন) ঐরূপ মুক্তির প্রয়াসী হওয়া বিশেষ শ্লাঘনীয় নহে। রাজপুত্র কি মুটে মজুরের ন্যায় দুই চারি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে শোভা পায়?

ঘটনাক্রমে কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র নির্ব্বিকল্পভূমিতে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শিষ্যেরা অনেকেই ধ্যানে বসিয়াছেন, কেহ কেহ রামকৃষ্ণদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, কেহ বা দূরে বাগানের এক কোণে নিম্নস্বরে ভগবৎ-সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্র ও গোপালদা নামে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একজন এক গৃহে ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়াছেন। সহসা একটা কাতর চীৎকার শব্দে গোপালদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ণে গেল যেন নরেন্দ্র বলিতেছেন—"গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল?" গোপালদা ত্রস্তে দৌড়াইয়া গিয়া নরেন্দ্রের শরীরের স্থানে স্থানে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন নরেন, এই যে!" কিন্তু নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, তাঁহার মস্তকটি মাত্র আছে আর কিছুই নাই। গোপালদা তো কিছু বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আর সকলকে সাহায্যার্থ ডাকিতে লাগিলেন। সকলে দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারাও কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন উপরের ঘরে পরমহংস-দেবকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। ঘটনাটি শুনিয়া ঈষৎ ভ্রুভঙ্গী সহকারে বলিলেন, "বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল!"

রাত্রি এক প্রহর এইভাবে কাটিয়া গেলে নরেন্দ্র ক্রমশঃ সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেলেন, তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার সময় চরণদ্বয় চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু

আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ কত্তে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলবো।” তারপর তিনি তাঁহাকে শরীরের প্রতি অযত্ন করার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া আহার ও সঙ্গী নির্ব্বাচনবিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন।

সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে কিরূপ অবস্থা হয় তাহার পরিচয় আমরা কতকটা পাইলাম। কিন্তু সমাধিকালে অন্তরে কিরূপ অনুভূতি হয় সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই হয় না। স্বামিজী স্বয়ং “নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর” এই গানটিতে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেদিনকার ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল। তিনি শয়নাবস্থায় ধ্যান করিতেছিলেন, হঠাৎ অনুভব করিলেন যেন মস্তকের পশ্চাদ্দেশে উজ্জ্বল আলোকরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। ক্রমে সেই আলোক আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ নয়ন-সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতেছে, বিশ্বসংসার টলিতেছে, ক্রমে মন একেবারে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গিয়া এক অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। দেশ-কাল-পাত্রের আর কোনও বোধ রহিল না; শুধু ব্রহ্মসত্তা ভাসিতে লাগিল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, “সেদিন দেহাদি বুদ্ধির এককালে অভাব হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়,—যেন মহাসমুদ্রে জল—জল—আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।” সমাধি অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া আসার পর তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন মস্তক ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি সেই অবস্থায় গোপালদাকে ডাকিয়াছিলেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধ্যানাবস্থা কিরূপ পরিপক্কতা লাভ করিয়া-

ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অবগত হইতে পারা যায়। একদিন স্বনামধন্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছিলেন; সেস্থলে এত মশকের উৎপাত ছিল যে গিরিশবাবু কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মশক-দংশনে অস্থির হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন তাঁহার শরীরের উপর এত অধিকসংখ্যক মশক বসিয়া আছে যে, বোধ হইতেছে যেন তিনি একখানি কৃষ্ণবর্ণের কম্বল দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে গিরিশবাবু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তারপর পা ধরিয়া ঘন ঘন ঠেলিতে লাগিলেন, তাহাতেও নরেন্দ্রের চৈতন্য হইল না। অবশেষে যখন গিরিশবাবু নরেন্দ্রের আসন ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যহীন দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহা মৃতদেহবৎ কঠিন এবং সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য। ইহার অনেকক্ষণ পরে তিনি বাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিনি নরেন্দ্রকে আপন সকাশে ডাকিতেন ও অন্যান্য শিষ্যগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ নরেন্দ্রকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি শীঘ্রই পাপপূর্ণ মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া নরেন্দ্র সময়ে সময়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন। দেহত্যাগের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন ও সম্মুখে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ

হইয়া পড়িলেন। স্বামীজি বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল যেন পরমহংসদেবের শরীর হইতে তড়িৎ-কম্পনের মত একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কতক্ষণ এইভাবে ছিলেন তাহা তাঁহার মনে ছিল না। বাহ্য-চেতনা হইলে দেখিলেন, পরমহংসদেব অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন! তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব সস্নেহে বলিলেন, "আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।" নরেন্দ্রনাথও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তর ভাবপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছিল না। তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

লীলাবসানের দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে আপন সকাশে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "দেখ্ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।" নরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও বাক্য নির্গত হইল না। শুধু ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি প্রভুর শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? হায় হায়, এতদিনে সব শেষ হইতে চলিল! ঐরূপ একদিন পরমহংসদেব এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "নরেন লোকশিক্ষা দিবে।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, এই আদেশ পালন করিতে সমর্থ হইবেন কিনা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পারবো না।" তাহাতে পরমহংসদেব জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, "কত্তেই হবে, তোর ঘাড় করবে।"

অতিলৌকিক বিষয়ে নরেন্দ্রের এত অধিক সন্দেহ এবং ঐ সকল পরীক্ষা করিবার আগ্রহ তাঁহার এরূপ প্রবল ছিল যে, পরমহংসদেবের শেষ মুহূর্ত্তে যখন প্রাণবায়ু বহির্গমনোন্মুখ হইয়াছে তখনও তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন, 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" কি আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্তে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!" এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে নরেন্দ্র এত বিস্মিত হইলেন যে, যদি সে সময়ে কক্ষমধ্যে বজ্রপাতও হইত তথাপি বোধ হয় তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। এরূপ দেবদুর্লভ মহাপুরুষকে এতদূর ক্ষুদ্র সন্দেহের পাত্র মনে করায় তখন তাঁহার অন্তরে বিষম অনুতাপের উদয় হইল এবং তিনি অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

* * *

ইহার দুই দিবস পরে পরমহংসদেব লীলা সংবরণ করেন। অধ্যাত্মরাজ্যের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে অস্তমিত হইল।

* * *

আমরা এখানে পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। কারণ তিনি যে কি ছিলেন তাহা কোনও কালে কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং স্বামিজী পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন, "লোকে ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলে—সে সব partial truth (আংশিক

সত্য) মাত্র। যে যেমন আধার সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে আলোচনা কচ্ছে। ঐরূপ করাটি মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেউ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বলছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বলছেন—চৈতন্যদেব নারদীয় ভক্তি প্রচার কত্তে জন্মেছিলেন, কেহ বলছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহীভক্তদের মুখে শুনবি,—ওসব কথায় কাণ দিবি নি। তিনি যে কি, কত কত পূর্ব্বগ অবতারের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনব্যাপী তপস্যা করেও একচুল বুঝ্‌তে পাল্লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন, তাঁর ভাবসমুদ্রের একবিন্দু উচ্ছ্বাসের ধারণা কত্তে পেলে মানুষ তখনই দেবতা হয়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়? —এই থেকেই বোঝ্‌ তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়!"

* * * *

পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ আরও কয়েক দিন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিলেন, কারণ যে সময়ের জন্য বাগান ভাড়া লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইতে আরও এক সপ্তাহ বাকী ছিল। সন্ন্যাসী-শিষ্যদিগের সকলেই দিনে একবার করিয়া সেখানে যাইতেন, কেহ কেহ বা দিবারাত্র সেখানে থাকিতেন। তবে সন্ধ্যার পর অনেকেই সেখানে উপস্থিত হইয়া ধ্যান-ধারণা, পরমহংসদেব সম্বন্ধে কথোপকথন, তাঁহার পূজা ও ধর্ম্মসঙ্গীতাদিতে

সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহাদের প্রাণে যে বিষম বেদনা জাগিতেছিল তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখনই দুইজন একত্র হইয়াছেন, অমনি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা, কখনও বা যে গৃহে তিনি ছিলেন তাহার মেজেতে গড়াগড়ি—এইরূপে কয়েক দিন কাটিল। গৃহী শিষ্যেরাও আসিতেন, তাঁহাদেরও ঐরূপ ভাব। সে স্থানের প্রতি ধূলিকণাতে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের স্মৃতি ও প্রভাব বিরাজ করিতেছিল।

তাঁহার তিরোধানের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন রাত্রে নরেন্দ্র ও তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা চিন্তামগ্ন-ভাবে একত্রে উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উভয়েরই নেত্রপথে পতিত হইল।—এ কি?—এ যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিচ্ছবি! দুইজনেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র উহা তাঁহার নিজের ভ্রান্তিদর্শন হইতে পারে এই আশঙ্কায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহার গুরুভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন, "নরেন, দেখ দেখ!"—তখন তাঁহার সংশয় দূর হইল। বুঝিলেন সত্যই তিনি জ্যোতির্ম্ময়রূপে দর্শন দিয়াছেন। তখন তাঁহারা আর সকলকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিতে আসিতেই সহসা সেই জ্যোতির্মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার ভস্মাবশেষ ও অস্থি একটি তাম্রকলসে রক্ষা করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেই ঘরে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া এই সময়ে তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীদের ইচ্ছা ঐগুলি গঙ্গাতীরেই সমাহিত করা হয়, কারণ তিনি গঙ্গাতীর ভাল-

বাসিতেন; কিন্তু গৃহীরা বলিলেন—প্রথমতঃ, গৃহী ব্যতীত আর কাহারও ঐগুলিতে অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ, অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসীরা নিঃসম্বল, তাঁহাদের নিজেদেরই মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, উহার উপর আবার ঐ সব অস্থি ও ভস্মাবশেষ রাখিবেন কোথায়? সুতরাং তাঁহারা ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্ররোচনায় ঐগুলি কাঁকুড়গাছির উদ্যানে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সন্ন্যাসীরা—বিশেষতঃ শশী ও নিরঞ্জন মহারাজ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং উভয়পক্ষে ক্রমশঃ বিষম কলহের সূত্রপাত হইল। এই গোলযোগের সময়ে নরেন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গৃহীদিগকে 'অস্থি দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন এবং সকল সন্ন্যাসী-ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা কি মনে করিস্ ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকিলেই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া যায়, না উহাই তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ? যদি আমরা তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা বরং আমাদের উচিত তাঁহার উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করা। আয়, আমরা সেই চেষ্টা করি।" এই কথায় সকলে সম্মত হইলে স্বামীজি অপর সকলের সহিত একত্রে দেহাবশেষ-পাত্রটী নিজশিরে বহন করিয়া কাঁকুড়গাছির উদ্যানে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহার অভ্যন্তরস্থ পূত দেহাবশেষের অর্দ্ধাংশেরও অধিক বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্পদিন পরে উহা মঠে লইয়া গিয়া নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা করা হয়। অনন্তর চতুর্দ্দশবর্ষ পরে উহা স্বামীজি কর্তৃক মহা-মহোৎসবে বেলুড় মঠে আনীত ও তথায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা

কাশীপুর বাগানবাটীর মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সময় অচিরে আগত হইল। এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সশরীরে নাই—সুতরাং যাঁহারা বাগানের ভাড়া দিতেছিলেন তাঁহারা বাগান ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায়, সকলেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইল। অনেক তর্কবিতর্ক হইল, কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত হইল না; গৃহীদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, "উহারা যে সাধারণ সাধুদের ন্যায় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহা হইতে পারে না। উহারা এখনও বালক, সারাজীবন পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগের নিকট কত আশা ভরসা আছে। অতএব এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়ান অপেক্ষা উহারা বরং গৃহে ফিরিয়া যাউক।" কিন্তু সন্ন্যাসীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। গৃহে ফিরিয়া যাওয়া?—অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাদের কয়েকজন বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহাদের পিতা, অভিভাবক ও আত্মীয়গণ এক্ষণে বুঝাইতে লাগিলেন যে বি, এ, পাশ করিয়া যাহা হয় করা উচিত। যদি তাঁহারা সংসার না করিতে চাহেন তাহা হইলেও অন্ততঃ পাশটা করা উচিত, কারণ তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা আরও বাড়িবে বই কমিবে না। এই ভাবের খুব পীড়াপীড়ি, প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন চলিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পরীক্ষা দিতে বা পারিবারিক ব্যাপার শেষ করিয়া আসিবার জন্য পুনরায় গৃহে গমন করিলেন। ইচ্ছা—ঐগুলি শেষ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

কিন্তু কয়েকজন সন্ন্যাসী ইতোমধ্যেই একপ্রকার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোথায় যান—এই লইয়া গৃহীদের মধ্যে নানা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে বলরাম বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এই চারিজনের একান্ত ইচ্ছা যে ঐ সকল যুবক সন্ন্যাসীরা একত্র মিলিত হইয়া একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। কিন্তু অপর গৃহী ভক্তেরা বলিলেন যে, ঐরূপ করিলে পরিণাম ভাল হইবে না, কারণ টাকা কোথায়? যুবক সন্ন্যাসীরা তদুত্তরে বলিলেন, "অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের উপদেশ পাইয়া ও তাঁহার জীবনে জ্বলন্ত বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া এখন কি আবার সংসারকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে যাইব? তিনি কি বলেন নি—'সন্ন্যাসী সঞ্চয়ের কথা ভাবিবে না,' 'কাল কি খাইব—এ চিন্তা করিবে না?' কে টাকা চায়? আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব—তারপর তিনি আছেন।" যাঁহারা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাঁহারাও বলিলেন, "আমাদেরও যেই পরীক্ষা শেষ হইবে অমনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিব।" এই সকল ত্যাগী যুবকের এবংবিধ দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সজলনয়নে কহিলেন, "ভাই রে! তোরা কোথায় যাবি? তোদের কোথাও যেতে হবে না, বা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে না। আমরা যে কয়জন গৃহীভক্ত আছি, যা পারি সামান্য কিছু দিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করবো, তোরা সব সেখানে থাকবি। আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে সংসারের জ্বালা জুড়াব। আমি ত কাশীপুরের বাগানের দরুণ আগে কিছু কিছু দিতাম, সেটা আর বন্ধ করবো না। তাতেই একটা ছোট বাড়ী নিয়ে তোরা থাকবি, আর যা জুটবে তাই খেয়ে সাধন-ভজন করবি,—ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াতে পাবি না।"

সুরেন্দ্রবাবু একজন অদ্ভুত হৃদয়বান ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে আদর করিয়া দানা (অর্থাৎ শিবানুচর) বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার উপরোক্ত কথানুসারে বরাহনগরে একটি বাটী ভাড়া লওয়া হইল। বাড়ীটি অনেক দিনের পুরাতন ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বহুদিন হইতে লোকজন না থাকাতে উহা পড়ো বাড়ীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, এমন কি তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অপবাদ ইহার রটিয়াছিল। লোকে বলিত ঐ বাড়ীতে ভূত আছে। সে যাহা হউক বাড়ীটি যে অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় বহু বৎসর পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন লোক ভাড়া দিয়া সেখানে থাকিতে সম্মত হইত না—ভয়, পাছে ছাদ খসিয়া ঘাড়ে পড়ে! রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ভূত বা মৃত্যুর ভয় বিশেষ ছিল না। তাঁহারা দেখিলেন বাড়ীটির ভাড়া কম, আর গঙ্গার নিকটে, অথচ সহরের গোলমাল হইতে অনেক দূরে, ধ্যান-ধারণার কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই আশ্রম ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত এইখানেই ছিল এবং ইহারই নাম বরাহনগর মঠ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মঠটি গঠিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীদের কেহ না কেহ স্থায়ীভাবে এখানে থাকিতেন, কেহ বা দিনকতকের জন্য তীর্থভ্রমণে যাইতেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই থাকিতেন। যাঁহারা গৃহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রায় প্রত্যহ এখানে সমাগত হইতেন। নরেন্দ্রনাথ এই দলের প্রধান ছিলেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্য তিনি একেবারে সংসার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; মধ্যে মধ্যে গৃহে গিয়া সাংসারিক অভাব-অভিযোগ শ্রবণ ও নিবারণের চেষ্টা

করিতে হইত। তবে দিবসের অধিকাংশ সময় এবং রাত্রিটা মঠেই কাটাইতেন। এই যে এতগুলি যুবক সন্ন্যাসী একত্র মিলিত হইয়া একটা নবসঙ্ঘে পরিণত হইল, ইহার প্রধান উদ্যোক্তাই নরেন্দ্রনাথ। তিনিই ইহার পরিচালক, উৎসাহদাতা ও কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। সংসারের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্ত মঠের চিন্তা হইতে বিরত ছিলেন না। ক্রমে তাঁহার সাংসারিক গোলযোগ মিটিয়া আসিল। যখন দেখিলেন ঝঞ্ঝাট চুকিয়াছে, তখন তিনি, যাঁহারা জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিবেন বলিয়া গৃহে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে মঠে আকৃষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। দিবসের মধ্যে কখন কাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। সকলেই তাঁহার আগমন-ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরীক্ষার জন্য পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু তিনি একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপর্য্যুপরি করাঘাত করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য করিতেন। সেখান হইতে তাঁহাদিগকে রাজ-পথে টানিয়া লইয়া গিয়া অভিভাবকদিগের অসাক্ষাতে ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন—"তোরা সব কি জীবনটা একজামিন্ দিয়েই কাটাবি ঠিক করেছিস্? এই কি তাঁর উপদেশ পালন করা! এই কি তাঁর মনোমত কার্য্য! এই জন্যই কি তিনি এত কষ্ট সহ্য করে গেলেন! সন্ন্যাসী হয়েছিস্, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিস্, তবু একজামিন্ পাস করে সংসারের উন্নতিকামনা করিস্? ত্যাগ ও ভোগবাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? ধিক্ তোদের! শীগ্‌গির ও সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল।" এবম্প্রকার ভর্ৎসনা-বাক্যে, কখনও বা ধীরভাবে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে মঠে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় গুরুভাইদের পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে দপ্

করিয়া জ্বলিয়া উঠিত ও সংসারকামনার ক্ষীণ বীজ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাইত। তাঁহারা নরেন্দ্রের বাক্যে অনুতপ্ত হইয়া পাঠাদি ত্যাগ করিয়া মঠে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দুই একদিন থাকিয়াই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। পুনরায় নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া অগ্নিময়ী ভাষায় সকলের প্রাণে বৈরাগ্য-বহ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ গুরুভ্রাতাদিগের মন টলিল। সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, যাঁহারা পারমার্থিক পথের পথিক, যাঁহারা ইন্দ্রিয়রাজ্য ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের জন্য অগ্রসর, তাঁহাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য অতি সামান্য, সাংসারিক বিদ্যাশিক্ষা অতি হেয়! সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পরীক্ষায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন ও একে একে মঠে আসিয়া যোগদান করিতে লাগিলেন।* ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে

---

* এইরূপ মন পরিবর্ত্তনের আর একটি প্রধান কারণ আঁটপুরের ঘটনা। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রেমানন্দ স্বামীর মাতা স্বীয় আঁটপুরের বাটীতে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। এখানে তাঁহারা কয়েক দিবস একত্র সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া এরূপ মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন যে, অতঃপর আর বাটীতে ফিরিয়া না গিয়া মঠেই অবস্থান করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। আঁটপুরে একদিন স্বামীজি এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় খৃষ্টমাহাত্ম্য বর্ণনা করেন যে সকলে একেবারে সেই মহাপুরুষের ভাবে তন্ময় হইয়া যান। দৈবক্রমে সেদিন যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিবসের অধিবাস রজনী (Christmas Eve)। কিন্তু প্রথমে তাহা কেহই জানিতেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, ঐদিন অজ্ঞাতসারে এরূপ আলোচনা নিশ্চয়ই বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট ঘটনা। সেই দিন হইতে তাঁহাদের সকলের মনে সঙ্ঘগঠনের বাসনা দৃঢ়বদ্ধ হইল।

তাঁহারা সকলেই একেবারে গৃহ ছাড়িয়া মঠে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহ-সংসার সব ভাসিল,—আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগকে নূতন পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

দৃপ্ত সিংহের ন্যায় তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য তাঁহাদের হৃদয়কে আপনার বিপুল শক্তি সাহায্যে বজ্রবৎ দৃঢ় করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর! সুখের ক্রোড়ে লালিত এই সকল ভদ্রসন্তানেরা যাহাতে ত্যাগমার্গের দাবদাহ-সহনে অসমর্থ হইয়া দুর্ব্বলচিত্তে পলায়ন না করেন তাহার জন্য তিনি অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহাদের মনকে বলীয়ান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সানন্দে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন; তাঁহারা জানিতেন যে, প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই হস্তে তাঁহাদিগের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন, —তাঁহার উপর ঠাকুরের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া নরেন্দ্রের নিজেরও এমন একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, কেহই তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না। তাঁহার গমনভঙ্গী, চক্ষুর মোহিনী শক্তি, ওজস্বিনী ভাষা ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শকমাত্রেরই প্রাণে স্বতঃই তাঁহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আনিয়া দিত। গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মনে করিতেন, "নরেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেই ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন", কেহ ভাবিতেন, "ইনি তাঁহারই প্রতিনিধি।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে সহোদরতুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সতত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে বেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। তবে প্রয়োজন হইলে কঠোর অস্ত্রও প্রয়োগ করিতে জানিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নবগঠিত সঙ্ঘ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। নরেন্দ্রনাথ হইলেন তাহার অধিনায়ক।

মঠস্থাপনার পরেও মাঝে মাঝে ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগের

অভিভাবকেরা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা কখনও কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনাদি করিতেন, কখনও বা ভয় দেখাইতেন ও শাসাইতেন এবং সকল দোষ নরেন্দ্রের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিতেন—"এই ছোঁড়া হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এরা সবাই বাড়ী গিয়ে দিব্যি পড়াশুনো করছিল, এ-ই ওদের টেনে-হিঁচড়ে এখানে নিয়ে এলো, আর যত কু-পরামর্শ দিতে লাগলো!' এরূপ অভিযোগ শুনিয়া নরেন্দ্র ও অপরাপর সন্ন্যাসীরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেন না এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাদের মনঃক্ষোভ-প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে শেষে বলিতেন, "আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখন ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।" শশীর পিতা যখন শশীকে গৃহে ফিরিবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যে একবার সংসার ছেড়ে এসেছে, তার কাছে সংসার বাঘের বাসা।"

অগত্যা অভিভাবকেরা তাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা ও অটল অধ্যবসায় দর্শনে তাঁহাদের গৃহপ্রত্যাগমন-বিষয়ে একরূপ নিরাশ হইয়া ঐরূপ চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠ বরাহনগরে ও ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটস্থ আলমবাজারে ছিল। সেখান হইতে কিছুদিনের জন্য বরাহনগরের অপর পারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাটীতে উঠিয়া যায়, পরিশেষে স্থায়ীভাবে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মঠ-স্থাপনার পর হইতে এই সকল যুবকগণের মধ্যে প্রীতিবন্ধন ও ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং কঠোর অনল-পরীক্ষার মধ্যে দিন দিন তাহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল।

সে কি ভীষণ পরীক্ষা! আহারের কোন সংস্থান নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, দাসদাসী কিছুই নাই, হস্তে অর্থও নাই; ভিক্ষায় অনভ্যস্ত, দানগ্রহণে পরাঙ্মুখ, কাহারও নিকট বিশেষ সাহায্যেরও কোন প্রত্যাশা নাই—এইরূপ অবস্থার মধ্যে এই সকল তেজস্বী যুবক হৃদয়ের বল মাত্র সম্বল লইয়া, প্রভুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলেন। এ সাধনা শুধু স্ব স্ব মুক্তিকামনায় নহে। পাঠক দেখিবেন, এ সাধনায় ভারতের—শুধু ভারতের কেন—সমগ্র জগতের কল্যাণসাধন নিহিত রহিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক-নাম 'সুরেশবাবু') এই মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ন্যায় মহদন্তঃকরণ লোক এ জগতে দুর্লভ। মঠের এই সকল যুবকদিগকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। যাহাতে ইঁহাদিগের কোন অভাব-অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে তিনি সতত লক্ষ্য রাখিতেন এবং কায়মনোবাক্যে ও অর্থদ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বরাহনগরের মঠের ভাড়া তিনিই বহন করিতে স্বীকৃত হন, পূর্ব্বে একথা বলিয়াছি। মঠ স্থাপিত হইলে তিনি গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে মঠে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সংসারের সব খরচ নিজের ঘাড়ে লইলাম, তুমি মঠে থাকিয়া মঠের গৃহকর্ম্মাদি করিবে এবং প্রত্যহ বা একদিন অন্তর আমার নিকট আসিয়া মঠের ভাইদের খবর দিবে। বিশেষ করিয়া এইটি মনে রাখিও যে, যখনই তাহাদিগের খাদ্যাদির অভাব দেখিবে তখনই যেন তাহা আমার কর্ণগোচর হয়।" গোপাল পরমহংসদেবকে জানিত ও নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিত। তাহার দুইটি অল্পবয়স্ক ভ্রাতা ও বিধবা মাতার জন্য সে পূর্ব্বে মঠে যোগ দিতে পারে নাই। সুতরাং এখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দসহকারে মঠে আসিয়া বাস ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য

করিতে লাগিল। সে যখনই দেখিত যে ব্যাপার সুবিধা নয়, তখনই সুরেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিত। "আজ সমস্ত দিন মঠে উপবাস গিয়াছে," কি "কাল রাত্রি হইতে সকলে অনাহারে আছেন", এইরূপ এক একটা খবর লইয়া যখন সে সুরেশবাবুর নিকট উপস্থিত হইত, তখন তিনি অবিলম্বে তাহাকে টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইতেন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মঠে লইয়া যাইতে বলিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিতেন যেন একথা প্রকাশ না হয়, কারণ তিনি জানিতেন কথাটা প্রকাশ পাইলে মঠের ভাইরা আর কখনও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। গোপাল এই সকল জিনিষপত্র লইয়া মঠে উপস্থিত হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন কোথা হইতে সে সব আসিল। গোপালও চতুরতার সহিত উত্তর দিত, "ওঃ, এ সব একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত কিছুতেই নেবো না, কিন্তু তিনি ভারী পীড়াপীড়ি কর্ত্তে লাগলেন,—কি করি, কাজে-কাজেই নিয়ে আসতে হলো।" মঠের ভাইরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, 'প্রভুর মহিমা কে বুঝিতে পারে! তিনি কাহাকে দিয়া কি কার্য্য করাইতেছেন তাহা আমরা কি বুঝিব?'

ধন্য সুরেন্দ্রনাথ—ধন্য তোমার প্রেম! সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বামীজি স্বয়ং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস ত? তিনি এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগর মঠের সব খরচপত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবতো। তাঁর ভক্তি-বিশ্বাসের তুলনা হয় না।"

———

বরাহনগর মঠে তপস্যা

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রকৃত একনিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রত্যহ যে কি সুখের হিল্লোল প্রবাহিত ও আনন্দের কলতান উত্থিত হইত তাহা লেখনী কি ব্যক্ত করিবে! সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিরাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, কাহারও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিবোধ বা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা নাই। ব্যাকুল ঈশ্বর-দর্শন-লালসা দাবাগ্নির ন্যায় প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রজ্জলিত, নরেন্দ্রাদি কেহ কেহ প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প। যে দিন যেমন জুটিত সেইদিন তেমন আহার হইত। স্বামীজি স্বয়ং এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছুই নাই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। দিনকতক হয়ত শুধু নুন-ভাত চললো, কিন্তু কাহারও গ্রাহ্য নাই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন-ভাত,—এই মাসাবধি চলছে। আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?"

খাওয়া-দাওয়ার ত এই অবস্থা। তার উপর লোকজন নাই, সুতরাং ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, জল তোলা—এমন কি মাঝে মাঝে রন্ধনাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য নিজেদেরই করিতে হইত। প্রত্যেকেই অপরের পরিবর্ত্তে স্বয়ং কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত। কার্য্যের মধ্যেই আবার দিবারাত্র ধর্ম্ম, দর্শনাদির আলোচনা চলিতেছে, এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, আদৌ আহার জুটে নাই অথচ ধর্ম্ম-

প্রসঙ্গেরও বিরাম নাই। তাহার মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পরিধানের জন্য প্রত্যেকের একখানি কৌপীন ও এক টুকরা গেরুয়া বস্ত্র। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য একখানি মাত্র সাদা কাপড় ও একখানি চাদর দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান থাকিত, যাঁহার যখন বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইত তিনি তখন উহা ব্যবহার করিতেন। গৃহসজ্জায় অন্যান্য উপকরণের মধ্যে একখানি চাদরঢাকা মাদুর—তাহার উপর রাত্রিতে শয়নকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, গুটিকতক জপের মালা ও দেওয়ালের গায়ে দুই চারিখানা ঠাকুরদেবতার ছবি ও একটা তানপুরা, আর প্রায় শতখানেক সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী কেতাব—এগুলি ভক্ত-বন্ধুদিগের প্রদত্ত উপহার।

তখন স্বামীজি একদমে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতেন; কাজ করিতে করিতে যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া অপর সকলকে জাগ্রত করিবার জন্য "জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী" গানটি গাহিতেন। তারপর সকলে ধ্যান করিতে বসিতেন এবং বেলা দ্বিপ্রহর বা ততোধিককাল পর্য্যন্ত ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিতেন। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। জোয়ান অব আর্ক ও ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির গল্প হইত। কখন কখন স্বামিজী কার্লাইলের ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব নামক গ্রন্থ হইতে সুদীর্ঘ অংশসমূহ আবৃত্তি করিতেন এবং সকলে সমস্বরে দুলিতে দুলিতে 'সাধারণ তন্ত্রের জয় হৌক', 'সাধারণ তন্ত্রের জয় হৌক'—এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে শশী মহারাজ তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া স্নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সৎপ্রসঙ্গ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত এবং

তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুইঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। তাহার পর মধ্যরাত্র বা তাহারও পর পর্য্যন্ত সকলে একত্রে ছাদে বসিয়া 'সীতারাম' নাম গান করিতেন। গভীর রাত্রে এবম্প্রকার উচ্চ ধ্বনিতে সময় সময় প্রতিবেশিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই—তাঁহারা তখন আপন ভাবেই তন্ময়।

প্রথম প্রথম মঠের সন্ন্যাসীরা প্রচারকার্য্যের বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরলাভই তখন তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার পর যদি আবশ্যক হয়, তবে পরমহংসদেবের ন্যায় নীরবে পরোক্ষভাবে আপনাদের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচারকার্য্য করিবেন—এইরূপ সংকল্প ছিল। এই ভাবটী নরেন্দ্রনাথই তাঁহাদের মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, প্রথমে নিজেদের লাভ করিতে হইবে, তারপর অপরকে দান, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রচারকের ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। তখন তিনি বলিতেন, "সকলেই প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত কিন্তু তারা না জেনে প্রচার করে, আমি সেটা জেনে করব। এমন কি তোরা যে আমার গুরুভাই, তোরাও যদি তার প্রতিবন্ধক হ'স তবুও আমি ছাড়ব না, দীনহীন চণ্ডালের কুটীরে পর্য্যন্ত গিয়ে প্রচার করে আস্‌ব।" তিনি বলিতেন, "প্রচারের অর্থ প্রকাশ (expression)—এই দেখ ত্রৈলঙ্গস্বামী; দিনরাত বিশ্বেশ্বরের চরণে পড়ে রয়েছেন, মুখে একটি কথা নেই, জিজ্ঞাসা কল্লে কোন উত্তর দেন না। তবু কি ভাবিস্, তিনি কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন না? মৌনই তাঁর প্রচার। এই মৌনভাষায় তিনি জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তার সাক্ষী দেখ, গাছপালা-গুলো পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত

উপাখ্যানটী বর্ণনা করিতেন—এক রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? সাধুটী কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। রাজা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন অসহিষ্ণু ভাবে পুনরায় ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সাধু উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ত অনেক-ক্ষণ হইতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কারণ নীরবতাই তাঁহার লক্ষণ।"*

উপরোক্ত উপদেশমতে সন্ন্যাসীরা নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেন।

বস্তুতঃ সে সময়ে বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রপ্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা যে উৎকট সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে অতি বিরল। যাঁহারা মঠে সে সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও বলেন, "সে যে কি কঠোর তপস্যা, তাহা মুখে কি বলিব? সে কঠোরতা সহ্য করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।" অথচ সন্ন্যাসীরা নিজে তাহাকে বড় বিশেষ কঠোর বা কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, বা তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, "ওঃ! ঠাকুরের কি অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা ছিল! তিনি যা দেখাইয়াছেন আমরা তার এক আনাও করিতে পারিতেছি না। হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা কি অপদার্থ!" কিন্তু বাস্তবিক নরেন্দ্রের কার্য্য দেখিলে তখন মনে হইত, তিনি তপস্যানলে আপনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মনে হইত যেন

* উপনিষদে আছে—বাহ্বঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"মৌনমেব ব্রহ্ম"।

তাঁহার অন্তরের প্রবল ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর-সন্দর্শন-তৃষ্ণা দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধ্যানে বসিতেন এবং সমস্ত রাত্রি নিস্পন্দভাবে আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সে সময়ে অপর কেহ তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইত না। যতক্ষণ অন্ধকার থাকিত তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। অবশেষে যখন পূর্ব্বদিক উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত তখন তিনি ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। সমস্ত রাত্রি একাগ্রতা সাধনের অদম্য চেষ্টায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিত, মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রাণ অব্যক্ত পুলকে পরিপূর্ণ হইত।

অন্যান্য সাধুরাও এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে কঠোর সাধনে নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পিপাসা মিটিত না, প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'হায় হায়! আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না।'

বাস্তবিক সে সময়ে মঠ-ভ্রাতারা দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবে তন্ময় থাকিতেন। এমন দিন বা সময় ছিল না যে সময়ে তাঁহার স্মৃতি একেবারে মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা এ সময়ে মঠে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা এই সাধুগণের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে ভাবিতেন, 'ইঁহারা কে?—চক্ষু হইতে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছে, দেখিতে উন্মাদের মত!' বাস্তবিকই ইঁহারা ঈশ্বরের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিধ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কয়েক প্রহর নিস্পন্দভাবে বসিয়া ভগবৎধ্যান করিতেছেন, কেহ বা অধ্যাত্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তরে চিদানন্দসুখ অনুভব করিতেছেন। স্বামীজি নিজে যেমন এ সকল বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন আর সকলকেও তেমনি উৎসাহ দিতেন। তাঁহার নিজের জীবনটা এমন একটা আদর্শস্বরূপ ছিল

যে, তাঁহার সম্মুখে থাকিলে কেহই জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তাঁহারা সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে চলিয়া যাইবেন। সে সময়ে তাঁহাদের নিকট জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্যুই যদি হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্মশানে রাত্রিযাপন করিতেন ও চিতানলের শত শত লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে কেমন করিয়া এ নশ্বর মানবদেহের শেষ চিহ্ন চিরদিনের মত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয়, তাহা দেখিতে দেখিতে মৃত্যুচিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। কেহ কেহ, জগন্মাতার রূপ দর্শন না করিয়া ছাড়িব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতেন। কেহ সারাদিন সারারাত মালাই জপিতেছেন, আবার কেহ বা সত্যলাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রতি রজনী একটা প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।

এইভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিতেন যে, গুরুভ্রাতারা অত্যন্ত কঠোর অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, এমন কি তাহাতে শরীরের অনিষ্ট-সম্ভাবনা, তখন বলিতেন, "তোরা কি মনে করেছিস্ সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি?—তা হয় না রে! রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়—একবারই আসে।" কখনও বলিতেন, "তাঁর মুখে পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের কথা শুনেছিস্ ত? তোরা হচ্ছিস্ সেই পিঁপড়ে, আর ভগবান চিনির পাহাড়। তোদের এক একটা দানা পেলেই পেট ভরে যায়, কিন্তু মনে কচ্ছিস্ পাহাড়টা শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবি।"

উপরোক্ত সাধন ব্যতীত মঠে প্রত্যহ মন্ত্রপাঠের সহিত ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া ঠাকুরের পূজা হইত। সন্ধ্যার সময়

ঠাকুরের আরাত্রিক ও ভজনগান হইত, এবং শত অভাব-অনটনের মধ্যেও ঠাকুরের নিত্যভোগের ব্যবস্থা ছিল। স্বামীজি কর্ত্তৃকই এই পূজা প্রথম মঠে প্রবর্ত্তিত হয়।

সকলেই একযোগে মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং স্বামীজি সকল কার্য্যেরই মূল উৎস ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় কেহ শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সমকক্ষ ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ভ, সে না থাকিলে মঠ চলা অসম্ভব হইত।"

বাস্তবিক আর সকলে তীর্থপর্য্যটন বা তপস্যাদিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শশী মহারাজ ঠাকুরপূজা ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ ভক্ত জগতে দুর্লভ। তিনি ছিলেন একাধারে মঠের পাচক, পূজারী ও গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক। সকলে যখন ধ্যানধারণায় ব্যস্ত তখন তিনিই মঠের অত্যাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ কাজগুলি সম্পন্ন করিতেন, সকলকে জোর করিয়া স্নানাহারাদি করাইতেন। তিনি নিজেও জপধ্যান যথেষ্ট করিতেন, কিন্তু মঠের গৃহকার্য্যগুলির উপর তিনি যতটা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন অপরে ততটা পারিতেন না। স্বামীজি বলিতেন, "ওঃ, শশীর কি অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল! শশীই ছিল মঠের কেন্দ্রস্বরূপ। ভিক্ষে-শিক্ষে করে ঠাকুরের ভোগরাগান্তে সকলের খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা থেকে রাঁধা-বাড়া ও সকলকে খাওয়ান পর্য্যন্ত সব কাজ তাকে দেখতে হতো। আমরা ভোর ৩টার সময় উঠতুম, তারপর কেউ স্নান কর্ত্তো, কেউ বা অমনিই ঠাকুরঘরে গিয়ে জপধ্যানে বসে যেতো। এমন অনেক দিন গেছে যে ভোর ৪।৫ টার সময় থেকে সন্ধ্যে ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী আমাদের খাবার নিয়ে বসে

থাকতো, সময়ে সময়ে জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতো। তখন আমাদের জপধ্যানে এত মন গিয়েছে যে, বিশ্ব থাক বা যাক কিছুই গ্রাহ্য নেই।”

এ তো গেল তপস্যা ও সাধন-ভজনের কথা। এ ছাড়া গুরুভাই-দিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করিবার জন্য স্বামীজী বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বরাহনগরের মঠে একটা বড় হলঘর ছিল, সকলে তাহাকে ‘দানাদের ঘর’ বলিত। সেখানে ধর্ম্ম, সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, জড়-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাদানুবাদ চলিত, গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ হইত, আবার ক্যাণ্ট, মিল, হেগেল, স্পেন্সার—এমন কি নাস্তিক ও জড়বাদীদিগের মতামতও পঠিত এবং সমালোচিত হইত। সে সভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা প্রায়ই এক-যোগে তাঁহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিতেন। তিনিও প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া সকলের যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাঁহারা তর্কে অসমর্থ হইলে আবার তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিতেন। যদি প্রশ্ন উঠিত ঈশ্বর আছেন কিনা, সভাপতি তর্কবলে প্রমাণ করিতেন, ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ওটা মনের কল্পনা মাত্র। আবার তিনিই কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমাণ করি-তেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। হয়ত শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে কথা উঠি-য়াছে, নরেন্দ্রনাথ শঙ্করকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আগাগোড়া দেখাইলেন শঙ্করের যুক্তিতে বহুবিধ দোষ বিদ্যমান। আবার তিনিই কিঞ্চিৎ পরে বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিতেন যে শাঙ্কর দর্শনই একমাত্র সত্য দর্শন এবং তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য। এইরূপে সাংখ্য-বেদান্ত-ন্যায়-যোগাদি ষড়্‌দর্শনই সভামধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত ও

ব্যাখ্যাত হইত। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব দর্শন, তন্ত্র-পুরাণ, দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বহুল তর্ক-বিতর্ক, তুলনা ও সমালোচনা চলিত। সকল প্রসঙ্গ, সকল আলোচনা পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে পরিসমাপ্ত হইত। নরেন্দ্রনাথ কথায় কথায় সম্পূর্ণ নূতন পথে গিয়া পড়িতেন ও সেখান হইতে দেখাইতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ত্তমান হিন্দু জাতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রভাব কতটা এবং সে প্রভাবের মূল্য কত। দেখাইতেন, যে ছিন্নমূল হিন্দু-ধর্ম্ম বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারীবিহীন জীর্ণতরীর ন্যায় ক্রমাগত ভাসিয়া চলিতেছিল, পরমহংসদেবের চরণস্পর্শে সেই তরী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে ও গন্তব্য-দিক নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন তোরা বুঝ্‌তে পারবি যে, লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য পরমহংসদেব কি করিয়াছেন!" এই সকল গুরুতর আলোচনার অবসরে মধ্যে মধ্যে গুরুগীতা, মোহমুদ্গর বা ঐ জাতীয় অন্য কোন সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি বা প্রসাদ-সঙ্গীত, কি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত গান করা হইত।

স্বদেশ বা সমাজ সম্বন্ধে কথা উঠিলে হয়ত কয়েকদিন তাহাতেই কাটিয়া যাইত। হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতার মূল কোথায়—সে সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ একটী বেশ উদার ধারণা জন্মাইয়া দিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্রাট্ আকবর পর্য্যন্ত প্রত্যেক শক্তিশালী ভারতসন্তান কেমন করিয়া এদেশে জাতিগঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহাতে কিরূপে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা তিনি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া অতি বিশদভাবে বুঝাইতেন। ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, অনেক সময় মুসলমানজাতীয় কোন লোককে সম্মুখে দেখিবামাত্র শ্রদ্ধার সহিত

অভিবাদন করিতেন। তাঁহার মনে হইত, সে ব্যক্তিও ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার একটী অঙ্গবিশেষ। অনেক সময় আবার স্বদেশের ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য জাতির ইতিহাসও আলোচিত হইত। তাহার মধ্যে গিবনের রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতন এবং কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস প্রধান।

উপরোক্ত দানাদের ঘর ব্যতীত মঠে আর একটি ঘর ছিল, সকলে তাহার নাম রাখিয়াছিলেন কালী তপস্বীর ঘর। এই গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কালী (স্বামী অভেদানন্দ) দিনরাত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। তিনি এরূপ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন যে, সময়ে সময়ে দিবারম্ভ হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম থাকিত না। অনেকদিন মঠের ভ্রাতারা প্রাতঃকালীন ধ্যান-ধারণা সমাপনান্তে এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং স্বামীজীর সহিত বহু বিষয়ের আলোচনায় রত থাকিতেন, কখন বা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ঐরূপ করিতেন। এক একদিন এক একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত ও ঐ প্রসঙ্গ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত চলিত। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুই একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব। মনে করুন, একদিন বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উঠিল। মঠের সকলেই প্রথমে ললিতবিস্তর নামক পুস্তকখানি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন, পরিশেষে তাঁহাদের মন পুস্তকোক্ত বিষয়ের চিন্তায় এরূপ মগ্ন হইয়া গেল যে, তাঁহারা বর্ত্তমান ছাড়িয়া একেবারে অতীতে ডুবিয়া গেলেন। যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ভগবান বুদ্ধদেবের সহিত বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহে বা সারনাথে চলিয়াছেন, বা বোধিবৃক্ষের তলে তাঁহার সত্যলাভ বা নির্ব্বাণদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ভগবান তথাগতের ত্যাগ-বৈরাগ্য তখন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের

হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা কখনও তাঁহার চিতারোহণদৃশ্য অনুভব করিয়া যেন আনন্দাদি বুদ্ধশিষ্যের সহিত অবিরল অশ্রুবর্জ্জন করিতেছেন, কখনও বা বোধ করিতেছেন যেন কুশীনগরের মল্লরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, আবার কখনও বা মনে হইতেছে যেন নাগসেন অথবা মিলিন্দ রাজের সহিত বৌদ্ধদর্শনের গভীর তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সম্রাট অশোকের শিলালিপি-ক্ষোদন, কারলী, এলিফাণ্টা ও অজন্তার গিরিগুহার বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন, সারনাথের বিহার, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রাধান্যকালের সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও কীর্ত্তির সহিত আপনাদিগকে একীভূত করিয়া ফেলিতেন। বৌদ্ধকাহিনীর আলোচনায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী স্পন্দিত হইত। মহাযান, হীনযান প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ ও নবপ্রকাশিত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক প্রভৃতি পাঠে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে কতকগুলি বৌদ্ধ শ্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইভাবে কিয়দ্দিন চলিবার পর স্বামীজি তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে বিমুক্ত করিয়া দিনকয়েকের জন্য হিন্দু অবতার, ভক্ত ও আচার্য্যগণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনায় নিয়োজিত করিতেন। রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, রামদাস, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনসমূহ একে একে ছায়াচিত্রের ন্যায় তাঁহাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাসিত হইত, এবং কি করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের শক্তি ও প্রভাব পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবাসীকে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিত।

এইরূপে দেশকালপাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাদের কল্পনা সুদূর বেৎলেহাম নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইত এবং তাঁহারা সাধুশিরোমণি ঈশার জীবনলীলা আদ্যন্ত মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেন। রাখালগণের নিকট দেবদূত কর্ত্তৃক সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব-বার্ত্তা-জ্ঞাপন হইতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার তনুত্যাগ পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী একে একে তাঁহাদের মানসপটে সমুদিত হইত। মনে করিতেন—তাঁহারা যেন বরাহনগরের উদ্যানে উপবিষ্ট নহেন, খৃষ্ট-লীলাভূমি জেরুশালেমে উপস্থিত। মহর্ষি ঈশার প্রতি স্বামীজি এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন যে, কথিত আছে কোন সময়ে খৃষ্টজননী ম্যাডোনার (Sistine Madonna) একখানি চিত্র তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি শিশু খৃষ্টের পাদস্পর্শ করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে কোন শ্বেতাঙ্গ শিষ্যা অবতারবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় বলিয়াছিলেন, "যদি আমি খৃষ্টের সময়ে পেলেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে শুধু আমার নয়নধারায় নহে কিন্তু হৃদয়ের শোণিত দ্বারা তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিতাম।"

এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস খৃষ্ট-আদর্শের আলোচনায় অতিবাহিত হইলে সকলে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন। জ্ঞান ও প্রেমের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্রবণ—আদর্শের সেই অত্যুন্নত ধাম—সে কি বিস্মৃত হইবার ?—কখনই নহে। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিত ও অবিরল নেত্রবারি নির্গত হইত, কখনও বা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী হৃদয় প্লাবিত করিয়া সকলকে অতল প্রেমসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত করিত।

এই সময়ে মঠে সকল ধর্ম্মের বড় বড় পর্ব্বগুলি যথাবিহিত অনুষ্ঠান সহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় একটী ধুনি

জ্বালিয়া সকলে ধুনির চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যীশুখৃষ্টের জন্মকথা, তাঁহার আবির্ভাববার্ত্তা প্রচার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন। একবার তাঁহারা 'গুডফ্রাইডে'র উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত বড় কৌতুকাবহ। সমস্ত দিবস উপাসনায় কাটিয়া গিয়াছে। আহার নামমাত্র—একপ্রকার উপবাস বলিলেই হয়, কারণ শুধু গোটাকতক আঙ্গুরের রস জলমিশ্রিত করিয়া সকলে এক এক চুমুক পান করিয়াছিলেন। সকলেরই হৃদয় ভাবাতিশয্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে দ্বারে একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল, "কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।" আনন্দে আত্মহারা হইয়া দশ-পনের জন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, সকলেই ব্যাকুল, একজন খৃষ্টানের মুখ হইতে ঐ দিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন। কিন্তু লোকটী বলিল, "আমি Salvation Army (মুক্তি ফৌজ) এর লোক। Crucifixion (ক্রুশবিদ্ধ) এর কথা জানি, কিন্তু গুডফ্রাইডের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা দুটী পর্ব্ব পালন করিয়া থাকি—একটী খৃষ্টের জন্মদিন, আর একটী জেনারেল বুথ-এর জন্মদিন।" সন্ন্যাসীরা এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'সেকি, যেদিন তোমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন সেদিনের বিষয় তুমি কিছু জান না!' তাঁহারা আশাভঙ্গে এতদূর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন যে, পাদ্রী বেচারার হাত হইতে তাঁহার বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় একটু পরে তাঁহাদেরই মধ্যে আর একজন সে লোকটীর উপর দয়াপরবশ হইয়া অন্য দ্বার দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দিয়া গোপনে তাঁহার পুস্তকখানি প্রত্যর্পণ করেন। তিনি তাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া দ্রুতগতি মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'ইঁহারা কারা? দেখিয়া বোধ হয় যেন খৃষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী।'

কখনও কখনও নরেন্দ্রনাথ মঠের ভ্রাতাগণের নিকট সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ও সেণ্ট ইগ্নেসিয়াস্ লয়োলার কাহিনী এবং যে ভাবে ফ্রান্সিস্কান ও জেসুইট ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিতেন। আবার অনেক সময় ঈশানুসরণ (Imitation of Christ) নামক পুস্তকের ভাব তাঁহাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেন। এই পুস্তকখানি এ সময়ে মঠের সকলেরই প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল, পরে উহার স্থান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধিকার করে। ক্রমে ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহাদের এতদূর অনুরক্তি জন্মিয়াছিল যে তাহার মধুরত্ব অপরকে আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া ঐ গ্রন্থের কয়েকশত খণ্ড ক্রয় করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) মঠে প্রথম শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে সকলে নরেন্দ্রের নবরচিত 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গান ধরিলেন; তারপর সারাদিন উপবাসে ও রাত্রিটা পূজা-উপাসনায় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে পূজাবকাশে নরেন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ এবং নৈশ-নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া সকলের সমস্বরে 'শিব গুরু,' 'শিব গুরু' বা 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম নৃত্য। সকলেরই গাত্রে ভস্মবিলেপন ও নয়নে বৈরাগ্যের অনলাভা —সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এইভাবে বরাহনগরের মঠে দিন কাটিতেছিল। অনেক সময়ে আবার মঠে একটি শব্দও শ্রুতিগোচর হইত না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকণ্ঠের মধুর 'মা, মা ব্রহ্মময়ী' শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। কখন কখন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একাকী বিল্বতলে

গান গাহিতে গাহিতে তিনি অন্তরের নিভৃততম রাজ্যে চলিয়া যাইতেন—বাহ্যজগতের কোন ভাবই আর সেখানে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না।

এতক্ষণ আমরা মঠের ভিতরের কথা বলিলাম, কিন্তু ক্রমে মঠের সন্ন্যাসীদিগকে আবার অনেক বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। স্বামী সদানন্দ বলিতেন, "সে সব কি গুলজারের দিনই গিয়াছে। এক মিনিট হাঁফ ছাড়িবার যো ছিল না। দিনরাত বাহিরের লোক আসা যাওয়া করিতেছে। পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন—ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, কিন্তু স্বামীজি একমুহূর্ত্তও তাহাতে কাতরতা, বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। কি আধ্যাত্মিক বিদ্যা, কি সাধারণ বিদ্যা—তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

"বড় বড় পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাঁহারা সন্ন্যাসিগণের সহিত ধর্ম্ম বা দর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত বচন ও শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া গোঁড়ামির ভিত্তি বেশ পাকা করিবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজি প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি দেখাইতেন যে, সংস্কৃত বিদ্যা বা শাস্ত্রের মূলসকল এ-দেশীয় লোকের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের উন্নতি-অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ। দেশকে উপেক্ষা করিয়া, দেশবাসীর প্রাণের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রকে দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য। শাস্ত্র কতকগুলি মনগড়া কাল্পনিক নিয়মমাত্র নহে, কিন্তু জাতির গঠন ও পরিপুষ্টিই তাহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

"আবার যখন খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীরা আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের অসারত্ব প্রতি-পাদন-মানসে তর্ক জুড়িতেন তখন তাঁহাদের উৎপাত-নিবারণের জন্যও

তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। কিন্তু সে ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট পাদ্রীরা অগ্রসর হইতে পারিবে কিরূপে? তাহাদের সকল বিতণ্ডা খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত। অবশেষে যখন তাঁহারা তর্কে বিধ্বস্ত হইয়া পরাজয়-স্বীকারের উপক্রম করিতেন, তখন আবার স্বামীজি তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় খ্রীষ্টহৃদয়ের অদ্ভুত প্রেমের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিতেন।”

কিন্তু সন্ন্যাসীদের কর্ম্মশীলতা শুধু পঠন-পাঠন, তর্ক-আলোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আরও একটী জিনিষের অঙ্কুর এখন হইতে দেখা দিয়াছিল। সেটি হইতেছে সেবাধর্ম্ম। বর্ত্তমানে এই সেবাকার্য্য রাম-কৃষ্ণদেবের শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক বেশ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তখন ইহা এতটা দেশব্যাপী হয় নাই বটে, কিন্তু তখনও স্বামীজির উপদেশে এই সকল সন্ন্যাসীরা নিজেরা না খাইয়াও ক্ষুৎকাতর দরিদ্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে আহার করাইতেন এবং গৃহী গুরুভ্রাতাদিগের পীড়া বা বিপদের সময়ে প্রাণপণে সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন কি কুষ্ঠরোগীর পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

পরিব্রাজক বেশে

মঠ স্থাপিত হইল বটে কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা অধিক দিন একত্রে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। বাস্তবিক হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের চিরন্তন অভ্যাস ও প্রথা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া এবং তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত হইলে নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ঈশ্বরচিন্তায় আপনাকে নিযুক্ত করা। জাতীয় জীবনের এই যে একটা ধারা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাকে উপেক্ষা বা উল্লঙ্ঘন করা বড় সহজ নহে। ইহা যেন এদেশের লোকের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মঠ স্থাপিত হইলেও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের পর্য্যটনস্পৃহা দূর হইল না। গৃহীদের মত একস্থানে জীবন কাটাইবার সংকল্প লইয়া বেশ গোছাইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়া উঠিল না। তাই দেখিতে পাই যে পরমহংসদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত প্রায় বৎসরাবধি বৃন্দাবনধামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যোগানন্দ, লাটু প্রভৃতি এই দলের। মঠ-স্থাপনের কয়েক মাস পরে সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) প্রথম মঠ হইতে নিরুদ্দেশ হন। সে সময়ে মঠাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন। তিনি আসিয়া যখন সারদার নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তিনি জানিতেন সারদা সংসারান-ভিজ্ঞ বালকবিশেষ, এই হঠকারিতার জন্য তাহাকে অনেক ভুগিতে হইবে। তিনি রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজা, তুই তাকে যেতে দিলি কেন? দেখ্ দিকি কি মুস্কিলেই পড়া গেল। ছোঁড়াটা যে

ভারি ভাবিয়ে তুল্লে! এ আবার বেশ এক মায়ার সংসারে বাঁধা পড়েছি দেখ্ ছি।' কথাগুলি বাস্তবিক বড় সত্য। নরেন্দ্র গুরুভ্রাতাদিগের স্নেহজালে এতটা জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র ক্লেশভোগ হইবে এ চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতেন, তাঁহার মনে হইত তাহাদিগের ক্লেশভোগের জন্য প্রকৃত দায়ী তিনি, কারণ ঠাকুর যে তাঁহারই উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক খানিক অনুসন্ধানের পর সারদার হস্তলিখিত একখণ্ড পত্র পাওয়া গেল, তাহাতে লেখা ছিল :—

"আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম, এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, কারণ মনের গতি বদলাইয়া যাইতে পারে। আগে বাপ মা ও বাড়ীর সকলের স্বপন দেখতাম, তারপর মায়ার মূর্ত্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাড়ী ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, 'তোর বাড়ীর ওরা সব কোত্তে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস্‌নে'।"

রাখাল মহারাজ বলিলেন, "দেখচো, এই সবের জন্য সে চলে গেছে।" কিঞ্চিৎ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমি নিজেও মনে কচ্ছি একবার তীর্থভ্রমণে বেরুবো।" নরেন্দ্র তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা যাবে বৈকি! ঐ রকম ভবঘুরের মত বেড়ালেই ভগবান সশরীরে দেখা দেবেন আর কি!" মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রাণটাও এখন হইতে পর্য্যটনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তবে পাছে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যায়, তাই অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল ততই ঐ সংকল্পটা দৃঢ় হইয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আর তাহা অপরের নিকট হইতে চাপিয়া রাখিতে

পারিলেন না। কথায় বার্ত্তায় ভিতরের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মহৎ ব্যক্তির হৃদয়ের বেগ অতিশয় প্রবল। একবার মনে উচ্চ সংকল্পের উদয় হইলে ক্রমে তাহার গতি এরূপ অপ্রতিহত হইয়া উঠে যে তাহার সম্মুখে জগৎ সংসার সব ভাসিয়া যায়। নরেন্দ্রেরও ঠিক তাহাই হইল। অন্তর্নিরুদ্ধ মনোভাব সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় সবলে বহির্গত হইয়া পড়িত। সে হৃদয়বেগ সন্দর্শনে গুরুভ্রাতারা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ক্রমে ক্রমে মঠের সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা একে একে মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মঠবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িল। স্বামিজীও মাঝে মাঝে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি মাস ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মঠে আসিতেন। কিয়দ্দিন থাকিয়া আবার পর্য্যটনে বাহির হইতেন। কিন্তু সকলে চলিয়া গেলেও শশী মহারাজকে কেহ মঠ ত্যাগ করাইতে পারিল না। তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় দুই চারি জনকে লইয়া ঠাকুরের দেহাবশেষ সাবধানে রক্ষা এবং নিয়মমত নিত্য সেবা ও পূজাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামিজী নিজে বলিয়াছেন, "আমি সকলের প্রাণে আগুন জ্বালিয়েছিলুম—সকলকে মঠ ছাড়িয়ে ভিক্ষাবলম্বী সন্ন্যাসী করেছিলুম—পারিনি শুধু শশীকে। শশীকে জান্‌বি—মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ।"

বাস্তবিক ক্রমে মঠের সহিত একমাত্র শশী মহারাজেরই অতি নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল। আর সকলের নিকট উহা একটা সাময়িক ডেরার মত হইয়া দাঁড়াইল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া যখন শ্রান্তি বোধ হইত তখন দিনকতকের জন্য তাঁহারা মঠের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতেন।

প্রথম প্রথম স্বামিজী দিনকতকের জন্য অদৃশ্য হইতেন। আজ

বৈদ্যনাথ, কাল সিমূলতলা এই ভাবে এক একটা স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া আসিতেন; অবশ্য প্রত্যেকবারেই বলিয়া যাইতেন, 'এই শেষ, আর ফিরছি না,' কিন্তু প্রত্যেকবারেই কোন না কোন কারণে তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঠে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার একাকী ভ্রমণের সাধ পূর্ণ হইয়াছিল —এ সময়ে তিনি কোথায় থাকিতেন কেহ তাহার সন্ধান জানিত না বা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর চারি বৎসরকাল (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত) তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই অর্থাৎ হয় বরাহনগর মঠে ছিলেন, না হয় গুরুভ্রাতাদের কাহাকেও না কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯১ সালের প্রথম হইতে তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিলেন। মহানগরী দিল্লীতে সেই যে বিচ্ছেদ হইল, সেদিন হইতে আর কেহ তাঁহার ভ্রমণের সাথী হয় নাই। অবশ্য কোন কোন গুরুভ্রাতা ভ্রমণকালে তাঁহার সন্ধান করিতে ক্রটী করেন নাই—কিন্তু তিনি প্রায়ই স্বীয় নাম ও পরিচয়াদি পরিবর্ত্তন করিতেন, সুতরাং হঠাৎ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ছিল না।

এইরূপ অবস্থায় দুই তিন বার মাত্র তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, এবং ঐ কয়েকবারই তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীর প্রব্রজ্যাকালের ইতিহাস অতি কৌতূহলজনক। তিনি যতদূর সম্ভব, আপনার অতুল বিদ্যাবুদ্ধি গোপন করিয়া সাধারণ সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাকে দেখিয়া বা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিত না যে তিনি এক

অক্ষর ইংরাজী জানেন। অনেক সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেন, 'কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিব না; যখন আপনি জুটিবে তখন খাইব।' ইহার ফলে সময় সময় তাঁহাকে একাদিক্রমে পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইয়াছে, ইহা তাঁহার নিজমুখে ব্যক্ত। কতদিন পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন দেবালয়ে বা ধর্ম্মশালায় অথবা ঝোপ-জঙ্গল ও পর্ব্বতগুহায় কাটিয়াছে। আবার এমন দিনও গিয়াছে যেদিন মাথা গুঁজিবার স্থান হয় নাই, উন্মুক্ত আকাশতলে বর্ষা ও শিশিরসম্পাতের মধ্যে অথবা প্রচণ্ড রৌদ্রে অগ্নিতপ্ত বালুকাভূমির উপর কাটিয়াছে। পরিধানে গৈরিকবাস ও গৈরিক আলখেল্লা, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু, সম্বলের মধ্যে একখানি গীতা। এইভাবে রাজেন্দ্রগমনে সেই দীপ্ত-বিশালনয়ন, অনুপমকান্তিবীরবপু সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও তীর্থপর্য্যটনের জন্য 'নারায়ণ হরি' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন।

কয়েকটী কাছাকাছি স্থানে অল্পদিনের জন্য দুই চারি বার গমনাগমনের পর ১৮৮৮ সালে স্বামিজী পর্য্যটন-সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন; জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু সঙ্গে লইলেন না। কাশীধামে তিনি বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একদিন সারনাথেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে সারনাথের স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ অধিকাংশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন প্রাতঃকালে তিনি দুর্গাবাড়ীর মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। এই সকল বানর সময়ে সময়ে নিরীহ লোকের উপর নিতান্ত অত্যাচার করিয়া থাকে। স্বামিজী তাহা জানিতেন, সেইজন্য তাহাদিগের ঐরূপ ভাব দর্শনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন; তাহারাও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি তাঁহার অনুসরণ

করিল। তখন তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। উন্মত্ত বানরদলও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল। তাহারা প্রায় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'থামো থামো, বানরদের সামনে দাঁড়াও।' সহসা এই বাক্যশ্রবণে স্বামিজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া আসিল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বানর-দিগের সম্মুখীন হইলেন। অমনি ভীষণবেগে ধাবমান পশুসমূহ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল ও পরমুহূর্ত্তে ভীতভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের এবংবিধ ভাবপরিবর্ত্তন-দর্শনে তিনি মনে মনে খুব হাসিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ পরে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন, তিনিও প্রত্যভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামিজী বুঝিলেন ইঁহারই উপদেশমত কার্য্য করাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি আমেরিকায় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'So face Nature. Face ignorance. Face illusion. Never fly!' অর্থাৎ এইরূপে প্রকৃতি, অবিদ্যা ও মায়া, সর্ব্বদা ইহাদিগের সম্মুখীন হইবে—কদাচ ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবে না।

দ্বারকাদাসের আশ্রমে অবস্থানকালে ৺কাশীধামের অনেক পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তির সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইখানেই প্রসিদ্ধ মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত হিন্দুদিগের বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার বহুক্ষণ আলাপ হয়। আলাপান্তে ভূদেব বাবু বলিয়া-ছিলেন, "অদ্ভুত! এই বয়সে এতদূর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা! ইনি কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইবেন সন্দেহ নাই।"

এই সময়েই তাঁহার ভাগ্যে ভারতবিশ্রুত ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভ ঘটে। সকলেই জানেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামী শেষ অবস্থায় কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে কখন কখন ইঙ্গিতে মাটিতে লিখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহু বর্ষ পূর্ব্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ আছে কিনা?' তাহাতে তিনি সঙ্কেতে বুঝাইয়াছিলেন যে, যতদিন ভেদ-বোধ আছে ততদিন পৃথক্, ভেদবোধ রহিত হইলে দুইই এক। স্বামিজী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখান হইতে তিনি ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন। এই মহাপুরুষ পরমযোগী ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় আশ্রমে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। স্বামিজী অতিশয় শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কথায় কথায় কামকাঞ্চন-ত্যাগের বিষয় উঠিল। ভাস্করানন্দ বলিলেন, "কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কি না সন্দেহ।" স্বামিজী বলিলেন, "কি বলেন মহাশয়! সন্ন্যাসধর্ম্মের মূল ভিত্তিই যে ওই!" তাহাতে ভাস্করানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "তোম্ লেড়কা হো ক্যা জান্‌তা?" স্বামিজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি নিজে এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" ভাস্করানন্দ তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। *

* ইহার কয়েক বর্ষ পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও তাহারও কিঞ্চিৎ পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভাস্করানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে তিনি বিশ-

কাশী হইতে অযোধ্যা হইয়া তিনি আগ্রায় গমন করিলেন। পথে বরাবর ভিক্ষাই অবলম্বন ছিল। আগ্রার তাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতেন, 'ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্য্যন্ত এক এক দিন ধরিয়া দেখিবার যোগ্য এবং সমগ্র সৌধটি যথার্থভাবে দেখিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন।' আগ্রার দুর্গদর্শনেও তাঁহার ইতিহাস-রহস্যজ্ঞ হৃদয়ে নানাবিধ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আগ্রা হইতে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে এক কপর্দ্দক নাই। পথপর্য্যটনে ক্লান্ত ধূলিধূসরিত দেহে তিনি বৃন্দাবনের সন্নিকটে পৌছিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি মহা আরামে ধূমপান করিতেছে। ক্ষুৎপিপাসাকাতর স্বামিজী তাহার নিকট হইতে কলিকাটি চাহিবামাত্র লোকটি নিতান্ত ত্রস্তভাবে বলিল, "মহারাজ, হাম্ ভঙ্গী (অর্থাৎ মেথর) হ্যায়।" স্বামিজী একথা শ্রবণে নিরাশচিত্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইবামাত্র তাঁহার মনে হইল, "কি! সারাজীবন আত্মার অভেদ বিচার করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম! ছি ছি, এখনও সংস্কার!" এই ভাবিয়া তিনি প্রায় এক পোয়া পথ হাঁটিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন লোকটা তখনও বসিয়া আছে। নিকটে গিয়া বলিলেন, "বেটা, হামকো জলদী একঠো ছিলাম ভরকে দো।" সে

বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য ও গুরুভাই জানিতে পারিয়া বিশেষ সমাদর করিয়া-ছিলেন এবং স্বামিজীর দর্শনলাভের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও কিন্তু তিনি জানিতেন না যে এই বিবেকানন্দই সেই বালক, যাহার সহিত পূর্ব্বে একদিন তাঁহার ঐরূপ মতভেদ ও বচসা হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণবশতঃ স্বামিজী আর তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পান নাই, তবে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববৎ বলিল, "মহারাজ, আপ সাধু হ্যায়, ম্যয় ভঙ্গী হুঁ।" কিন্তু স্বামিজী তাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। লোকটী অগত্যা সেই কলিকায় তামাকু সাজিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি আনন্দের সহিত উহা সেবন করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু স্বামিজীর মুখে এই গল্প শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "না, জি, সি, সত্যই আমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্ব্ব সংস্কার দূর হয়েছে কি না, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহা কঠিন, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই।"

বৃন্দাবনে কয়েক দিন (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই হইতে ২০শে আগষ্ট) কাটিবার পর স্বামিজীর মনে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ দেখিবার ইচ্ছা হইল, কারণ ব্রজভূমির সব স্থানই পবিত্র। গোবর্দ্ধনগিরি পরিক্রমকালে তিনি সংকল্প করিলেন, কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন না। প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু ক্ষুধায় ও পথপর্য্যটনে অবসন্নপ্রায় হইলেও তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিলেন না, রাধারমণের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সহসা শুনিলেন কে যেন পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই স্বর ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইল। তখন তিনি ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সে লোকটিও ছুটিল এবং প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দৌড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী, সে

স্বামিজীকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য মিনতি প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামিজী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইলেন এবং নারায়ণের অপার করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন হইতে তিনি রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। এখানেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একখানি মাত্র কৌপীন থাকাতে তিনি কৌপীনখানি প্রথমে কুণ্ডের জলে ধুইয়া উহার ধারে রাখিলেন ও পরে উলঙ্গ অবস্থায় স্নানের জন্য কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন; স্নানান্তে দেখিলেন কৌপীনখানি আর সেস্থানে নাই, কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন এক বানর কৌপীনখানি লইয়া একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছে। তিনি বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া বানরটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে শুধু তাহার দন্তশ্রী প্রদর্শন করিল—কৌপীনটী ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। স্বামিজী অনেক হাঙ্গামা করিয়া বানরের নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া পাইলেন বটে, কিন্তু উহা তখন বানরের অত্যাচারে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় পরিণত। যাহা হউক স্বামিজী তখন কুণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি ঘোর অভিমানভরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখন হইতে তিনি লোকালয়ে যাইবেন না, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন দেবী বাস্তবিক ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন কি না। এই স্থির করিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। স্বামিজী প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তি স্বামিজীর নাগাল পাইবার জন্য দৌড়াইতে লাগিল, স্বামিজীও দৌড়াইতে লাগিলেন। শেষে সে ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে

তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়া সযত্নে খাওয়াইল ও নূতন বস্ত্র প্রদান করিল এবং তাহার গৃহে থাকিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তিনি প্রভুর অনুগ্রহ হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হন নাই।

বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া স্বামিজী উত্তরাখণ্ডে হাতরাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতরাস ষ্টেশনের এক কোণে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অনাহারে ও পরিশ্রমে দেহ মন অত্যন্ত ক্লান্ত—এমন সময় এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার শরৎ গুপ্ত কার্য্যোপলক্ষে সেই দিকে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। শরৎ গুপ্ত লোকটী বড় সুন্দর। ছেলেবেলা হইতে জৌনপুরের মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়া বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী শীঘ্র বলিতে পারিতেন এবং চরিত্রটীও বেশ অকপট ও পুরুষোচিতগুণভূষিত ছিল। প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, একজন সন্ন্যাসী আসনপিঁড়ি হইয়া ষ্টেশনের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, 'বাঃ, এমন চমৎকারমূর্ত্তি সাধু ত কখন দেখিনি!' তিনি স্বামিজীর দর্শনলাভে প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলেন এবং ত্বরিতপদে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনাকে ক্ষুধিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" স্বামিজী নাতি-উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি ক্ষুধিতই বটে।"

"আচ্ছা আপনার জন্য কি আনিব?"

"যা হোক কিছু নিয়ে এস।"

অল্পক্ষণের মধ্যে শরৎ বাবু যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহাতেই স্বামিজীর আহারের আয়োজন করিলেন। স্বামিজী বহুদিন

যাবৎ যৎসামান্য ভোজনেই তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহারও অভাব হওয়াতে ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্তপ্রদত্ত নানাবিধ আহার্য্য-সামগ্রী পাইয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিলেন।

দৈনিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে শরৎ বাবু সাধুটিকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, স্বামিজীর চক্ষুই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রথম দর্শনেই স্বামিজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি স্বামিজীকে দিনকতক হাতরাসে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তারপর বলিলেন, "আমায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিন।

স্বামিজী উত্তরচ্ছলে একটি গান গাহিয়াছিলেন, সেটি মালিনী সুন্দরকে বলিয়াছিল—

"বিদ্যা যদি লভিতে চাও,
চাঁদ মুখে ছাই মাখ,
নইলে এই বেলা পথ দেখ।"

শ্রবণমাত্র শরৎ বাবু বলিলেন—"স্বামিজী, আপনি যাহাই বলিবেন তাহাই করিতে স্বীকৃত আছি। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত।"

স্বামিজী তাঁহার নিস্পৃহ ভাব দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না।

কথায় কথায় ব্রজেন বাবু বলিয়া একজনের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে হইল—ইনি কলিকাতায় ছিলেন ও তাঁহার পরিচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রজেন বাবুর বাসায় গমন করিলেন ও দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। ব্রজেন বাবু তাঁহার আগমনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কয়েকদিবস নিজের বাসায় থাকিবার জন্য

অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলেন ও কয়েক দিন পরে পুনরায় শরৎবাবুর বাসায় ফিরিয়া যাইবার অঙ্গীকার করিলেন। ব্রজেন বাবুর বাসায় অবস্থানকালে ওখানকার বাঙ্গালীটোলার সমুদয় লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টা বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ একটা দলাদলি ও মনোমালিন্য চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে সে সকল অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মুখে ধর্ম্ম, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী কথাবার্ত্তা শুনিয়া ব্রজেন বাবুর বাসায় উত্তরোত্তর অধিকতর লোকসমাগম হইতে লাগিল। স্বামিজী শরৎ গুপ্ত ও নটুকৃষ্ণ বলিয়া শরৎবাবুর এক বন্ধুর বাটিতে প্রায়ই যাইতেন। ইঁহারা দুইজনে ক্রমশঃ তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন ও নিজ নিজ বাসায় তাঁহাকে রাখিবার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ-দর্শনে স্বামিজী অগত্যা কিছুদিন তাঁহাদের নিকট রহিলেন। সেখানেও অনেক গণ্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার কথাবার্ত্তা ও সঙ্গীত শ্রবণের জন্য যাইতেন।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া স্বামিজী বলিলেন, "আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। সন্ন্যাসীর একস্থানে অধিকদিন থাকা উচিত নয়, আর এখানে থাকতে থাকতে ক্রমে তোমাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছি, এটা ভাল নয়।" সকলেই তাঁহাকে এ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, "তোমরা আমায় পীড়াপীড়ি করিও না।" তাঁহার স্থিরসংকল্প দেখিয়া শরৎ বাবু অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্বামিজীকে অতি নিকট আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্য-কালে জৌনপুরের মুসলমান বন্ধুগণের নিকট সুফীদিগের ধর্ম্ম-সাহিত্য

পাঠ করিয়াছিলেন। স্বামিজীকে দেখা অবধি তাঁহার মনে হইতেছিল ইনি যেন সুফীদিগের বর্ণিত প্রেমের জীবন্ত আদর্শ। এক্ষণে তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি আমায় আপনার শিষ্য করিয়া লউন।" স্বামিজী এ সময়ে শিষ্যগ্রহণের কল্পনাও করেন নাই এবং সহসা কোন শিষ্য গ্রহণ করা উচিত কি না সে সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। সুতরাং শরৎ বাবুর প্রস্তাবে তিনি স্পষ্ট কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, "কি দরকার? আমার শিষ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম জগতের সব জিনিষ তোমার করতলগত হইবে তাহা নহে। 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান' এইটি মনে রাখিও। তাহা হইলেই তোমার উন্নতি হইবে। মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত দেখা হইবে।" কিন্তু শরৎ বাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন ও অবশেষে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি যাহা হয় অনুমতি করুন, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আপনার সঙ্গে যেথায় ইচ্ছা যাইতে বলুন, আমি আপনার অনুগমন করিতে সম্মত আছি।" স্বামিজী তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া ঈষৎ কৌতূহলপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি সত্যই আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ?" শরৎ বাবু সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে আমার ওই ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আন দেখি।" আদেশপ্রাপ্তিমাত্র শরৎ বাবু নিজ অধীনস্থ কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। স্বামিজী তদ্দর্শনে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই শরৎ বাবু কর্ম্মের ভার অপর একজনের উপর আপাততঃ দিয়া স্বামিজীর সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন।

গৃহসুখে অভ্যস্ত সদানন্দ (স্বামিজী শরৎ বাবুকে পরে এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন) শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর। সদানন্দ স্বামী এই সময়কার বৃত্তান্ত এইরূপ বলিতেন, "এক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে দিন নিশ্চিত আমি মরিতাম। কিন্তু স্বামিজীর কি স্নেহ! তিনি আমায় ধরিয়া ধরিয়া কতকদূর লইয়া গিয়া সেদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। আর একদিন একটি পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া যাইতে হইবে। আমরা একজনের নিকট হইতে একটী ঘোড়া যোগাড় করিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নদীটি অতিশয় বেগবতী ও তলদেশ মসৃণউপলাচ্ছাদিত। পদস্খলন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আর, একবার পদস্খলন হইলে মৃত্যু অবধারিত। আমি ঘোটকের উপর যাইতে লাগিলাম স্বামিজী সহিসের ন্যায় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই চারিবার এমন হইল যে ভাবিলাম বুঝি আর ঘোড়া রাখা যায় না। কিন্তু অসমসাহসী ও স্নেহার্দ্রহৃদয় স্বামিজী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সেই ভাবে ঘোড়া শুদ্ধ আমাকে পার করিলেন। কেমন করিয়া তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার বর্ণনা করিব? তিনি যেন প্রেমের অবতার ছিলেন। আর একবার আমার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। তিনি আমার সমুদয় জিনিষপত্র এমন কি জুতাযোড়াটা পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে মনে এতটা বল ও সাহস থাকিত যে মৃত্যুও তুচ্ছ বোধ হইত। একদিন পথে যাইতে যাইতে দেখা গেল একস্থানে কতকগুলি মনুষ্যের অস্থি ও তাহার আশে পাশে গেরুয়া কাপড়ের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামিজী ঐগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'সদানন্দ, দেখ এখানে একজন সন্ন্যাসীকে

বাঘে মারিয়াছে। ভয় হচ্ছে?' আমি উত্তর করিলাম, 'আপনি সঙ্গে থাকিলে কিসের ভয়' ?"

হৃষীকেশে স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্য সাধারণ সাধুদিগের ন্যায় থাকিতেন—ভজন, ভ্রমণ ও ধ্যান-ধারণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহাদের আরও উত্তরে কেদার বদরীর দিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সদানন্দ স্বামী হঠাৎ কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ায় পুনরায় হাতরাসে ফিরিতে হইল। তাঁহাদের হাতরাস প্রত্যাগমনে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া স্বামিজীও পীড়ার কবলে পতিত হইলেন। আহারবিহারের অনিয়মে উভয়েরই শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর হৃষীকেশের জলবায়ু তত ভাল নহে, কারণ ওখানে ম্যালেরিয়া আছে। সুতরাং উভয়েই ভুগিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোন স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্র-লোক সম্ভবতঃ বরাহনগর মঠে স্বামিজীর অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ কয়েকদিন পরেই তিনি গুরুভ্রাতাদিগের নিকট হইতে বরাহনগরে ফিরিয়া যাইবার জন্য সানুনয় অনুরোধসহ একখানা পত্র পাইলেন। সেই পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার একবার কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এই পত্র পাইয়া তিনি দুর্ব্বলতা সত্বেও কলিকাতা যাত্রা করি-লেন এবং সদানন্দ স্বামীকেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার অনুগমন করিতে আজ্ঞা দিয়া গেলেন। স্বামিজী মঠে প্রত্যাগমন করিলে সকলেই অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কয়েক মাস পরে সদানন্দ স্বামীও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামিজীর পুনরাগমনের সহিত মঠে আবার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিল। ভ্রমণকালে তিনি যে সকল নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন

তৎসাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার একত্ব তাঁহার সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারতখণ্ড আবার এক হইবে।" পূর্ব্ববৎ মঠের ভ্রাতৃগণকে শিক্ষাদান আরম্ভ হইল। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে যখন তিনি বুঝিলেন যে উপস্থিত তাঁহার আর মঠে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তখন তিনি পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

গাজীপুরের পওহারী বাবা

এবার স্বামিজী সর্ব্বপ্রথমে গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। গাজীপুরের পওহারী বাবা একজন অসাধারণ যোগী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাপুরুষসন্ধানে ভারতের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে করিতে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সন্ধান পান। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে সেই কথা শ্রবণাবধি স্বামিজী পওহারী বাবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরহমংসদেবের দেহত্যাগের পর অনেকবার তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প বরিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। গাজীপুরে তিনি রায় গগনচন্দ্র রায় বাহাদুরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে অনেক লোক প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আসিতেন।. তিনিও সকলকে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিতেন। সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "পুরাতনের নিন্দা বা কঠোর সমালোচনা দ্বারা তাহার দোষসংশোধন হইতে পারে না। সংশোধনের প্রণালী স্বতন্ত্র। অসীম প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা ক্রমে সকলে আপনাপন অন্তরের মধ্যে বুঝিতে পারিবে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। তারপর আপনা হইতেই মন্দটা ছাড়িয়া ভালটা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুভাবে ভাবিত হওয়া আবশ্যক। সকল বস্তু হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর দৃষ্টি লইয়া দেখা ও বুঝা উচিত। প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবিক তাহাই, যদ্দ্বারা হিন্দুর আদর্শ আমাদের চক্ষে আরও মহান্ ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। কারণ এইটা স্থির

জানিও যে হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়। ডুবিয়া দেখ, গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান কর, তারপর বুঝিতে পারিবে কি অতলস্পর্শ সমুদ্র এই হিন্দুধর্ম্ম! বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলিও না। দেশটাকে বোঝ, জাতটাকে বোঝ; জাতীয় জীবনের গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোন্ দিকে, তার উদ্দেশ্য কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী তাই দেখ। যখন নিজেদের ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে তখনই সব গোল মিটিবে।"

গগন বাবু তাঁহাকে মিঃ রস্ (Mr. Ross) নামে একজন রাজপুরুষের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। রস্ সাহেব স্বামিজীকে হিন্দুপর্ব্বসমূহ, বিশেষতঃ হোলি ও রামলীলার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাকে হিন্দুদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। স্বামিজী এই সকল প্রশ্নের অতি সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়া সাহেবকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন; শুনা যায় হোলির তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত সাহেবের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। রস্ সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ পেনিংটনের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান। পেনিংটন সাহেব তাঁহার নিকট অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। স্বামিজী জলস্রোতের ন্যায় অনর্গল বাক্যস্রোতে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্ম ও যোগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, ভারতের আধুনিক পরিবর্ত্তনধারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীর কথাবার্ত্তায় এরূপ মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে বিলাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। কর্ণেল রিভেট কার্ণাক

(Rivett Carnac) নামক আর একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের সহিতও এই সময়ে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। কর্ণেল সাহেব তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা ও বিচারপ্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও স্বামিজী এবার পওহারী বাবার দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। কারণ এই মহাপুরুষ এক উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত নির্জ্জন উদ্যানমধ্যস্থ গুহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। উহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। তিনিও বহুদিন হইতে বাহিরে আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একদিনও লোকের সম্মুখে আসেন নাই—ভিতরেই থাকিতেন, কি করিতেন কেহ জানিত না। ইচ্ছা হইলে কখন কখন দ্বারের আড়াল হইতে কথা বলিতেন। স্বামিজী তাঁহার মাস মাস সমাধিস্থ থাকার কথা ও অন্যান্য আরও অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বরাহনগর ফিরিয়া গেলেন।

বরাহনগরে প্রত্যাগত হইয়া তিনি গুরুভ্রাতাগণের সহিত পওহারী বাবার পবিত্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত পওহারী বাবার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতুলনীয় মহত্ত্বও স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ এই সময়েই * একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক একটি উক্তি গ্রহণ করিয়া তাহার উপর মোটা মোটা বহি লিখিতে পারা যায়। তাহাতে একজন গৃহী ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেমন করিয়া, বুঝাইয়া দাও দেখি।" স্বামিজী তদুত্তরে বলেন, "তুমি তাঁর যে কোন উপদেশ বল, আমি বুঝাইয়া দিব।" তখন

* স্বামী সারদানন্দ বলেন, এই ঘটনাটী বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

সেই ব্যক্তি ঠাকুরের মাহুত-নারায়ণ ও হাতী-নারায়ণের গল্পটির উল্লেখ করিলে স্বামিজী তিন দিন ধরিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর) স্বামিজী বৈদ্যনাথধামে গিয়া কয়েক দিন অবস্থান করিয়া কাশীধামে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, স্বামী যোগানন্দ এলাহাবাদে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র স্বামিজী এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন; এই স্থানে স্বামিজীর গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ এবং পূর্ব্বোক্ত সদানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলের অহোরাত্র যত্ন ও সেবায় যোগানন্দ স্বামী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া স্বামিজী সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময়েই একদিন তিনি একজন মুসলমান ফকিরবেশী মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তির মুখের প্রত্যেক রেখাটী যেন বলিয়া দিতেছিল 'ইনি পরমহংস'। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামিজী শঙ্করাচার্য্যের 'বিবেক-চূড়ামণি' হইতে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> "দিগম্বরো বাপি সাম্বরো বা
> ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
> উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
> পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥"

যোগানন্দ স্বামী আরোগ্যলাভ করিলে স্বামিজী কিছুদিন ৺কাশীধামে থাকিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারির শেষভাগে গাজীপুরে গমন করেন।* এবার তিনি প্রথমে কিছুদিন তাঁহার বাল্যসখা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় ও পরে গগনবাবুর বাটীতে অবস্থান

* কেহ কেহ বলেন, স্বামিজী একবারমাত্র গাজীপুরে গিয়াছিলেন।

করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও পওহারী বাবার দর্শনলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। তদনুসারে তিনি বাবাজীর আশ্রমের অনতিদূরে এক নির্জ্জন লেবুবাগানে থাকিয়া ভিক্ষা ও লেবুর রস দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন ও প্রত্যহ বাবাজীর দরজার নিকট গিয়া বসিয়া থাকিতেন। কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একদিন বাবাজীর দর্শন মিলিল। দর্শন অর্থে চাক্ষুষ দেখা নহে, দরজার পার্শ্ব হইতে আলাপ। পওহারী বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।" স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?" পওহারী বাবা বলেন, "গুরুকা ঘরমে নৌকা মাফিক পড়া রহো।" পওহারী বাবার সহিত আলাপ করিয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন ইনি একজন হঠযোগী, কিন্তু এখন দেখিলেন শুধু হঠযোগী নহেন, একজন অদ্ভুত রাজযোগীও বটে। তারপর আর একটী আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলেন—পওহারী বাবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তাঁহার গুহাতে পরমহংসদেবের একখানি ফটো ছিল; তাহা দেখাইয়া তিনি স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।" সুতরাং পওহারী বাবার উপর স্বামিজীর অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে এক নূতন অভিলাষের উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন, পওহারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এরূপ ইচ্ছার দুটী কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে সত্যান্বেষণস্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল, কোন নূতন পথ বা আলোক দেখিতে পাইলে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন কিছুতেই নিরস্ত থাকিতে পারিত না। পওহারী বাবাকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল ইনি যোগমার্গে বিচরণ করিয়া সত্যলাভে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সুতরাং ঐ মার্গের রহস্য অবগত

হইবার জন্য এবং তাঁহার মত দীর্ঘকাল একাসনে সমাধিস্থ হইয়া যাহাতে থাকিতে পারেন এই বিষয় শিক্ষার জন্য তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। দ্বিতীয়তঃ এ সময়ে তিনি কোমরের বাত ও অজীর্ণ রোগে বিলক্ষণ ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা হইল হঠযোগের ক্রিয়া অভ্যাস করিলে ঐ দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। তারপর পওহারী বাবার নিকট হইতে কোন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিলে যে গুরুত্যাগ করা হয়, ইহা তিনি মানিতেন না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ নিশ্চয় করিলেন। বাবাজীও তাঁহাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেই সংকল্প স্থির হইল এবং তিনি বাবাজীর গুহাভিমুখে যাইবার জন্য উঠিলেন, অমনি কে যেন পিছন হইতে তাঁহাকে টানিয়া ধরিল। চরণদ্বয় আর চলিতে চাহিল না, সমস্ত শরীর ভার ও অবশ বোধ হইতে লাগিল এবং অন্তর কি যেন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একি? এরূপ হইল কেন? বোধ হয় এবার ভীষণ পরীক্ষার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম।' কিন্তু তথাপি দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তাহা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল এবং তাহার জন্য দিন স্থিরও হইয়া গেল। কিন্তু যেদিন দীক্ষা হইবে বলিয়া সব ঠিকঠাক তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তিনি লেবুবাগানে একাকী এক খাটিয়ায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংসদেবের মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকটিত হইল। সে মূর্ত্তি কি অদ্ভুত পবিত্র! নয়ন দুটি তাঁহার নয়নোপরি সংলগ্ন অথচ সে নয়নে কতই স্নেহ, কতই করুণা! স্বামিজী সেই বেদনাব্যঞ্জক ছল ছল চক্ষু দেখিয়া আর স্থির

থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। 'আমি কি অবিশ্বাসী! আমি কি কৃতঘ্ন!' এইরূপ আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বামিজীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে কে যেন পাষাণের ভার চাপিয়া বসিল। অবশেষে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তা কখনই হবে না। রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত, আর কাহারও নিকট নয়! জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।"

এই ঘটনার পর দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প দুই একদিন স্থগিত রহিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি দুই এক দিন পরে আবার পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিকে তাড়াইয়া দিয়া পওহারী বাবার ধ্যান করিবেন এই স্থির করিয়া বসিলেন। কিন্তু আবার দীক্ষাদিবসের পূর্ব্বরাত্রের মত ঘটনা হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় দিন এই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়াছিলেন। স্বামীজি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন তাঁহার সম্মুখে কাঁদ কাঁদ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পাঁচ ছয় দিন এইভাবে ঠাকুরের দর্শন লাভের পর দীক্ষা লইবার সঙ্কল্প তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইল।

পওহারী বাবা এই ঘটনার পরেও তাঁহাকে দীক্ষা দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মন হইতে ঐ সঙ্কল্প একেবারে দূরীভূত হইয়াছে শুধু যে উপরোক্ত দর্শনলাভের জন্য তাহা নহে, অন্য কারণও ছিল। তিনি দেখিলেন পওহারী বাবা কোন কোন বিষয় আবার তাঁহার নিকটই শিখিতে চাহেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন বাবাজী এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, আর বুঝিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তুলনা নাই।

পুনর্যাত্রা

গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামিজী সংবাদ পান যে অভেদানন্দ স্বামী হৃষীকেশে পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাকে হৃষীকেশ হইতে বারাণসীতে আনাইয়া স্বামিজী গাজীপুর পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত পূর্ব্বপরিচিত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং অভেদানন্দ স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া প্রেমানন্দ স্বামীর হস্তে তাঁহার ভারার্পণ করিলেন এবং স্বয়ং প্রমদা বাবুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই উদ্যানে তিনি অধিকাংশকাল তপস্যা ও সাধনভজনে যাপন করিতেন, কেবল মধ্যে মধ্যে এক আধ বার মন্দিরাদি দর্শনে বহির্গত হইতেন। ক্রমে অভেদানন্দ স্বামীর আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু এই সময়ে আর একটি দুঃসংবাদ আসিয়া স্বামীজিকে অতিশয় কাতর করিয়া ফেলিল। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্যতম প্রধান গৃহী শিষ্য বলরাম বাবুর মৃত্যুসংবাদ। এই সংবাদ শ্রবণে স্বামিজী রোদন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে প্রমদাবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" স্বামিজী এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জ্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক আমরা মানুষ ত বটে! আর তা ছাড়া, তিনি যে আমার গুরুভাই ছিলেন। আমরা এক গুরুর চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি।

যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ কর্ত্তে উপদেশ দেয় আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" ইহার অব্যবহিত পরেই বলরাম বাবুর পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার জন্য তিনি বারাণসী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর সার্দ্ধ চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। স্বামীজির মন ভূয়োদর্শন দ্বারা উত্তরোত্তর বিকশিত হইতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর ভারতের জীবন গঠিত এবং আধ্যাত্মিক তেজের তারতম্যের উপরই ইহার উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

দুই মাস কাল মঠে অবস্থান করার পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামিজী আবার ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও সঙ্কল্প রহিল আর ফিরিবেন না এবং এবার তাঁহার এই সঙ্কল্প প্রায় সফলও হইয়াছিল; কারণ এখন হইতে সাত বৎসরের মধ্যে তিনি আর মঠে ফিরিয়া আসেন নাই। ইতোমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া যায় এবং আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এবার স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল হিমালয়প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবেন, কারণ ঠিক এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত হইতে ফিরিয়া লামাদিগের আবাস, কেদার-বদরীর মহান্ গম্ভীর সৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের মনোরম দৃশ্যাবলীর একটি সুরঞ্জিত চিত্র মঠের সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে ধরিলেন। তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া স্বামিজী উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, তোর মতন লোকই আমি চাচ্ছি, চল্ দুজনে আবার বাহির হই।"

এবার স্বামিজী স্থির করিলেন যে আর পওহারী বাবা বা অন্য কোন সাধুর নিকট যাইবেন না, কারণ তাহাতে নিজের লক্ষ্য হইতে বড় বিচলিত হইতে হয়, এবার সোজা হিমালয়ে গিয়া উঠিবেন।

মঠ-ত্যাগকালে তিনি গুরুভাইদের বলিলেন, "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফিরছি না।" যাইবার পূর্ব্বে একদিন ঘুসুড়ীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিলেন, তারপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।

সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা ভাগলপুরে আসিয়া কিয়দ্দিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। এখানে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে স্বামীজির আলাপ ছিল। প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ভাগলপুরে পৌছিয়া তাঁহারা রাজা শিবসিংহের বাটীর সন্নিকটে গঙ্গা-তীরে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহারা সাধারণ সাধুদিগের ন্যায় ছিন্ন-মলিন-বস্ত্র-পরিহিত ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী। কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেখানকার লোক সহজেই বুঝিল যে তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর সাধু নহেন। মন্মথনাথ চৌধুরী নামে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এই সময়ে স্বামীজির বাগ্‌বৈভব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম মানিতে আরম্ভ করেন এবং এমন কি রাধাকৃষ্ণলীলা পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামিজী ইঁহার ভবনে এক সপ্তাহকাল ছিলেন। এখান হইতে এক দিন তিনি বরারীর পবিত্রচেতা মহাত্মা পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে যান। আর এক দিন নাথনগরের জৈনদিগের মন্দির দেখিতে যান। মন্মথবাবু প্রথমে স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শেষে তাঁহার প্রভাবে এতদূর মুগ্ধ হন যে কিছুতেই আর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না সঙ্কল্প করেন; পরে একদিন, তাঁহার স্থানান্তর-গমনের সুযোগ পাইয়া স্বামিজী ভাগলপুর হইতে অদৃশ্য হইলে তিনি তাঁহার অন্বেষণে আলমোড়া পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

ভাগলপুর পরিত্যাগের প্রাক্কালে জৈন আচার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর অনেক আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বামিজীর অধিকার দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাদের সহিত আলোচনার ফলে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ একটা সুযুক্তিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন—বুঝিলেন যে উহা হিন্দু-ধর্ম্মেরই একটা শাখামাত্র এবং বৌদ্ধদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

অতঃপর অখণ্ডানন্দ স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহারা বৈদ্যনাথধামে উপস্থিত হইলেন। সেথানে সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হন। স্বামিজী ঐ সময়ে এমনভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেন যে, যাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে সাধারণ অশিক্ষিত সাধুমাত্র মনে করে, এই কারণে অখণ্ডানন্দকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে ইংরাজী জানেন একথা রাজনারায়ণবাবুকে জানিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং কথা-বার্ত্তা বাঙ্গালাতেই হইল। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বচনবিন্যাস, বাগ্মিতা ও ভাবচ্ছটায় রাজনারায়ণবাবু চমৎকৃত হইলেন। স্বামিজী ও তাঁহার সহচর ভ্রমক্রমেও একটী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করায় রাজনারায়ণবাবু বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহারা ইংরাজী জানেন। ইহাতে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজনারায়ণবাবু একবার হঠাৎ 'plus' কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর যেই মনে হইল ইঁহারা ইংরাজী জানেন না, অমনি তাড়াতাড়ি দুইটি অঙ্গুলি উপর্য্যুপরি চিহ্নের মত রাখিয়া মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাতের পরদিন তাঁহারা ৺কাশীধাম অভিমুখে গমন করিলেন। কাশীতে থাকিতে থাকিতে স্বামিজীর

প্রাণ পূর্ণ-জ্ঞানলাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "ইহার পর পুনরায় যখন এখানে আসিব তৎপূর্ব্বেই দেখিবেন একটা বোমার মত লোকসমাজের উপর পড়িয়াছি।" কথাটা খুব খাটিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর অখণ্ডানন্দ স্বামী স্বামিজীকে অযোধ্যানগরীতে পুণ্যশ্লোক মোহন্ত জানকীবর শরণের সহিত সাক্ষাতের জন্য লইয়া যান। স্বামিজী প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নাই, বলিয়াছিলেন, "এখন আর নয়, এখন বরাবর হিমালয়ের দিকে চল।" কিন্তু অখণ্ডানন্দ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি উক্ত মোহন্তের আশ্রমে গমন করিলেন। মোহন্ত মহাশয় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ সাধক ছিলেন। তিনি নবাগত অতিথিদ্বয়কে বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভক্তি বিষয়ে নিজে যতদূর জানিতেন তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং বলিতে বলিতে আত্মহারাপ্রায় হইয়া ভাবস্থ ও তন্ময় হইয়া গেলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন এবং সেদিন তাঁহার আশ্রমে আহারাদি করিয়া পুনরায় হিমালয় অভিমুখে চলিলেন। আশ্রম হইতে প্রস্থানকালে স্বামিজী অখণ্ডানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই যে এখানে আমায় এনেছিলি এতে বড় খুসী হয়েছি; আজ প্রকৃতই একজন সাধু পুণ্যাত্মার দর্শনলাভ ঘটিল।"

হিমালয়-ক্রোড়ে

ইহার পর আমরা ইঁহাদের দর্শন পাই নৈনিতালে বাবু রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে। পদব্রজে হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নৈনিতালে উপস্থিত হন ও রমাপ্রসন্নবাবুর বাটীতে ছয় দিবস যাপন করেন। তারপর এখান হইতে বদরিকাশ্রম দর্শন করিবার জন্য উভয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বহির্গত হন। সঙ্গে একটি পয়সা নাই, কোথায় আহার বা শয়ন হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, অথচ দুজনে চলিয়াছেন। তৃতীয় দিবস ভ্রমণের পর বহুক্ষণ অনাহারে অবস্থিতি-হেতু পরিশ্রান্ত দেহভার লইয়া তাঁহারা এক বেগবতী তটিনী-তটস্থিত প্রাচীন, সুবিশাল অশ্বত্থবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহার সহচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি সুরম্য স্থান! ধ্যানের পক্ষে কি সুন্দর!" অনন্তর সেই বিমলতোয়া পার্ব্বত্য নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া তিনি অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন ও অনতিবিলম্বে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় অচল, স্থির—যেন তাহা হইতে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। বদনশ্রী ধ্যানদর্শন-আনন্দহিল্লোলে প্রফুল্লকমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত। তিনি বহুক্ষণ এইভাবে রহিলেন, অনন্তর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অখণ্ডানন্দ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গঙ্গাধর, আজি এই অশ্বত্থবৃক্ষতলে আমার জীবনের একটা অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়াছে।" গঙ্গাধর মহারাজ চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় সুখরাগে রঞ্জিত। তখন তিনি স্বামিজীর কি অনুভূতি হইয়াছে জানিতে পারেন নাই, পরে স্বামিজীর ডায়েরি খুলিয়া

দেখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ভাবের কথা লেখা আছে—"আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি, বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে, দেখিলাম প্রতি পরমাণুমধ্যে বিশ্বসংসার বিদ্যমান।"

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা আলমোড়ার অনতিদূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন উভয়েই বহুক্ষণ হইতে অভুক্ত অবস্থায় আছেন। স্বামিজী ক্ষুধায় অবসন্ন ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী জলের সন্ধানে গেলেন। সম্মুখেই মুসলমানদিগের একটি গোরস্থান ছিল। ঐ স্থানের রক্ষক একজন ফকির। তিনি নিকটেই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। স্বামিজীর অবস্থাদর্শনে তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি একখানি শশা আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। শশা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইল। পরবর্ত্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, কারণ আমি আর কখনও ক্ষুধায় অতটা কাতর হই নাই।" ইহার কয়েক বর্ষ পরে তিনি আমেরিকা হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিলে যখন আলমোড়াবাসিগণ জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহাসমারোহে আয়োজন করিয়াছিল, তখন সেই বিরাট সভামধ্যে তিনি পুনরায় এই মুসলমান ফকিরের দর্শন পান। ফকির অবশ্য তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জনতার মধ্য হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারেন ও সাদরে তাঁহাকে নিজ সকাশে আনয়নপূর্ব্বক সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহার পরিচয় দেন ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থও দান করেন।

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের প্রথম অংশটী স্বামিজীর নিকট অতীব মধুর বোধ হইয়াছিল। অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্তি ও অবসাদ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভ্রভেদী হিমালয়ের নীরব গম্ভীর সৌন্দর্য্য ও শান্ত-সমাহিত-ভাব দর্শনে এবং স্বচ্ছন্দচারী পার্ব্বত্য সমীরণস্পর্শে সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া যাইত। কাঠগোদাম হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত এইভাবে গেল।

আলমোড়ায় পৌছিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামী তাঁহাকে অম্বাদত্তের বাগানে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া সারদানন্দ ও কৃপানন্দ নামক অপর দুই গুরুভ্রাতাকে (তাঁহারা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন) তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা ঐ সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র সোৎসাহে অম্বাদত্তের বাগানের দিকে ছুটিলেন—কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন, স্বামীজি নিজেই আসিতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দাতা লালা বদ্রীসার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনিও সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোশী নামক একজন সেরেস্তাদারের সহিত 'সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে স্বামিজীর সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হয়। তিনি শতমুখে ত্যাগই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ইহা প্রমাণ করেন এবং স্বীয় জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে এরূপ দৃঢ় যুক্তির সহিত ঐ বিষয়টী বুঝাইয়া দেন যে অবশেষে ব্রাহ্মণ যোশী তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য করিয়া লন।

বদ্রীসার বাটীতে অবস্থানকালে * একদিন সন্ধ্যার সময় একটী

---

* এ ঘটনাটি এই সময়ে সংঘটিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর স্বামিজী যখন দ্বিতীয়বার আলমোড়ায় আসেন, সেই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহারা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গ্রামের মধ্যে খুব মাদলের শব্দ শোনা গেল এবং কিঞ্চিৎ পরেই স্থানীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বদ্রীসাকে বলিল, "মহাশয় শীঘ্র আসুন, একজনকে ভূতে পাইয়াছে।" বদ্রীসা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। স্বামিজীও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিটী শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি লোক বসিয়া তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিয়াছে। আর এক ব্যক্তি (বোধ হয় পুরোহিত বা রোজা) ভূত ছাড়াইবার জন্য মন্ত্র আওড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে একখানা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত কুঠার লইয়া তাহার শরীরের স্থানে স্থানে ছ্যাঁকা দিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ কুঠার দ্বারা তাহার কেশ বা অঙ্গ স্পর্শ করিলেও কোন স্থান দগ্ধ হইতেছে না, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামিজী অবাক্ হইয়া গেলেন। ইতোমধ্যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল ও গৈরিক বসন-ধারী-মাত্রেই অদ্ভুত শক্তিমান এই বিশ্বাসে বলিল, "মহারাজ, আপনি দয়া করিয়া এই ব্যক্তিকে সুস্থ করুন।" স্বামিজী শুধু ব্যাপারটী কি দেখিতে গিয়াছিলেন, স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহাকে আবার রোজা হইয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে। কিন্তু কি করেন, লোকগুলির কাকুতি-মিনতিতে অগত্যা উপদেবতাবিষ্ট লোকটীর নিকট অগ্রসর হইতে হইল। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে কুঠারখানি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেটী তখন প্রায় স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি যেমন তিনি তাহাতে হাত দিয়াছেন অমনি হাত পুড়িয়া গেল। তিনি তখন ভূত ছাড়াইবেন কি, নিজেই অস্থির! যাহা হউক কিঞ্চিৎ পরে নিজের জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া ভূতগ্রস্ত লোকটীর

মস্তকের উপর কর স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে কিয়ৎক্ষণ স্বীয় ইষ্টনাম জপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ করিবার দশ বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থির হইল এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ ভাব ধারণ করিল। স্বামিজী বলিতেন, "তারপর আমার উপর গাঁয়ের লোকের ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত প্রায় ১২টা। এসেই শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু হাতের জ্বালায় আর ঐ ব্যাপারের রহস্য-উদ্ভেদের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ কর্ত্তে পাল্লে না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy'—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার সন্ধান দর্শনশাস্ত্রে মেলে না।"

আলমোড়ায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক সহোদরার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ-সম্বলিত একখানি টেলিগ্রাম আসিল। উহা পাইবামাত্র স্বামিজীর হৃদয় দুঃসহ শোকে মুহ্যমান হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাই আবার তাঁহার চিত্তকে এ দেশের নারীজাতির উন্নতির উপায়-নির্দ্ধারণে সজাগ করিয়া তুলিল। কিন্তু এই আকস্মিক পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিশেষ ব্যথিত হইলেও তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন না। যেই দেখিলেন বাটীর লোকেরা সন্ধান পাইয়াছেন অমনি তাঁহার অন্তর্নিহিত সন্ন্যাসভাব আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন এ স্থান ত্যাগ করিয়া অধিকতর দুর্গম গিরিগহ্বর আশ্রয় করিতে হইবে।

তাহাই হইল। একদিন হঠাৎ সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও কৃপানন্দকে

লইয়া বদ্রীসার বাটী ত্যাগ করিয়া স্বামিজী গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া এক চটীতে বিশ্রামকালে স্বামিজী সহসা প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। সেইভাবে চটীতে তিন দিন কাটিল, তারপর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই তিনি রুদ্রপ্রয়াগে যাত্রা করিলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অনির্ব্বচনীয়। চতুর্দ্দিক স্তব্ধ জনহীন—যেন গভীর শান্তির রাজ্য। কেবল মাঝে মাঝে গিরিনির্ঝরিণীর কলহাস্য-ময় নৃত্য ও দূরাগত প্রতিধ্বনির ক্ষীণ শব্দ। চির-শুভ্র হিমালয়ের অপ-রূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে স্বামিজীর বাল্য ও যৌবনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ সার্থক হইল। রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ণানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহার আশ্রমেই সকলে রাত্রিবাস করিলেন। এই স্থান হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বামিজীর আবার জ্বর হইল। এবার চটীর অপেক্ষা বিষম জ্বর। তাঁহার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া সেখানকার কাছারীর আমীন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটী কবিরাজী ঔষধ খাইতে দিলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ডাণ্ডীতে করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। তখন তাঁহাদের আলমোড়া হইতে ১২০ ও কাঠ্‌গোদাম হইতে ১৬০ মাইল ভ্রমণ সমাধা হইয়াছে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, কাঠ্‌গোদাম হইতেই তাঁহারা বদরিকার পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। আলমোড়া হইতে এই পথটী আসিতে তাঁহাদের দুই সপ্তাহেরও উপর লাগিয়াছিল, কারণ তাঁহারা ভিক্ষা, ধ্যান ও ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শ্রীনগরে আসিয়া অলকনন্দা নদীর তীরে একটী নির্জ্জন কুটীরে

তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। শুনিলেন পূর্ব্বে শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দ স্বামী এই কুটীরে বাস করিতেন। এখানে তাঁহারা প্রায় মাসাবধি বাস করিলেন ও মাধুকরী-ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে বিশেষতঃ এই স্থানে স্বামিজী গুরুভ্রাতাদিগের চিত্তে উপনিষদের উপদেশগুলি বিশেষভাবে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দিনের পর দিন শ্রীনগরে এই কুটীরে বসিয়া তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত সেই সকল গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাদের ভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। শ্রীনগরে অবস্থানকালে বৈশ্যজাতীয় একজন স্কুল মাষ্টারের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এ ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছে। স্বামিজী তাহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা তথ্য আলোচনা করিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল।

শ্রীনগরে বহুল সাধনা ও ধ্যানভজনের পর স্বামিজী টিহিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মোটে আহার মিলিল না, কারণ চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চতুর্দ্দিক ধূসরশ্রী ধারণ করিয়াছে সেই সময়ে তাঁহারা অবসন্নদেহে একখানি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা একস্থানে সকলে মিলিয়া বসিলেন—চারিদিকে গ্রামবাসীদের বাটী, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কিছুই মিলিল না। শেষে তাঁহাদের 'গাড়োয়াল সরীখা দাতা নেহী, লাঠ্‌ঠি বেগর দেতা নেহী (গাড়োয়ালবাসীদের মত দাতা নাই, কিন্তু তাহারা লাঠি ব্যতীত ভিক্ষা দেয় না), এই স্থানীয় প্রবাদবাক্য মনে পড়িল। তখন তাঁহারা ঐ প্রবাদবাক্যের পরীক্ষার্থ কৌতুকপরবশ হইয়া সকলে মিলিয়া 'এই পাধান (প্রধান) রোটী ল্যাও,

লকড়ি ল্যাও' বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে হাঁকিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, দেখিলেন কতকগুলি বলিষ্ঠদেহ গ্রামবাসী নিরীহ মেষশিশুর ন্যায় ধীরে ধীরে আমতণ্ডুলাদি লইয়া তাঁহাদের নিকট সমাগত হইল। কিন্তু তখন সন্ন্যাসীরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, পাক করিয়া খাইবার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য নাই। সুতরাং বলিলেন, "ও সব চাই না, রন্ধনকরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া আইস।" অগত্যা গ্রামবাসীরা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তখন ঐ কৌতুককর ব্যাপার লইয়া তাঁহারা খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন ও রন্ধন সমাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় মহা তৃপ্তির সহিত উদর পূরিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে গ্রামবাসীদিগের সহিত ধর্ম্ম ও তাহাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আলাপ করিয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন।

টিহিরি আসিয়া একটা পড়ো বাগানে দুটী ঘর মিলিল। সাধুদের জন্যই ঘর দুটী তৈরী। এখানে গঙ্গার তীরে বসিয়া তাঁহারা অহরহ ধ্যানধারণায় যাপন ও ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। এখানে টিহিরি-রাজের দেওয়ান (সুপ্রসিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রজ) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গণেশপ্রয়াগে (গঙ্গা ও ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থলে) তাঁহার সাধনার স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার সংকল্পমত কার্য্য হইল না। অখণ্ডানন্দ স্বামী কিছুদিন হইতেই সর্দ্দি জ্বর কাশি প্রভৃতিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এক্ষণে টিহিরির নেটিভ-ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার bronchitis হইবার খুব সম্ভাবনা, পার্ব্বত্য বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না, কারণ উহা অতিশয় লঘু। তাহার উপর আবার সামনেই শীত আসিতেছে। সুতরাং এ সময়ে তাঁহারা যত শীঘ্র নীচে নামিয়া যাইতে পারেন ততই মঙ্গল। এরূপ

আশঙ্কার কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য স্বামিজী স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দেরাহুনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। টিহিরি ত্যাগ করিয়া মুসুরীর মধ্য দিয়া তাঁহারা রাজপুরে গেলেন। এখানে অপরাহ্ণে দূর হইতে একজন সাধুকে তুরীয়ানন্দ বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে সাধুটীকে ডাকিতে লাগিলেন এবং তিনি নিকটে আসিলে দেখিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দই বটে। সহসা এইরূপ আকস্মিক ভাবে একজন প্রিয় গুরুভ্রাতার দর্শন পাইয়া সকলে মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং পরস্পরের ভ্রমণকাহিনী কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকি আছে। তারপর সকলে একত্রে দেরাহুনে পৌঁছিয়া সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ম্যাকলারেনের নিকট অখণ্ডানন্দের বক্ষ পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ বাবু উক্ত ডাক্তার সাহেবের নিকট একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। সাহেব স্বামিজীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সহচর-সন্ন্যাসিগণের বিশেষ গুণানুরাগী হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অতিশয় যত্নের সহিত অখণ্ডানন্দ স্বামীর বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আর কিছুতেই উপরে উঠিও না, দীর্ঘকাল সমতল প্রদেশে থাকিয়া ভালরূপ চিকিৎসা করাও।" কিন্তু প্রথমেই একটা আশ্রয় চাই, নতুবা কোথায় চিকিৎসা হয়? স্বামিজী নিজে দেরাহুনের বহু বাটীতে গমন করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় মিলিল না। তথাপি নিরস্ত না হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় উকীল পীড়িত সাধুটীকে আশ্রয়দান ও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারের জন্য

গরম কাপড় ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামীর এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে আর সকলে কোন বণিকের নূতননির্ম্মিত বাটীতে চারিখানি খাটিয়া পাতিয়া ভিক্ষান্ন-সেবনে কয়েকটা দিন কাটাইলেন।

এখানে একজন জাতবেনের সহিত স্বামিজীর দেখা হয়। তাহার ধারণা ছিল, সে একজন মহা বৈদান্তিক। "মহারাজ, পাঁচ মিনিটমে তত্ত্ব খিঁচ লিয়া হ্যায়। জগৎ তিন কালমে হ্যায়ই নেহী। তুসীতো স্বরূপ হ্যায়"—এইরূপ ভাবের কথা সর্ব্বদা তাহার মুখে শুনা যাইত। লোকটী কিন্তু এদিকে মহা কৃপণ ছিল। সে "নন্দ গাঁটা" (অর্থাৎ গাঁইট-বন্ধনপটু কৃপণ নন্দ) বলিয়া পরিচিত ছিল। স্বামিজী ইহার সহিত মাঝে মাঝে আলাপ করিতেন ও ইহার কথায় বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতেন। ইহার পুত্রের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হওয়ায় সে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ইঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিল। কৃপণ নন্দ বাটীতে আসিয়া দেখে, ইঁহারা তাহার বাটীতে খাইতেছেন। দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

একদিন হৃদয়বাবু নামক একজন খৃষ্টানের (ইনি পূর্ব্বে স্বামিজীর সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন) বাটীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সহিত কথায় কথায় তাঁহার মহা তর্ক বাধিয়া গেল। স্বামিজী তাহাদিগের নিকট বাইবেলের higher criticism-এর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কস্মিন্‌কালেও উহার ধার ধারে নাই, সুতরাং তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইল। তৎপর স্বামিজী হৃদয় বাবুর বাটীতে বসিয়া তাঁহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

দেরাদুনে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে স্বামিজী অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাটীতে যাইতে পরামর্শ দিয়া কৃপানন্দের উপর তাঁহার সেবা ও তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া অপর গুরুভ্রাতাদিগের সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে কৃপানন্দও হৃষীকেশ গেলেন। অখণ্ডানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে এলাহাবাদে যাইবেন মনে করিয়া প্রথমে সাহারাণপুরে বঙ্কুবাবু নামক এক বাঙ্গালী উকিলের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার পরামর্শে তিনি মীরাটে তাঁহার আলাপী ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটিতে গেলেন। সেখানে প্রায় দেড়মাস তাঁহার চিকিৎসা চলিল।

এদিকে স্বামিজী হৃষীকেশে আসিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন এবং গুরুভাইদের সহিত তথাকার বিখ্যাত সাধু ধনরাজ গিরির বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কঠোর সাধনার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে পুনরায় সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কয়েকদিন তপস্যার পর একদিন তিনি প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, গুরুভ্রাতারা চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। একদিন এমন হইল যে, ক্রমাগত ঘর্ম্মনিঃসরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল ও নাড়ীত্যাগ হইল। তিনি মাটিতে দুইখানি পাটকরা কম্বলের উপর অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে পড়িয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। গুরুভ্রাতারা চিন্তায় ও শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কারণ বহু ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার, কবিরাজ বা চিকিৎসার কোন উপায় নাই। এই ঘোর বিপদে পড়িয়া যখন তাঁহারা একমনে মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছেন, সেই সময়ে হঠাৎ কুটীরের বহির্দ্দেশে কাহার ধীর পদক্ষেপ শ্রুত হইল। তাঁহারা চকিত হইয়া দেখিলেন কুটিরদ্বারে এক সাধু দণ্ডায়মান। তাঁহারা

তাঁহাকে সাগ্রহে অভিবাদন করিয়া গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বামিজীর সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। মহাপুরুষ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থলি হইতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ একত্রে মাড়িয়া স্বামিজীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য! ঔষধটি যেন অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিল; ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামিজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিলেন। একজন গুরুভাই তাঁহার মুখের নিকট কান পাতিলে তিনি অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটি কথা কহিলেন। ক্রমে তিনি অল্প অল্প করিয়া সুস্থ হইতে লাগিলেন। পরে সঙ্গীদের নিকট বলিয়াছিলেন, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকার সময় তিনি যেন দেখিয়াছিলেন যে জগতে তাঁহাকে বিধাতার কোন একটা বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্য যতদিন না শেষ হইবে ততদিন তাঁহার বিশ্রাম বা শান্তি নাই। বাস্তবিক তাঁহার গুরুভাইরা এই সময় হইতে তাঁহার মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে শক্তির বেগ এত প্রবল যে মনে হইত তাহা আর তাঁহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তিনি সেই শক্তি-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

হৃষীকেশে যখন সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগিয়া তাঁহার জীবনের আশা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনই গুরুভাইরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন স্বামিজী তাঁহাদের কতদূর স্নেহভালবাসার বস্তু। তাঁহাদের প্রাণে প্রতিমুহূর্ত্তে বাজিতেছিল—শ্রীগুরুদেবের অদর্শনাবধি ইনিই আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা, এখন যদি আবার ইঁহাকেও হারাই তবে আমাদের উপায় কি হইবে? কিন্তু ঠিক এই সময়েই স্বামিজীর সঙ্কল্প হইল যে তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে, তাঁহারা যেন আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া না চলেন। যাহা হউক,

হৃষীকেশে আরও কিছুদিন বাস হইল। প্রথমে কিছুদিন তাঁহারা এক ঝুপড়িতে বাস করিয়াছিলেন—যে ঝুপড়িতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্বে ছিলেন। পরে ইঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আসিলে তাঁহার অর্থসাহায্যে একটি ভাল কুটীর নির্ম্মিত হইল এবং তাহাতে ইঁহারা কিছুদিন বাস করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্র খুব আলোচনা হইতে লাগিল—চারিদিকে রটিয়া গেল, একজন খুব পণ্ডিত সাধু এখানে আসিয়াছেন। এখানে শঙ্করগিরি নামক একজন সুপ্রাচীন সাধুর সহিত স্বামিজীর আলাপ হয়—তিনি স্বামিজীর সঙ্গে কথা কহিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন—বলিতেন, পণ্ডিতের কথা ছেড়ে দাও, কথা বোঝে, এমন লোক কোথা? 'বাত সম্‌ঝে এসা আদ্‌মি কাঁহা মিলে'। স্বামিজীকে 'ইয়ার' ও 'রসিলা' বলিতেন—অর্থাৎ ইঁহার সহিত কথা কহিয়া বাস্তবিক সুখ হয়। ইনি হৃষীকেশে অনেকদিন হইতে ছিলেন—গল্প করিতেন—তখন এখানে রীতিমত জঙ্গল ছিল, পালে পালে হাতী আসিত। এখন কি আর হৃষীকেশ আছে, 'রোটিকেশ' হইয়াছে অর্থাৎ এখন ছত্রাদিতে রুটির বন্দোবস্ত খুব হইয়াছে, তাই অনেক সাধু এখানে থাকেন। ইনি স্বামিজীর নিকট সেই জ্ঞানী সাধুর গল্প করেন, যাঁহাকে বাঘে লইয়া যাইবার সময় ক্রমাগত শিবোঽহং শিবোঽহং ধ্বনি করিতেছিলেন। যাহা হউক, স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলে সকলে মিলিয়া কনখলে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সাহারাণপুরে বন্ধু বাবু উকীলের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, গঙ্গাধর মীরাটে আছেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী বহুদিন গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেন নাই, আর বন্ধুবাবুও বিশেষ করিয়া বলিলেন, মীরাটে কিছুদিন থাকিলে স্বামিজীর শরীর সারিয়া যাইবে; সুতরাং

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর বিশেষ আগ্রহে ও বন্ধুবাবুর বিশেষ অনুরোধে সকলে মিলিয়া মীরাটে গমন করিলেন।

মীরাটে আসিয়া তাঁহারা সকলে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা ৺কালীপূজার পর, শরতের শেষ। অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর রুগ্ন শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বলেন, "স্বামিজীকে ওরূপ ক্ষীণ শীর্ণ কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন একখানি ছায়ামূর্ত্তির মত হইয়া গিয়াছিলেন, বেশ বোধ হচ্ছিল যে হৃষীকেশের পীড়ার কবল হইতে তখনও তিনি সম্পূর্ণ উদ্ধারলাভ করিতে পারেন নাই।" তাঁহারা উভয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ ত্রৈলোক্যবাবুর বাটীতে থাকিলেন। অপর সকলে যজ্ঞেশ্বর বাবু * বলিয়া একজন ভদ্র-লোকের বাড়ীতে স্থান পাইলেন। পরে সকলে একত্রে যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন বন্ধুর বাগানে (উহা শেঠজীর বাগান নামে খ্যাত ছিল) আশ্রয় লইলেন। স্বামিজী তখনও ঔষধ খাইতেছিলেন। যাহা হউক, মীরাটে থাকিতে থাকিতে তিনি ক্রমশঃ বল লাভ করিলেন।

শেঠজীর বাগানে থাকার সময়ে অখণ্ডানন্দ তাঁহার নিকট তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কাবুলের আমীরের এক আত্মীয়কে আনয়ন করেন। এই ভদ্রলোক স্বামিজীকে দেখিতে আসিবার সময় উজু (নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন) করিয়া পবিত্রভাবে প্রচুর মিষ্টান্নাদি উপঢৌকন লইয়া আসিতেন। স্বামিজী তাঁহার সহিত শ্বাতের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আখুদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও স্থানীয় অন্যান্য লোক স্বামিজীর নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ-

---

* ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম নেতা স্বামী জ্ঞানানন্দ।

মানসে আসিতেন। বাস্তবিক জায়গাটী যেন একটী ছোটখাটো বরাহ-নগর মঠ হইয়া দাঁড়াইল; স্বামিজী, ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ সকলেই ছিলেন, তার উপর হঠাৎ অদ্বৈতানন্দ কোথা হইতে আসিয়া জুটিলেন। স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল। তিনি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামকালে মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি পাঠ করিয়া গুরুভাইদিগকে শুনাইতেন, বিষ্ণুপুরাণও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধ্যান-ভজন খুব চলিত; সকলে মিলিয়া রন্ধনাদি করা হইত, স্বামিজীও কখন কখন তাহাতে সাহায্য করিতেন; মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে যাওয়া হইত। বস্তুতঃ মীরাটে তাঁহাদের জীবনের কয়েকটি অতি সুখের দিন কাটিয়াছিল।

স্বামিজী স্থানীয় সাধারণ পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া পাঠ করিতেন। ঐ উপলক্ষে একটী কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যহ শেষ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রন্থাবলী শেষ হইয়া গেলে লাইব্রেরীয়ান মনে করিলেন তিনি কখনই সব বইগুলি পড়েন নাই, শুধু লোক দেখাইবার জন্য পড়িবার ভান করিতেছেন মাত্র। স্বামিজীর নিকট ঐ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি সব পুস্তকগুলিই আয়ত্ত করিয়াছি, আপনি ইচ্ছা করিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।" লাইব্রেরীয়ান তখন তাঁহাকে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এত শীঘ্র কিরূপে পাঠ করেন জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী অখণ্ডানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এক একটি শব্দের দিকে নজর দিয়া পড়ি না, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই।"

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপন করিয়া স্বামিজী হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগের ন্যায় পূর্ণ স্বাধীনতা-ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি এই সব সাধুদিগের সম্বন্ধে বলিতেন—"হৃষীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলাম; একজনের কথা মনে আছে, তিনি উন্মাদভাবে থাকিতেন—রাস্তা দিয়া উলঙ্গ হইয়া চলিয়াছেন, আর ছোঁড়ারা পশ্চাতে দৌড়াইতেছে ও ঢিল ছুঁড়িতেছে; সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরদরধারায় রক্ত পড়িতেছে, তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই—বরং হাসিয়াই খুন! আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহত স্থানগুলি ধোয়াইয়া দিই ও একটু ন্যাকড়া পুড়াইয়া তাহার ছাই সেই সব স্থানে লাগাইয়া দিই, তবে রক্ত থামে। তিনি কিন্তু ক্রমাগত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "কেয়া মজেদার খেল্ হ্যায়! বিলকুল বাবাকা খেল্! কেয়া আনন্দ্!" ইত্যাদি। আবার অনেক সাধু আছেন তাঁহারা লোকজনের সঙ্গ ভালবাসেন না, লুকাইয়া থাকিতে চাহেন। আত্মগোপনের কৌশলগুলিও আবার চমৎকার। কেহ বা গুহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের কঙ্কাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—তাহা দেখিয়া লোকে ভাবে তিনি সর্ব্বভুক্। কেহ বা লোক দেখিলেই প্রস্তর নিক্ষেপ করেন—এইরূপ।" এই সব সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে স্বামিজী আরও বলিতেন, "ইঁহাদের তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা পূজাদির কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে ইঁহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান ও তপস্যাদি কঠোর অনুষ্ঠান করেন সে শুধু নিজ নিজ পুণ্যবলে লোককল্যাণসাধনের জন্য।" তিনি নিজেও এখন এইরূপ লোককল্যাণকামনায় নির্জ্জন সাধনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। বোধ হয় তিনি এ সম্বন্ধে স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট হইতে কোনরূপ আদেশও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কারণ এই সময়ে তিনি গুরুভ্রাতাদের সকলকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—"আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" অখণ্ডানন্দ অনেক অনুনয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত থাকিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি বলিলেন, "গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়িলে কার্য্যসাধনের বহু বিঘ্ন ঘটিবে। আমি আর কোন মায়ার বেড়ী রাখিতে চাহি না।" এ সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন।

আলোয়ার রাজ্যে

হিন্দুমুসলমানের পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরী অতীতের বহু স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আজও শত শত ভুবন-পর্য্যটকের মনোহরণ করিয়া থাকে। ইউরোপখণ্ডে রোম নগরী যেমন গরীয়সী সভ্যতার খনি, ভারতখণ্ডে দিল্লী নগরীও তেমনি। উহার বিগত গৌরব-স্মরণে স্বামিজীর ভাবোন্মত্ত প্রাণ নাচিয়া উঠিল। দিল্লীতে তিনি শ্যামলদাস শেঠের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। সেখানে তাঁহার দর্শনমাত্র সকলে তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার আলাপ হইল। উক্ত হেমবাবুর সহিত স্বামিজীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু তর্কবিতর্ক হয়, হেমবাবু স্বামিজীর অগাধ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

গুরুভ্রাতাগণ মীরাটে তাঁহাকে বিদায় দিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই সকলে আবার দিল্লীতে তাঁহার নিকটে আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার প্রাণে নির্জ্জন ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে তিনি যে কয়দিন একাকী ছিলেন বেশ সুখেই ছিলেন। কারণ সেটী তাঁহার তৎকালীন মনোমত অবস্থা। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যেন কোন উচ্চশক্তি তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বিচরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, কে যেন তাঁহাকে আদেশ করিতেছিল—‘এই কর’। সুতরাং কিছুদিন গুরুভাইদিগের সহিত একসঙ্গে কাটাইয়া আবার একলা বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ

করিয়াছিলেন এবং এক আধবার মাত্র তাঁহার সহিত, একবার স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত ও একবার স্বামী অভেদানন্দের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে এক এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতেন, তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে তিনি স্বামিজীর এই সময়কার ভ্রমণের কতক কতক ঘটনা অবগত হন। পরে স্বামিজীও গুরুভাইদের নিকট এই সময়কার কিছু কিছু গল্প করেন। এই সময়ে যে সকল ব্যক্তির সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহ কেহ পরে তাঁহাদের সহিত স্বামিজীর কিরূপে মিলন হইল ও কিরূপ আলাপাদি হইয়াছিল, তাহা গল্পচ্ছলে বলেন বা লিপিবদ্ধ করেন। এই সমুদয় উপাদান হইতেই স্বামিজীর এই অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বাপর একটা বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্বামিজী রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ার প্রদেশে গমন করিলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী ট্রেণ হইতে আলোয়ার ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। শ্যাম-শষ্পাবৃত ভূমি ও উদ্যানরাজিবেষ্টিত রাজপথ বাহিয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক অবশেষে তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার দ্বারদেশে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকেই ডাক্তার বাবু অনুমানে বঙ্গভাষায় সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখানে সাধু-সন্ন্যাসীর থাকবার কি একটু স্থান হতে পারে?" ভদ্রলোকটী প্রকৃতই সেখানকার ডাক্তার, নাম গুরুচরণ লস্কর। অনেক দিন বিদেশে আছেন, বাঙ্গালা কথা বড় শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং এই কমনীয়-

বদন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখ হইতে হঠাৎ বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বড় আনন্দ পাইলেন, এবং তাঁহাকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন—"নিশ্চয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন" এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিকিৎসালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাজারের উপর একখানি দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, "আপাততঃ এখানে থাকতে কষ্ট হবে কি?" স্বামিজী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "কিছু না।" ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনাইয়া দিলেন, কারণ স্বামিজীর সঙ্গে তখন একখানি গেরুয়া কাপড়, একটী দণ্ড, একটী কমণ্ডলু ও কম্বলে বাঁধা ২।৪ খানি বই ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বন্দোবস্তাদি শেষ করিয়া ডাক্তার তাঁহার একজন মুসলমান বন্ধুর (তিনি স্থানীয় হাই-স্কুলের উর্দ্দু ও ফার্সির শিক্ষক ছিলেন) নিকটে গিয়া বলিলেন, "মৌলবী সাহেব! এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে আসিয়াছেন, দেখিবেন ত শীঘ্র আসুন। এমন মহাত্মা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলুন, আমি একটু কার্য্য সারিয়া আসি।" মৌলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগ্নপদে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে সেলাম করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে আপনার নিকট যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কোরাণের এইটি বিশেষত্ব যে আজ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই। ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে রহিয়াছে, কোথাও একটী নূতন কথা বসে নাই। প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা-রক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।" গুরুচরণ ডিস্পেন্সারীতে ফিরিয়া গিয়া সমাগত লোকদিগের নিকট স্বামিজীর আগমনবার্ত্তা

কহিলেন। ডাক্তার বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সহরের অনেক ভদ্রলোক স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুও দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া গেলেন এবং ভোজনান্তে পুনরায় সেই কুঠুরিতে ফিরিয়া আসিলেন। লোক-সমাগম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মৌলবী সাহেবের মুসলমান বন্ধুগণ পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া স্বামিজীর মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উর্দ্দু গান, হিন্দী ভজন ও বাঙ্গালা কীর্ত্তন এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের পদাবলী গাহিতেন। কখনও বা উপনিষদ্, পুরাণ, কোরাণ ও বাইবেলাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনাবলী উদ্ধৃত করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের নানা ঘটনা শাস্ত্রোক্ত বচনের প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সকলকে ধর্ম্মের সার শিক্ষা প্রদান করিতেন।

এইরূপে দুই তিন দিন কাটিলে পর জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ণু লোক পরামর্শ করিলেন যে, স্বামিজীকে নগরের মধ্যস্থলে কাহারও বাটীতে রাখিলে সকলেরই তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিবার সুবিধা হইতে পারে। এই স্থির করিয়া তাঁহারা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ধ্যান-ভজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তার পর গৃহের বাহিরে আসিয়া লোকজনের সহিত আলাপ করিতেন। প্রতিদিন দশ পনর হইতে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। তন্মধ্যে ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, যুবা, বৃদ্ধ, শিয়া, সুন্নি, শৈব, বৈষ্ণব সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া

যাইত। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই জনতা সমভাবে বর্ত্তমান থাকিত। স্বামিজীর মুখের বিরাম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনিও সকলের প্রশ্নের সমান উত্তর দিতেছেন। এক এক সময়ে এমন হইত যে তিনি জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যাদি উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে হয়ত একজন অবিবেচক শ্রোতা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া প্রশ্ন করিল, "মহারাজ, আপ্‌কা শরীর কিস্ জাতিকা হ্যায়?" অন্য কেহ হইলে সম্ভবতঃ এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিত না, কিন্তু স্বামিজী বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ঝটিতি উত্তর করিতেন, "ইয়ে কায়স্থ শরীর হ্যায়।" আবার খানিক পরেই হয় ত আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপ্ গেরুয়া পিহন্‌তে হ্যায় কেঁও?" (মহারাজ আপনি গেরুয়া পরেন কেন?) স্বামিজী উত্তর দিতেন, "ইয়ে ফকীরকে ভেক হ্যায়, সফেদ কাপড়া পিহন্‌নেসে গরীব লোগ হম্‌সে ভিক মাঙ্গতে হ্যায়। লেকিন ম্যয় ত ফকির হুঁ। ভিক কাঁহাসে দিউ? উস্ লিয়ে ম্যয় আপ্ গরীবোঁকা ভেগ বনায়া, যৈসে গরীবোঁ হম্‌সে তফাৎ যায়, ইয়ে সমঝ্‌কে কি যো খুদ আপহি মাঙ্গনেওয়ালা হ্যায় উসে মাঙ্গনেকা কিয়া ফয়েদা?" (সাদা কাপড় পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চায়। নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় কাছে এক পয়সাও থাকে না যে তাদের দিই। আবার চাইলে না দিতে পারলেই কষ্ট হয়। গেরুয়া পরা দেখলে তারা বোঝে এও আমাদের একজন, এর কাছে আবার কি চাইব?) পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ তত্ত্বপ্রবাহ চলিতে থাকিত। তাহা হইতে ক্রমে হয় ত শক্তি-উপাসনার কথা উঠিল। জগজ্জননীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ এরূপ নাচিয়া উঠিত যে মুখে আর অন্য কথা নাই, শুধু মা মা ধ্বনি। প্রথমে উচ্চকণ্ঠে, পরে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ

অতি অস্ফুটস্বরে সে ধ্বনি বাহ্য ছাড়িয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মিলাইয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়া উঠিত এবং আরক্তিম আয়ত-লোচনদ্বয় হইতে প্রবলবেগে প্রেমাশ্রু ছুটিত। শ্রোতৃবৃন্দ সে ভাবদর্শনে চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতেন ও অবিশ্রান্ত নয়নজলে ভাসিতেন। তারপর স্বামিজী আবার গান ধরিতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের সহিত নয়নের স্নিগ্ধবারি মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিত। আবার কখন কখন দার্শনিক প্রসঙ্গ ও তত্ত্বকথা ছাড়িয়া নানা দেশের ও জাতির নানাবিধ রীতিনীতির কথায় হাসির হিল্লোল তুলিয়া অপূর্ব্ব উপদেশ দিতেন। দ্বিপ্রহরের সময় গৃহস্বামী পণ্ডিতজী তাঁহাকে আহারে আহ্বান করিলে তিনি বিদায় লইয়া ভোজনে গমন করিতেন, তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেন। ভোজনান্তে আবার বাহিরে আসিয়া দেখিতেন, হয়ত নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পুনরায় পূর্ব্বের মত জনতা হইত এবং সেই প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণ ছুটিত।

বৈকালে তিনি যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখনও অন্ততঃ দশ বার জন লোক তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সন্ধ্যার পরে দৈনিক কার্য্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরও অধিক লোক আসিয়া জুটিত। স্বামিজী সে সময়ে গান আরম্ভ করিতেন ও সকলকে তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে বলিতেন। হয়ত একটা বাঙ্গালা কীর্ত্তন ধরা হইল, দুই চারিদিন চেষ্টার পর অনেকেই তাঁহার সহিত সমস্বরে বেশ বাঙ্গলা কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত। রাজপুতানা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান, কৃষ্ণবিষয়ক গান সকলের অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই স্বামিজী একদিন গাহিলেন—

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি॥
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণবঁধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আমি আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব—
রাখিতে নারিবে কেউরে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারীবধ দিব তারে॥

গাহিতে গাহিতে তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সকলের চক্ষে জল—দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি। কেহ ভাবিতেছেন,—"বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন, তাই এত প্রেমবিভোর। নতুবা আমরাও ত তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু কৈ, আমাদের ত এমন তন্ময়তা হয় না।" কেহ বা ভাবিতেছেন,—"এইটুকু ঈশ্বরের বিভূতি, ইনি নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন।" গাহিতে গাহিতে স্বামিজীর স্বর ক্রমে করুণ হইতে করুণতর হইয়া আসিল, হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া গেল এবং মুখশ্রী প্রাণবঁধুর স্পর্শে উৎফুল্ল গোপিকার ন্যায় প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব আভা ধারণ করিল।

স্বামিজী যে সকল বাঙ্গালা গান গাহিতেন, শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য গাহিবার পূর্ব্বে সেগুলি হিন্দীতে বুঝাইয়া দিতেন। অনেকে সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন, কেহ বা ভুলিয়া যাইবার ভয়ে লিখিয়া রাখিতেন।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কয়দিন গেল কেহ তাহার হিসাবও রাখিল না—খেয়ালও করিল না। সকলেই তখন আত্মহারা। এক এক দিন রাত্রি চারটা পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দ চলিত। আর রাত্রের মত বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় সকলেরই মুখে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা। কেহ বলিতেছেন, 'বাবাজীর হৃদয় আনন্দে ভরপুর, মুখে হাসি লেগেই আছে।' কেহ কহিতেছেন, 'মশায়, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ আর কারও মুখে শুনি নি, কণ্ঠে যেন রূপার তার বাজে।' কেহ বলিলেন, 'হাঁ, তাঁর কণ্ঠে নাদ আছে।' আর একজন তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যে শুনলেই মুগ্ধ হতে হয়।' কেহ বা বলিল, 'আর দেখেছেন, প্রকৃতিটি কি মধুর! এত লোক এত বিরক্ত করে, আহাম্মকের মত যা-তা জিজ্ঞাসা করে, তা রাগ নেই, সব কথার জবাব দিচ্ছেন।' তদুত্তরে আর একজন কহিলেন, 'রাগ টাগ নেই, সিদ্ধপুরুষ—নইলে দেখুন না কেবল মনে হয় কতক্ষণে তাঁর কাছে যাব? ইচ্ছা হয় দিনরাত তাঁর নিকট বসে থাকি।' ইত্যাদি—

ফলতঃ ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল, প্রত্যেকে মনে করিত সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা স্বামিজীর অধিকতর প্রিয়। কিন্তু স্বামিজীর নিকট কোন ভেদ ছিল না, বরং গরীবের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা আরও অধিক দেখা যাইত। তিনি তাঁহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং কাহাকে কাহাকে ইষ্টলাভের পথ দেখাইবার জন্য দীক্ষাও দিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলবী সাহেব তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মনে একদিন স্বামিজীকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইবার অতি প্রবল ইচ্ছা হইল। ভাবিলেন,

"স্বামিজী ত একজন শ্রেষ্ঠ ফকির, তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, কিন্তু পণ্ডিতজী (অর্থাৎ শম্ভুনাথজী) হয়ত আপত্তি করিতে পারেন!" যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় অন্যান্য দিনের মত স্বামিজীকে দর্শন করিতে গিয়া সকলের সাক্ষাতে করযোড়ে বৃদ্ধ পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনারা অনুমতি করিলে আমি কাল বাবাজীকে আমার কুটীরে লইয়া গিয়া ভিক্ষা দিই। তাঁহার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিব যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। বৈঠকখানার সব জিনিষপত্র সরাইয়া ঘরটি উত্তমরূপে ধোয়াইব। তারপর ব্রাহ্মণের বাটী হইত পিতলের হাঁড়িবাসন ইত্যাদি আনাইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বাজার ও রসুই করাইব। স্বামিজী ঐ গৃহে বসিয়া সেবা গ্রহণ করিবেন, আর এ অধম যবন শুধু দূর হইতে তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।" মৌলবী সাহেব এরূপ আন্তরিক বিনয় ও সৌজন্যের সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহার অকপটতায় কাহারও সন্দেহ হইল না। পণ্ডিতজী হাসিয়া সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "দোস্ত্, স্বামিজীর আবার জাতি কি? তিনি ত মুক্তপুরুষ! তবে তোমার যেরূপ অভিরুচি করিতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার এত কষ্ট করারও কোন দরকার ছিল না, কারণ তুমি যেরূপ ব্যবস্থার কথা বলিলে তাহাতে স্বামিজীর কথা ছাড়িয়া দাও, আমিই নির্ব্বিকারচিত্তে তোমার গৃহে ভোজন করিতে পারি।" সকলেই হাসিয়া মৌলবী সাহেবকে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও দীনতার সুখ্যাতি করিলেন। পরদিন মৌলবী সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হইল। স্বামিজী তাঁহার গৃহে আহার করিলেন। মৌলবী সাহেবের সাধুসেবা দেখিয়া আরও কয়েকজন ভক্ত মুসলমানবন্ধু অতিশয় আগ্রহের

সহিত স্বামিজীকে নিজ নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন।

ক্রমে ক্রমে আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী শুনিতে পাইলেন যে, নগর মধ্যে একজন মস্ত সাধু আসিয়া বাস করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি স্বামিজীকে অতি সমাদরে নিজালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজীর প্রভাবে আলোয়ার-রাজের ইংরাজী-ভাবাপন্ন মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজকে সংবাদ দিলেন, "একজন সাধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে প্রকাণ্ড পণ্ডিত।" মহারাজ তখন ঐ স্থান হইতে তুই তিন মাইল দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র পাইয়া তিনি পরদিন নগরে আগমন করিলেন ও একেবারে দেওয়ানজীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করিয়া সাদরে নিজ সম্মুখে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজের প্রথম কথা হইল—"আচ্ছা স্বামিজী মহারাজ, শুনিতেছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনি ত সহজেই অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। তাহা না করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া দিনরাত্র সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" সভাসদ্‌গণ ত স্বামিজীর কথার ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "একি দুঃসাহসিক সাধু! হয়ত এঁর কপালে আজ কি আছে।" কিন্তু মহারাজ স্বামিজীর কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "কেন আমি ঐরূপ করি বলিতে পারি না, তবে হ্যাঁ,

ঐরূপ করিতে ভাল লাগে।” স্বামিজী সহর্ষে বলিলেন, “বেশ,' আমারও সেই রকম, ফকিরী করে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।”

মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্ত্তি পূজা করে, আমার ওতে মোটেই বিশ্বাস নেই, তা আমার দশা কি হবে?” বোধ হয় একটু বিদ্রূপের ছলে বলিয়াছিলেন বলিয়া কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্বামিজী প্রথমে যেন কথাটা প্রত্যয় হইতেছে না এইভাবে বলিলেন, “মহারাজ বোধ হয় রহস্য করিতেছেন।” মহারাজ বলিলেন, “না স্বামিজী, মোটেই নয়। দেখুন বাস্তবিকই আমি অন্য লোকের মত কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতু এ সকল পূজা করিতে পারি না। এতে কি পর-জন্মে আমার নীচগতি হবে?” স্বামিজী বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন, “যাহার যেমন বিশ্বাস।” এই কথা শুনিয়া স্বামিজীর ভক্তেরা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “একি হইল? স্বামিজী মহারাজের কথায় শেষে এই জবাব দিলেন! এতে ত উঁহার শ্রদ্ধাহীনতার আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইল। আর কি বলিয়া তিনি এরূপ মনরাখা কথা বলিলেন? এ ত তাঁহার নিজের ভাব নয়।” তাঁহারা সকলেই মূর্ত্তিপূজায় দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণভক্ত। স্বামিজীর কৃষ্ণভক্তি তাঁহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এক এক দিন তাঁহাকে শ্রীবিহারীজীর সমক্ষে প্রেমে গদগদ হইয়া গড়াগড়ি দিতে ও অশ্রুজলে ভাসিতেও দেখিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে স্বামিজীর কথায় তাঁহাদের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ঠিক সেই সময়ে স্বামিজী তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নির্ভীকতায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সম্মুখের দেওয়ালে আলোয়ার মহারাজের একখানা ফটোগ্রাফ

টাঙ্গান ছিল। হঠাৎ তাহার উপর নজর পড়ায় স্বামিজী একজনকে তাহা নামাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি তাহা নামাইয়া আনিলে তিনি ছবিখানি স্বহস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার ছবি?" দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, "মহারাজের"। সকলে বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, স্বামিজীর মতলব কি। কিন্তু কেহই কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল পরে যখন স্বামিজী গম্ভীরস্বরে দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, "দেওয়ানজী, এই চিত্রের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর," তখন সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মহারাজের সম্মুখে এ কি স্পর্দ্ধার কথা! স্বামিজী পুনরায় সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেহ হউক এই ছবির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর।" কেহই অগ্রসর হইল না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি? এ ত একখানা কাগজ মাত্র! ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে তোমাদের কি এত আপত্তি?" দেওয়ানজীও বজ্রাহতপ্রায়, আর সকলে ভয়ে জড়সড়—একবার মহারাজের দিকে, একবার স্বামিজীর দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কাহারও মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। দেওয়ানজী ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ করিতেছেন? ইহা আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি—ইহার প্রতি আমরা কিরূপে অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি?" স্বামিজী বলিলেন, "কেন, মহারাজ ত আর সশরীরে ঐ চিত্রে বিদ্যমান নাই! উহাতে না আছে তাঁহার হাড় মাস রক্ত, না আছে তাঁহার কথাবার্ত্তা, না আছে তাঁহার চালচলন। উহা তো এক খণ্ড কাগজমাত্র, ইহা সত্ত্বেও তোমরা উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে এত ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছ কেন?" কিন্তু তথাপি কেহ কোন উত্তর দিল না বা তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিল না। অবশেষে

তিনি নিজেই বলিলেন, "ভয় কেন? না, এই ফটোতে তোমরা মহারাজের ঐ সাদৃশ্যটুকু, ঐ ছায়াটুকু দেখিতে পাইতেছ। উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে গেলেই তোমাদের অনুভব হইতেছে যেন স্বয়ং মহারাজেরই গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হইতেছে।" এতক্ষণ পরে দেওয়ানজী ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে।" স্বামিজী তখন মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, দেখুন—যদিও এই চিত্রটি আপনি নহেন, এক টুকরা কাগজ মাত্র, তথাপি ইঁহারা উহাকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন, কারণ উহাতে আপনার প্রতিবিম্ব বিদ্যমান। সুতরাং এক হিসাবে ঐ চিত্রের সহিত আপনার কোন প্রভেদ নাই। উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আপনার স্মৃতি ইঁহাদের চিত্তপটে জাগিয়া উঠে—অনুভব হয় যেন আপনি স্বয়ং সম্মুখে বিদ্যমান। সেই হেতু সকলেই প্রকৃত মহারাজকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, এই চিত্রকেও সেইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখেন। ভগবদ্ভক্তও প্রস্তর বা ধাতুনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তিকে এইভাবে দেখেন। তাঁহারা প্রস্তর বা ধাতুবোধে ঐ সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন না, উহার মধ্যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন লীলার ভাব প্রত্যক্ষ করেন। মূর্ত্তিটী শুধু মনে আরাধ্য দেবতার স্মৃতি ফুটাইয়া তোলে বা তাঁহার কোন গুণকে স্মরণ করাইয়া ভাবের উদ্দীপন করে। ইহাই প্রকৃত প্রতীকোপাসনাতত্ত্ব। আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি দেখি নাই মূর্ত্তিপূজক বলিতেছে, 'হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি। হে ধাতু, আমার প্রতি সদয় হও।' মহারাজ, সকলেই সেই এক পূর্ণ পরব্রহ্মসত্তার উপাসনা করিয়া থাকে এবং তিনিও ভক্তের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাহার নিকট আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন। পাষাণ বা ধাতু মূর্ত্তি দেখিলে সেই চিন্ময়

ইষ্টকেই মনে পড়ে, তাই ভক্ত ঐ মূর্ত্তির এত সম্মান করেন। মহারাজ, আমি ত এইভাবে দেখি, অপরের কথা বলিতে পারি না।"

মহারাজ মঙ্গলসিংহ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে স্বামিজীর বচন শ্রবণ করিতেছিলেন। স্বামিজীর কথা শেষ হইলে তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্য। আমি এত দিন অন্ধ ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজি আমার চক্ষু খুলিল।" স্বামিজী গাত্রোত্থান করিলে মঙ্গলসিংহজী বলিলেন, "মহারাজ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "রাজন্! পরমাত্মা ব্যতীত কেহ কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। তিনি অসীম করুণাসিন্ধু। আপনি তাঁহার শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন।"

স্বামিজী প্রস্থান করিলে পর মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্নভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া কহিলেন, "দেওয়ানজি! এরূপ মহাত্মা আর কখনও আমার নয়নগোচর হয়েন নাই। ইঁহাকে কিছুদিন এখানে রাখিতে পারেন না?" দেওয়ানজী সাধ্যমত মহারাজের আদেশ পালনের অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না মহারাজ, কারণ ইনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। হয়ত এখানে থাকিতে ইচ্ছুক হইবেন না। তবে আমি যেরূপে পারি ইঁহার সন্ধান রাখিব।" দেওয়ানজী মহারাজের অভিপ্রায় স্বামিজীর গোচর করিলে ও আলোয়ারে কিয়দ্দিন যাপন করিবার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামিজী দেওয়ানজীর প্রস্তাবমত তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন—কিন্তু এই সর্ত্তে যে, ধনী দরিদ্র মূর্খ বা পণ্ডিত নির্ব্বিশেষে যে সকল শ্রেণীর লোক এখন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছে, পরেও তাহারা তেমনি স্বাধীনভাবে তাঁহার নিকট যাতায়াত

করিতে পারিবে। দেওয়ানজী সাহ্লাদে স্বামিজীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলে স্বামিজী তাঁহার আলয়ে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

এই সময়ে স্বামিজীর সংস্পর্শে বহু ব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া যাইত, বলিতেন, "মহারাজ, দয়া করিয়া আরও কিছুদিন থাকুন, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না।" স্বামিজীর হৃদয় পুষ্প হইতেও কোমল, সুতরাং একমাসের মধ্যে তাঁহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

একজন বৃদ্ধ প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিয়া আশীর্ব্বাদ ও দয়া ভিক্ষা করিত। স্বামিজীও তাহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিয়া কেবল বলিত—"আমায় কৃপা করুন, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন" ইত্যাদি। বহুদিন ধরিয়া প্রত্যহ ঐরূপ করাতে স্বামিজী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। একদিন দূর হইতে সেই ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভমানসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। বৃদ্ধ আসিয়া পূর্ব্ববৎ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে লাগিল ও দু'শ রকম কথা পাড়িল। কিন্তু স্বামিজী নির্ব্বাক, নিশ্চল, এমন কি পূর্ব্ব হইতেই যাহাদিগের সহিত খুব আলাপ করিতেছিলেন তাহাদিগেরও কথার উত্তর দেওয়া বন্ধ করিলেন। কেহ তাঁহার এইরূপ আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনের কোন কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। এইভাবে দেড়ঘণ্টা কাটিয়া গেল, অথচ স্বামিজী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়িল না। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অবশেষে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া

আপনমনে বকিতে বকিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। স্বামিজী তখন বালকের ন্যায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ও উপস্থিত সকলে তাঁহার হাস্যে যোগদান করিল। এই ব্যাপার দর্শনে একজন যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজী মহারাজ, আপনি বৃদ্ধের উপর আজ এত বিরূপ হইলেন কেন?" স্বামিজী সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের ন্যায় যুবকগণের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহি, কারণ তোমরা বালক, আমি যাহা বলিব তাহা প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে এবং ঐরূপ করিবার শক্তিও তোমাদের আছে। কিন্তু এই বৃদ্ধটি জীবনের তিনকাল ইন্দ্রিয়সেবায় কাটাইয়া এক্ষণে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ পথের পক্ষে অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং উনি এখন সস্তায় ফাঁকি দিয়া ঈশ্বরের দয়া খুঁজিতেছেন, যদি তাহাতে কার্য্য সারিতে পারেন, পুরুষকার একেবারেই নাই। কিন্তু পুরুষকার-বর্জ্জিত ব্যক্তির প্রতি কি ঈশ্বরের দয়া হয়? বুঝিয়া দেখ, অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবীর কুরুক্ষেত্রে পুরুষকার হারাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতার উপদেশ দিয়া তাঁহার পুরুষার্থ জাগাইলেন, কর্ম্ম, স্বধর্ম্ম সব করাইলেন। যাহার পুরুষার্থ নাই, সে ত তমোগুণে আচ্ছন্ন। তমোগুণীর কি ধর্ম্ম হয়? তাহাকে পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া রজোগুণী হইতে হইবে। স্বধর্ম্মপালন, নিষ্কাম কর্ম্মসাধন প্রভৃতি দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ করিতে হইবে—তবে ধর্ম্মলাভ। যে গৃহী স্বধর্ম্মই করিতে পারে না, কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহার নিবৃত্তি আসিবে কেমন করিয়া? উনি চান নিবৃত্তি, অথচ প্রবৃত্তির কোন কার্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন না—মহা তমোগুণী। চোর হইয়া যে চুরি করিতে পারে, আমার মতে এমন দৃঢ়চেতা দুষ্ট লোকও ভাল, কারণ

তাহার পুরুষকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে। একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতাই তাহাকে হয়ত কুপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিবে এবং অসত্যের স্থলে সত্য ও প্রবৃত্তির স্থলে নিবৃত্তিকে তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে, কিন্তু দুর্ব্বল লোকের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না—তাহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক ও সে যতই সৎসঙ্গ করুক।"

স্বামিজীর উপদেশানুসারে আলোয়ারের অনেকগুলি যুবক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে স্বামিজী স্বয়ং ঐ শিক্ষা দিতেন ও বলিতেন, "সংস্কৃত বিদ্যার প্রভূত চর্চ্চা কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর। কারণ বর্ত্তমানে এদেশের ইতিহাস অতিশয় অসম্পূর্ণ ও ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য-রক্ষণ-বিষয়ে উদাসীন। আর ইংরাজ লেখকগণ এদেশের যে সকল ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অধঃপতনের চিত্রগুলিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে হৃদয়ে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। তাঁহারা বিদেশীয়, এদেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহাদের দ্বারা এদেশের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হওয়া কথনই সম্ভব নহে, সুতরাং তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে শত শত ভ্রমপ্রমাদ ও অপসিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তবে ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কি করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও প্রাচীন ইতিবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হয়। এখন আমাদিগের এই সকল পথে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা উচিত ও প্রয়োজন। বেদ-পুরাণাদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ ও তৎসাহায্যে ভারতের একটী যথার্থ

ইতিহাস সঙ্কলন কর। শিবাজীর জীবন অনুসন্ধান কর, দেখিবে তিনি একজন জাতি-প্রতিষ্ঠাতা মহা-শক্তিশালী পুরুষ—ইংরাজ ঐতিহাসিক-চিত্রিত দস্যু নহেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক কাল হইতে বুদ্ধান্তর্দ্ধানের পর এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। অবশ্য এখন এ বিষয়ে একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস ভারতসন্তান কর্তৃক গ্রথিত হওয়াই উচিত। তোমরা বিস্মৃতিসাগর হইতে এই লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। উহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিবে ও উহার ক্রমোন্নতির সহিত দেশে প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জাগ্রত হইবে।”

আলোয়ারবাসী যুবকগণ স্বামিজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের কল্যাণের জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিতেন ও তাহাদের উপর খুব ভরসা রাখিতেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল ও তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের নেতা ও গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

একদিন স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিকটে কোন সাধু আছেন কি না।” তদুত্তরে একজন বলিল, “কিছু দূরে একজন্ বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আছেন।” স্বামিজী বলিলেন, “আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চল ও তাঁহার সহিত দর্শন করাইয়া দাও।” তখন দুইজনে সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারীজি বোধ হয় বৈষ্ণব ও বৈদান্তিক সাধুদিগের উপর বিশেষ কুপিত ছিলেন। কারণ, দূর হইতে স্বামিজীকে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি গেরুয়ার শত সহস্র নিন্দা ও সন্ন্যাসীদিগের উপর অযথা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলিলেন, “তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীদিগের দুচক্ষে

দেখতে পারি না।” স্বামিজী কোন বাদপ্রতিবাদ না করিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারী ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা যাক, তোর ওপর আমার তেমন রাগ নেই, তুই কিছু খাবি? স্বামিজী করযোড়ে বলিলেন, “আজ্ঞে, এইমাত্র ভিক্ষা করে আসছি, এখন আর কিছু আহারের আবশ্যক নেই। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু তত্ত্বকথা বলুন, আমি শুনি।” আর কোথায় যাবি! ব্রহ্মচারী এ কথা শুনিবামাত্র পুনরায় বিষম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তবে যা, দূর হ, কিছু খাবিনি ত দূর হ।” স্বামিজী তদনুসারে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে সাধুদর্শন করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বামিজীর এরূপ অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, স্বামিজী হয়ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। এই ব্যাপারে অসন্তোষের পরিবর্ত্তে তাঁহার এত আমোদ বোধ হইয়াছিল যে, যতক্ষণ ব্রহ্মচারীর নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া-ছিলেন। কিন্তু রাস্তায় আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে তাঁহার সহচরটী পর্য্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তারপর, “আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি তিরিক্ষে মেজাজের লোক, আর কি গালাগালির চোট রে বাবা!”—এই বলিয়া পুনরায় হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্রহ্মচারীর মত নকল করিয়া আপনি হাসিতে ও সঙ্গীটিকে ততোধিক হাসাইতে লাগিলেন।

স্বামিজীর গুণাবলী, চরিত্র-মহিমা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকলকেই মুগ্ধ করিল। যে সকল লোক প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাদের কেহ একদিন অনুপস্থিত হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন

ও কাহারও দ্বারা তাহার সংবাদ আনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়া উপস্থিত, তাহার উপনয়নের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, অথচ উপনয়ন হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন পেটের অন্নই জুটে না, তা আবার উপনয়ন-সংস্কার! স্বামিজীর আর অন্যচিন্তা নাই। যিনি তাঁহার নিকট আসেন, তাঁহাকেই বলেন, "আমার এক ভিক্ষা আছে—অর্থাভাবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকটির উপনয়ন হইতেছে না, তোমাদের ন্যায় গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে উহাকে সাহায্য করা। কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহার ঐ কার্য্যটী উদ্ধার করিয়া দাও ও সঙ্গে সঙ্গে যদি পার উহার শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা কর। এত বড় ব্রাহ্মণ-বালকের পক্ষে বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবিহীন হইয়া থাকা বড় নিন্দার কথা।" তাঁহার অনুরোধে ভক্তেরা আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করায় স্বচক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন-কার্য্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তবে তাহার কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে মাসখানেক পরে আলোয়ারের এক বন্ধুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার আরম্ভেই ঐ বালকের উপনয়ন সমাধা হইয়াছে কি না তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রায় দুইমাস অতীত হইলে স্বামিজী বলিলেন, "আর এখানে থাকা যায় না।" ইহা শুনিয়া তাঁহার জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামিজী যখন তাঁহার বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শিষ্য তখন স্নান করিতেছিলেন। স্বামিজী উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "বাবাজি, তেল মাথার কি কোন উপকার আছে?"

স্বামিজী কহিলেন, "আছে বৈকি! এক ছটাক তেল ভাল করে মাখলে এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।"

আহারাদির পর নানা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী মহারাজ, আপনি বলেন, চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা চাই—সত্যনিষ্ঠ, অকপট, পরোপকারী, কর্ম্মঠ, আর অসীম সাহসী হওয়া চাই; এ সব না থাকলে গৃহস্থ স্বধর্ম্ম করতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হয় না—কিন্তু চাকরী করা ত দাসত্ব, তাতে এ সব ভাব আসে না দেখছি—তাই ভাবি, আমাদের ত অর্থোপার্জ্জন করতে হবে, নইলে নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান কেমন করে করব? আজকালকার ব্যবসা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে ত অনেক ম্যাচকাফের আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের আবশ্যক, তারপর সরলতা থাকে না। তা মহারাজ, কোন্ কাজ করলে সব দিক বজায় থাকে?"

স্বামিজী উত্তর করিলেন, "দেখ, এ বিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি, কিন্তু দেখতে পাই চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে কেউ বড় চায় না, এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্যা ওঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে; যা হোক আমি ত ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করছি। চাষবাসের কথা বল্লেই এখন মনে হয় তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম? চাষবাসের কথা বল্লেই প্রথমে মনে হয় দেশশুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে! দেশশুদ্ধ লোক ত চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ—জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশের ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন, আবার আজকাল

দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লী-গ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরাজি পড়ে সহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়ত অনেক জায়গা জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না। সহুরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে, অন্যান্য জাতের মত আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না! আমাদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী যে, যদি এরকম ভাবে জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে, তা হলে ত আমরা মরতে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। সহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়াশুনো কল্লেই চাষার ছেলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামী কর্ত্তে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ ত প্রায় হয় না। ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে উঠে, লেখাপড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস কল্লে, আর চাষ-বাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে কল্লে উৎপন্ন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখা পড়া করতে ইচ্ছে হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়।”

শিষ্য আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেটা কি স্বামিজী?”

স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন, “এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামিশি হয়। যদি তোমাদের মত লোকেরা কিছু লেখা পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষ-বাস করে, আর চাষা লোকদের সঙ্গে আপনার মত ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তা হলে দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া—ছোট জাতের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর

সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখান, তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন, "সে কেমন করে হবে?"

স্বামিজী বলিলেন, "কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জাতের সঙ্গে একটু মেশামিশি করলে তারা কেমন আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ কর্ত্তে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে সকল মানুষের ভেতর রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"

পরদিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ্চ স্বামিজী আলোয়ারের ভক্তমণ্ডলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জয়পুর ও খেতড়িতে

আলোয়ার হইতে স্বামিজী পাণ্ডুপোল অভিমুখে চলিলেন। পাণ্ডুপোল আলোয়ার হইতে ১৮ মাইল। প্রথমে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল পদব্রজেই যাইবেন, কিন্তু ভক্ত ও বন্ধুদের উপরোধে তাহা না হইয়া তাঁহাকে রথে (এক প্রকার গরুর গাড়ী) যাইতে হইল। এই সকল ভক্ত ও বন্ধু আলোয়ার হইতে তাঁহাব অনুগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামিজী প্রথমে তাঁহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের মনঃক্ষোভের সম্ভাবনা দেখিয়া উহাতে সম্মতি দান করেন।

পাণ্ডুপোলে পৌছিয়া রাত্রিটা তাঁহারা তত্রত্য প্রসিদ্ধ হনুমানজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে গো-যান ত্যাগ করিয়া ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী টাহলা নামক গ্রামে যাত্রা করিলেন। পথটী পর্ব্বতসঙ্কুল ও হিংস্র বন্যজন্তু-পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহারা স্বামিজীর মধুর গল্প ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গমন করিতে লাগিলেন।

টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। তাঁহারা সেই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সমুদ্রমন্থনকালে দেবাসুর যুদ্ধের পরিণামে বিষ উদ্গীর্ণ হইলে কেমন করিয়া মহাদেব তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে স্বামিজী ঐ পৌরাণিক বৃত্তান্তের একটি মনোহর ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন, "সমুদ্রটা হচ্ছে মায়া-সমুদ্র। এই রূপ-রস-গন্ধাদিময় বিচিত্র

জগৎ হচ্ছে মায়ার রচনা। এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নানারূপ ভোগ্যপদার্থ আছে, সে সকল পদার্থ যতই ভোগ কর, পরিণামে তা থেকে হলাহল উদ্গীর্ণ হবে। সে হলাহল আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তা ব্যর্থ, নিস্তেজ। ভূমানন্দে মগ্ন সন্ন্যাসী মায়ার কুহকে প্রতারিত হন না, বরং দেবাদিদেব শঙ্করের ন্যায় ইন্দ্রিয়-ভোগ-তৎপর জীবকুলকে মরণাদি ভয়াবহ অবস্থায় সাহায্য করেন ও তাদেব উদ্ধারসাধনার্থ স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। তিনি মায়াকে বিনাশ করে মৃত্যুর কবল হতে জগৎকে রক্ষা করেন, সকলকে দেখান যে মায়াজয়ী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করতে সমর্থ।" এই বলিয়া স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানস্থ রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি এখান হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণীতে এক দেবীস্থানে গমন করিলেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি সুবৃহৎ মেলা হয় ও দেবীর পূজার জন্য রাজপুতানার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। এখান হইতে স্বামিজী ভক্ত-বন্ধুদিগকে বিদায় দিলেন ও একাকী ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী বসওয়া নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন; তথা হইতে রেলে চড়িয়া জয়পুর যাত্রা করিলেন। এই স্থানের নিকটেই বান্দীকুই নামক ষ্টেশনে একজন ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি ঐ স্থানে ট্রেনে উঠিলেন। তার পর জয়পুরে পৌছিয়া স্বামিজীকে একখানি ফটো তোলাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আলোয়ারবাসী বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আরও ধরিয়া বসিলেন। শিষ্যদিগের সন্তোষার্থ অগত্যা স্বামিজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহাই তাঁহার পরিব্রাজকবেশের প্রথম চিত্র। ছবিখানিতে পরিব্রাজকের ভাব বেশ ফুটিয়াছিল।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামিজী তথায় দুই সপ্তাহ রহিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণের পরিচয় লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী নিজে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী তত সরল ছিল না। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ধরিয়া প্রথম সূত্রের ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন, তথাপি স্বামিজীকে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে বলিলেন, "স্বামিজী, আমার আশঙ্কা হইতেছে, যখন তিন দিনেও প্রথম সূত্রের অর্থ আপনার বোধগম্য করাইতে পারিলাম না, তখন আমা দ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হইবে না।" স্বামিজী পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া দৃঢ়পণ করিলেন, যে করিয়াই হউক নিজের চেষ্টায় ভাষ্যের অর্থ উপলব্ধি করিবেন এবং যতক্ষণ না অর্থবোধ স্পষ্ট হয়, ততক্ষণ অন্য কোন কার্য্য করিবেন না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি নির্জ্জনে পুনঃ পুনঃ ভাষ্যটি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এমনই আশ্চর্য্য ফল ফলিল যে, পণ্ডিতজীর সাহায্যে তিন দিনেও যাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, নিজ চেষ্টায় তিন ঘণ্টায় তাহা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে তিনি পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সরল, সুচিন্তিত, গূঢ়লক্ষ্যার্থসম্পন্ন ব্যাখ্যা শ্রবণে পণ্ডিতজী একেবারে স্তম্ভিত। অনন্তর তিনি সূত্রের পর সূত্র ও অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনায়াসেই বুঝিতে লাগিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিতেন, "সংকল্পই সব, মনে যদি আগ্রহ আসে, তবে কোন কাজ পড়িয়া থাকে না।"

জয়পুর ত্যাগ করিয়া আজমীঢ় হইয়া তিনি আবু পর্ব্বতের রমণীয়

সৌন্দর্য্য দর্শনে গমন করিলেন। এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে একটী জৈন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ন্যায় অপরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা নির্ম্মাণ করিতে চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল এবং দুই জন ধার্ম্মিক জৈন বণিক-ভ্রাতা ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। স্বামিজী কয়েক দিন ধরিয়া এই মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলেন ও তাহাদের গৌরবে সমগ্র ভারতের গৌরব অনুভব করিলেন। মন্দিরের সর্ব্বত্র দর্শন শেষ হইলে তিনি পর্ব্বতবক্ষ-শোভিত বিশাল হ্রদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট যেন নন্দন-কাননের ন্যায় মনোহর প্রতীত হইল। কিছুদিন এই ভূস্বর্গে অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় আজমীঢ় যাত্রা করিলেন।

আজমীঢ়ে তিনি আকবর সাহের প্রাসাদ ও দরগা নামে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাভাজন মুসলমান ফকির চিস্তি সাহের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিলেন। এখানে তিনি আর একটি জিনিষ দেখিলেন, যাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেটী ব্রহ্মার মন্দির।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে স্বামিজী আজমীঢ় ত্যাগ করিয়া পুনরায় আবু পর্ব্বতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এইবার ভাগ্যচক্রে খেতড়ির মহারাজের সহিত পরিচিত হইলেন। আবুতে তাঁহার কতক-গুলি বন্ধু জুটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোটার রাজা ও ঠাকুর ফতেসিংহের উকীল ও রাজার পূর্ব্ব মন্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদেরই এক-জনের ভবনে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার এক ভক্ত খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহনলালকে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী সকাল হইতে বকিয়া বকিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, একটু ঘুমও আসিয়াছিল।

জগমোহনজী উচ্চশিক্ষিত, তাঁহার ধারণা সাধুর বেশে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশই চোর ছেঁচড়। সুতরাং সামান্য একটা কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিহিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি প্রথমটা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অনতিবিলম্বে স্বামিজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মুন্সীজী তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। বহুক্ষণ আলাপের ফলে তাঁহার অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, মহারাজের সহিত স্বামিজীর আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্বামিজীকে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, পরশু দিন হবে।" রাজার নিকটে পৌছিয়া জগমোহনজী আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলে মহারাজ স্বামিজীর দর্শনলাভার্থ এতদূর ব্যগ্র হইলেন যে স্বয়ংই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজীর নিকট এই সংবাদ পৌছিবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া মহারাজকে দর্শন দিলেন।

খেতড়িরাজ মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথা-বিহিত শিষ্টালাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, জীবনটা কি?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশের নামই জীবন।" মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামিজী, শিক্ষা কি?" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই শিক্ষা।" (Education is the nervous association of certain ideas.) বিষয়টি আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "যতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনোমধ্যে এরূপ দৃঢ় সংস্কারের আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রতি স্নায়ু ও শিরায় তাহার কার্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে, ততক্ষণ সেই চিন্তা বা

ভাবকে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় মনের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।” উদাহরণস্বরূপ তিনি পরমহংসদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বলিলেন যে, একখণ্ড ধাতু তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র অঙ্গটি এমন কি নিদ্রাবস্থাতেই বাঁকিয়া যাইত—কাঞ্চন-ত্যাগে তিনি এমনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটা যেন পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ ও মানবমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এইরূপে দিনের পর দিন স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার এতদূর অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে এক দিন প্রস্তাব করিলেন,—“স্বামিজী, আপনি আমার রাজ্যে চলুন। সেখানে আমি পরমযত্নে আপনার সেবা করিব।” স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন, “আচ্ছা মহারাজ, তাহাই হইবে। আমি আপনার সহিত গমন করিব।” কয়েক দিন পরে স্বামিজী রাজা, পাত্র-মিত্র, অনুচর লইয়া ট্রেণে জয়পুর গমন করিলেন ও পরে রথে চড়িয়া ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী খেতড়িতে পৌঁছিলেন।

মহারাজ স্বামিজীকে পাইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী, সত্য কি?”

স্বামিজী বলিলেন, “মহারাজ, পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বিতীয়। তবে সাধারণতঃ আমরা যেগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করি, সেগুলি সব আপেক্ষিক সত্য। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক সত্য ত্যাগ করিয়া অপর সত্য গ্রহণ করে। যেটি ত্যাগ করে সেটি যে মিথ্যা তাহা নহে, তবে যেটি নূতন ধরে, সেটি আরও উচ্চতর। এ অবস্থায় চরম সত্যের উপলব্ধি নাই। চরম সত্যের উপলব্ধি হইলে আপেক্ষিক সত্যজ্ঞানের লোপ হয়।”

মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও কোন লোকের নিকট এরূপ মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বাক্যসমূহ শ্রবণ করেন নাই। তিনি স্বামিজীর সঙ্গ-লাভে উত্তরোত্তর অধিকতর প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন এবং খেতড়ি পৌঁছিবার কয়েক দিন পরেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি-লেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। মনে হয় রাজা হইয়া এরূপ ভাবে গুরুসেবা অল্প লোকেই করিয়াছেন। গভীর রজনীতে মহারাজ শয্যা ত্যাগ করিয়া নিদ্রিত গুরুর পদসেবা করিতেন। প্রথম দিন যখন নিদ্রাভঙ্গে স্বামিজী মহারাজকে ঐ ভাবে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মহারাজকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেও মহারাজ শুনিতেন না। বলিতেন, "স্বামিজী, আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি আমায় এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করিবেন না।" এমন কি দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজসভাতেও তিনি ঐ ভাবে স্বামিজীর সেবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন এবং স্বামিজীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রভুবৎ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু স্বামিজী সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে কিছুতেই তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন, "উহাতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।"

এইভাবে অধ্যয়ন, উপদেশদান ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় খেতড়িতে বহু সপ্তাহ অতীত হইল। রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিলেও স্বামিজী ঠিক সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন—সেই পূজা, পাঠ, ইষ্টচিন্তা ও জগজ্জননীর চরণে আত্মনিবেদন! অনুক্ষণ এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ; ইঁহার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামিজী দেখিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিবার এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তিনি পণ্ডিতজীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন

করিলে পণ্ডিতজী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম দিনই পড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপ্ কো মাফিক বিদ্যার্থী মিল্না মুস্কিল" (অর্থাৎ আপনার ন্যায় ছাত্র লাভ করা বড় কঠিন)। পণ্ডিত মহাশয় একদিন একটু বেশী করিয়া পড়াইলেন। পবদিন তিনি সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামিজী পূর্ব্বদিনের প্রসঙ্গে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী চমৎকৃত হইলেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী পড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইলে পণ্ডিতজী দেখিলেন স্বামিজী মধ্যে মধ্যে এমন সব কূট প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যাহার উত্তর তিনি খুঁজিয়া পান না। এক দিন তিনি স্বামিজীকে স্পষ্টই বলিলেন, স্বামিজী, আমার আর আপনাকে শিখাইবার অধিক কিছুই নাই। আমি যাহা জানিতাম তাহা আপনাকে দান করিয়াছি। স্বামিজী পণ্ডিতজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার প্রতি এতদূর দয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বস্তুতঃ শেষে তিনিই একরূপ পণ্ডিতজীর শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কারণ পণ্ডিতজীর দ্বাবা যে সব প্রশ্নের সুমীমাংসা হইত না, তিনি নিজেই তাহার মীমাংসা করিতেন। খেতড়িরাজের সভায় অনেক সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দর্শনে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। তাহারাও সকলে স্বামিজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

স্বামিজী যখন কোন পুস্তক পাঠ করিতেন, তখন পুস্তকের দিকে চাহিয়া অতি সত্বর পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। মহারাজ তাহা দেখিয়া এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, আপনি এত শীঘ্র কি

প্রকারে পড়েন?" স্বামিজী বলিলেন, "বালক যখন প্রথম পড়িতে শিখে, তখন এক একটি অক্ষর দুবার তিনবার উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটি উচ্চারণ করে। এ সময়ে তাহার দৃষ্টি থাকে, শুধু এক একটি অক্ষরের উপর। কিন্তু যখন আরও বেশী শিক্ষা করে, তখন তাহার নজর এক একটি অক্ষরের উপর না পড়িয়া এক একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না হইয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি হয়। ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা এক একটি বাক্যের উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি হয়। এইরূপে ভাবগ্রহণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইলে এক নজরে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা উপলব্ধি হয়। ইহা কিছুই নহে, শুধু অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও একাগ্রতার ফল, যে কেহ চেষ্টা করিলে পারিবে। আপনি চেষ্টা করুন, আপনারও হইবে।"

আর একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, বিধি বা নিয়ম কি?" (What is law ?) স্বামিজী ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া বলিলেন, "Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena. (মন যে প্রণালীতে কতকগুলি বস্তুর ধারণা করে তাহাই নিয়ম।) অর্থাৎ বহির্জগতে নিয়মের কোন অস্তিত্ব নাই, তবে কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার উপলব্ধি আমাদিগের মনে যে প্রকারে হয়, তাহাকেই আমরা নিয়ম বলিয়া থাকি। মন আপন সংস্কারগুলিকে বিভিন্ন সমজাতীয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়গুলির সাধারণ লক্ষণসমূহকে এক একটী নিয়মাকারে প্রকাশ করে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সংস্কারের উপর বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া হইতে প্রত্যেক নিয়মের উৎপত্তি হয়।" এই প্রসঙ্গে স্বামিজী সাংখ্যদর্শনের কথা পাড়িয়া দেখাইলেন যে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ ঐক্য আছে।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই হইত। স্বামিজী, মহারাজকে ঐ বিষয় আলোচনায় অতিশয় উৎসাহিত করিতেন এবং বর্ত্তমানকালে এদেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও তত্ত্বসংগ্রহের বহুল প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তাঁহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। এমন কি তিনি মহারাজের জন্য কয়েকখানি সরল বৈজ্ঞানিক পুস্তক (Science primer) ও যন্ত্রাদি আনাইয়া স্বয়ং কিছুদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিয়মমত শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়।

এ সময় খেতড়িরাজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার এক দিন মনে হইল, বোধ হয় স্বামিজী আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি সন্তানের মুখ দর্শন করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি একদিন স্বামিজীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার একটি পুত্রলাভ হয়। আমার বিশ্বাস আপনি যদি শুধু একবার মুখ দিয়া ঐ কথাটি উচ্চারণ করেন তাহা হইলেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" স্বামিজী তাঁহার বিশ্বাস ও ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাঠক দেখিবেন, আজন্ম ব্রহ্মচারীর এ আশীর্ব্বাদ বিফল হয় নাই।

একদিন নিদাঘসন্ধ্যায় সুশীতল বায়ুসেবনার্থ মহারাজ কয়েক জন বয়স্যের সহিত প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্ট আছেন ও বিশাল পুরী মধ্যে কয়েকজন নর্ত্তকী বীণাযন্ত্র সহযোগে সুললিত সঙ্গীত-তান তুলিয়াছে; এমন সময় মহারাজের মনে স্বামিজীকে সেই স্থানে আনয়ন করিবার ইচ্ছা উদিত হইল। কারণ তাঁহার মনে প্রফুল্লতা ছিল না, সেথায় কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। স্বামিজী তখন ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। ধ্যান সাঙ্গ হইলে সংবাদ পাইয়া মহারাজের

নিকট আগমন করিলেন। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর মহারাজ একজন নর্ত্তকীকে একটী গীত গাহিতে আদেশ করিলেন। নারীকণ্ঠোচ্চারিত কোমল স্বরলহরী শ্রুত হইবামাত্র স্বামিজী সেস্থানে থাকা অনুচিত বিবেচনায় গাত্রোত্থান করিলেন; কারণ প্রথমতঃ তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গীত কখনও শুনিতেন না, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক সাধারণতঃ অসচ্চরিত্রা বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি উঠিবামাত্র মহারাজ বিশেষ অনুরোধ সহকারে বলিলেন, "স্বামিজী, ইহার একটি গান শুনিয়া যান। সে গান শুনিলে সাধারণের মনেই অতি উচ্চ ভাবের উদয় হয়, সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবেন।" রাজা কর্ত্তৃক এরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা স্বামিজী পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, এই গানটি সমাপ্ত হইলেই চলিয়া যাইবেন। রমণী গাহিতে লাগিল। রজনী অন্ধকারময়ী, স্থির ও শান্ত—নীলাকাশ তারকাখচিত, এমন সময়ে বৈষ্ণব শিরোমণি সুরদাসের অপূর্ব্ব পদাবলী পর্দ্দায় পর্দ্দায় নৈশবায়ু তরঙ্গ ভেদ করিয়া উঠিল—

"প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

গান শুনিয়া স্বামিজী অতিশয় প্রীত ও ততোধিক বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন যে গায়িকা সামান্যা রমণী হইলেও আজ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সার সত্যটী সুপরিস্ফুটভাবে তাঁহার মর্ম্মবোধ করিয়া দিয়াছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "গান শুনিয়া ভাবিলাম, এই আমার সন্ন্যাস? আমি সন্ন্যাসী আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী, এ ভেদজ্ঞান ত আজিও যায় নাই! সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি কি কঠিন!" শুনা যায় চণ্ডালের বাক্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মন হইতে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল, কে জানে কত তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত মহৎ ফল প্রসূত হয়! আজিও তাহাই হইল। গায়িকার ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠের প্রতিশব্দটী যেন অগ্নিশলাকার ন্যায় স্বামিজীর ভেদবুদ্ধিকে বিদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।"*

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বামিজী দিবারাত্র রাজপ্রাসাদেই অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রায়ই দীন দরিদ্র ভক্তমণ্ডলীর গৃহে দর্শন দিতেন। সমগ্র খেতড়ি সহর তাঁহার গুণে মোহিত হইয়াছিল এবং তিনি মহারাজকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দীনতম প্রজাকেও সেই চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাহাদিগের নিকট বহুবার পরমহংসদেবের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহারা পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করে নাই বটে, কিন্তু স্বামিজীর দৈনন্দিন জীবনের পবিত্রতা ও মধুরতা অনুভব করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পরমহংসদেবের স্থানে বসাইয়া পূজা করিত।

---

* এই ঘটনাটী সম্ভবতঃ খেতড়িরাজের জয়পুরবাটীতে সংঘটিত হয়।

গুজরাট প্রদেশে

স্বামিজীর হৃদয়ে আবার পর্য্যটন-স্পৃহা উদিত হইল। খেতড়ি ত্যাগ করিয়া তিনি আজমীঢ় অভিমুখে গমন করিলেন; আজমীঢ়ে দুই এক দিন কাটাইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমেদাবাদ নগরে গমন করিলেন। কয়েকদিন ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার পর অবশেষে মিঃ লালশঙ্কর উমীয়াশঙ্কর নামক একজন সাব জজের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐখানে থাকিয়া আমেদাবাদ নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বিষয় ছিল তাহা দর্শন করিলেন। দর্শনকালে তাঁহার মনে ঐ সকল স্থান-সংশ্লিষ্ট নানা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উদিত হইল। পূর্ব্বে আমেদাবাদ গুজরাটের সুলতানদিগের রাজধানী ছিল, তখন ভারতবর্ষের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ও সুরম্য নগর বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল। এমন কি সার টমাস রো পর্য্যন্ত ইহাকে "a goodly city as large as London" (লণ্ডনের ন্যায় বড় সুন্দর সহর) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামিজীর মনে হইল যে, এক সময়ে আমেদাবাদের নাম ছিল কর্ণাবতী। জৈনদিগের উন্নতিকালের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মনোহর মন্দির এবং মুসলমান-দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ কতকগুলি মসজিদ ও সমাধি-মন্দির এখনও ঐ সহরে বিদ্যমান আছে। স্বামিজী সেগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। এখানেও তিনি জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া আপনার জৈন-ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি করিলেন এবং আরও কয়দিন কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত ওয়াডওয়ান নামক স্থানে যাত্রা করিলেন।

ওয়াডওয়ানে রণিকদেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়া তিনি লিমড়ী অভিমুখে গমন করিলেন। লিমড়ীরাজ্য তুলার জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রধান নগরের নামও লিমড়ী। পথে স্বামিজী ভিক্ষা করিয়া শরীর-ধারণ করিয়াছিলেন। দিবসে ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেন, রাত্রিতে যেখানে হয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তিনি লিমড়ী সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের একটা আড্ডা আছে। সেখানে গমন করিয়া একটী নির্জ্জন আলয় দেখিলেন। সাধুরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল যে তাঁহার যতদিন ইচ্ছা ঐস্থানে যাপন করিতে পারেন। বহু ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুধাও বিলক্ষণ পাইয়াছিল, সুতরাং কিঞ্চিৎ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার মানসে তিনি এস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্থানটী যে কিরূপ সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ ধারণা ছিল না। দুই এক দিন থাকিবার পর তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যে, আড্ডাধারী লোকগুলি একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজী (বীজমার্গী সম্প্রদায়ভুক্ত)। ধর্ম্মের নামে যত কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই তাহাদের নিত্য ক্রিয়া। পার্শ্বের ঘর হইতে তিনি ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পূজকের প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ শুনিলেন এবং কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এই সব ব্যাপার দেখিয়া তিনি পাছে তাহারা কোন অনিষ্ট করে, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কি বিপদ! যেই তিনি দ্বার খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে গেলেন, অমনি দেখিলেন যে, দ্বারটী বাহির হইতে তালাবদ্ধ, আর ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, লোকগুলি তাঁহার উপর খুব নজর রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি এখন তাহাদের হাতে বন্দী!

একাকী বিদেশে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া স্বভাবতঃ তাঁহার মনে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কিন্তু তারপর তিনি যখন দুর্ব্বৃত্তদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্তদিগের অধ্যক্ষ তাঁহাকে আসিয়া কহিল, "তুমি একজন উচ্চদরের সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে, সম্ভবতঃ তুমি বহুবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছ। এখন তুমি এই তপস্যার ফল আমাদের দান কর। আমরা একটি বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তোমার ন্যায় একজন ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব তুমি প্রস্তুত হও।" স্বামিজী তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। 'লোকটা কি পাগল নাকি? বলে কি? তাঁহার মনে হইল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, ধর্ম্মের নামে কোন কোন সম্প্রদায় এইরূপ নানাবিধ গুপ্ত পাপাচরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এমন কি নরহত্যাদিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি বিশেষ ভীত হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ভয় প্রকাশ করিলেন না। শুধু চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। সে দিবস তাহারা তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিল না, শুধু বন্দী করিয়া রাখিল। তিনি সেই নির্জ্জন কক্ষে পড়িয়া একান্ত চিত্তে স্বীয় ইষ্টদেবতার নামজপ ও বিপত্তারিণী জগদম্বাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এখানে আসার পর একটী বালক প্রায় স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিত ও প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। সে বালকটি যখন-তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিত। আড্ডার লোকেরা তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করিত না বা স্বামিজীর নিকট যাইতে

তাহাকে নিষেধও করিত না। পরদিবস সেই বালকটি স্বামিজীকে দেখিতে আসায় স্বামিজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আনুপূর্ব্বিক তাহাকে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। বালকটী তাঁহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে কি না। স্বামিজী মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ বৎস, তোমার দ্বারাই আমার উদ্ধার হইবে।" তিনি একখণ্ড কাঠের কয়লা দ্বারা একটা খোলামকুচির উপর দুই চার কথায় তাঁহার বিপদের সংবাদ লিখিয়া বালকটীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "এই লও। তোমার চাদরের ভিতর এইটি লুকাইয়া লইয়া এখান হইতে বাহির হও। তারপর যত জোরে পার দৌড়িয়া রাজবাটীতে পৌছিবে এবং সেখানে আর কেহ নয়, স্বয়ং মহারাজের হস্তে ইহা প্রদান করিয়া আমার অবস্থার কথা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিবে।" বালকটী ঠিক তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল—যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে আড্ডা হইতে বাহির হইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইল এবং স্বয়ং লিমড়ীরাজের নিকট সমুদয় ,ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিল। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কয়েক জন দেহরক্ষীকে স্বামিজীর উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন এবং আড্ডার চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরীসমূহ সন্নিবেশ করিলেন।

প্রাসাদে উপনীত হইয়া স্বামিজী রাজার নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। মহারাজ এই অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে অত্যাচারী পাষণ্ডদিগের দমন ও তাহাদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামিজী প্রাসাদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং

নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনার দ্বারা মহারাজের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃতভাষায় অনেক বিচার হইত। শুনা যায় গোবর্দ্ধনমঠের পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার এ সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারকালে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। লিমড়ীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর স্বামিজী মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট কতকগুলি পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া জুনাগড় যাত্রা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে পথে একাকী ভ্রমণকালে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামিজীও ইদানীং যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে বাসস্থান-নির্ণয়-বিষয়ে সতর্ক হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

জুনাগড় যাইবার পথে লিমড়ীর ঠাকুর সাহেবের পরিচয়-পত্র লইয়া স্বামিজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিতে গেলেন। জুনাগড় পৌঁছিয়া তত্রত্য রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাসের ভবনে আশ্রয় লাভ করিলেন। দেওয়ান সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমুদয় রাজকর্ম্মচারীকে স্বামিজীর সকাশে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিতে লাগিলেন। সেখানে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামিজীর কথোপকথন শ্রবণ করিতেন। কোন কোন দিন রাত্রি অধিক হইয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিত না কি ভাবে সময় চলিয়া গেল। দেওয়ান আফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সি, এইচ, পাণ্ডিয়া স্বামিজীর একজন প্রধান গুণানুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে স্ব-ভবনে রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন—“জুনাগড়ে আমরা সকলেই স্বামিজীর অপকট ভাব, আড়ম্বরশূন্যতা,

বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্ম্মপরায়ণতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সকল গুণ ব্যতীত তাঁহার সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা এবং বহুবিধ ভারতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। এমন কি তিনি রন্ধনাদি কার্য্যেও সুপটু ছিলেন এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম।”

জুনাগড়ে স্বামিজী মহর্ষি ঈশার কথা প্রায় বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রধানতঃ রোমসম্রাট্ কনষ্ট্যাণ্টাইন ও খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক-দিগের চেষ্টায় ঈশার প্রভাব সমুদয় পাশ্চাত্য জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তত্রত্য রীতিনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-দর্শনাদি নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার বাক্যগুলি শ্রোতৃগণের চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেন, সন্ন্যাসী ঈশার উপদেশের সহিত ইউরোপের কত কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। এইরূপে ইউরোপের মধ্যযুগ রাফেলের চিত্রাবলী, মহর্ষি ফ্রান্সিসের ধর্ম্মপ্রাণতা, গথিক গীর্জ্জা-নির্ম্মাণ, ক্রুসেড নামক বিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি ঈশার গুণকীর্ত্তনে শতমুখ হইলেও বর্ত্তমানকালের পাদ্রীদিগের উপর তীব্র কশাঘাত করিতে ছাড়িতেন না। বলিতেন, তাহারা কেহই ঈশার ত্যাগ-বৈরাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই, আর দুঃখের বিষয় এদেশে আসিয়া ঈশার উচ্চাদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন না করিয়া ক্রমাগত তাহার প্রাচীন মহাত্মাদিগের অজস্র নিন্দাবাদ ও ধর্ম্মাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে কলেজে

পাঠকালে খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহার কিরূপ তুমুল তর্কবিতর্ক হইত, তাহাও বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, যদি ঈশা স্বয়ং আজ ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে এদেশের নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষাকে তুচ্ছ বা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের মাহাত্ম্যই প্রচার করিতেন ও দেশের লোকের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন। কিন্তু বৈদেশিক সাধুদিগের প্রতি এরূপ উদারভাব পোষণ করিলেও হিন্দুধর্ম্মের সনাতন মহিমা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। জুনাগড়বাসীদিগের নিকট তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন যে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মাদর্শ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুবার পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও চিন্তার আদান-প্রদান করিয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মের গভীরতা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় পরমহংসদেবের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার অমৃতোপম উপদেশসমূহ সকলকে শুনাইতেন। এইভাবে সুদূর জুনাগড়ের লোকেরাও পরমহংসদেবের বিষয় জানিতে ও তাঁহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল এবং অচিরেই অনেক ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের এই নববৈজয়ন্তীতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জুনাগড়েও স্বামিজীর সহিত অনেক প্রাচীন-পন্থী হিন্দু পণ্ডিতের ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার হইয়াছিল।

জুনাগড় নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে সুবিখ্যাত গীর্ণার পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন—সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র এবং বহুবিধ প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষের দৃশ্যস্থল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির, মসজিদ ও সমাধিস্থান বর্ত্তমান

আছে। হিন্দুদিগের কীর্ত্তির কতকগুলি ভগ্নাবশেষ বিশেষতঃ 'খাপড়া-খোদির' নামে কতকগুলি গুহা বহুদিন ধরিয়া বহু সম্প্রদায় কর্তৃক মঠের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামিজী অতিশয় আগ্রহের সহিত এগুলি দর্শন করিলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পর্ব্বতটীই ভাল লাগিল। পর্ব্বতে যাইতে হইলে যে সুবিখ্যাত শিলাস্তম্ভে সম্রাট অশোক তাঁহার চতুর্দ্দশটী আদেশ ক্ষোদিত করিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ছাড়া পথে পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অনেক দেখিবার বস্তু আছে। ভবনাথ নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে সদাসর্ব্বদা বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতেও আশে-পাশে বহু মন্দির দৃষ্ট হয়। দেখিলে স্থানটী যে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মন্দিরে উঠিবার রাস্তাটী অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে একটা প্রকাণ্ড দুরারোহ শিলার ঠিক প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িতে হয়। ১৫০০ ফুট উপরে 'ভৈরো ঝাম্পা' (বা ভীষণ লম্ফ) নামে একটি স্থান আছে। এখান হইতে অনেক ভক্তসাধু ভক্তির আতিশয্যে ১০০০ ফুট বা ততোধিক গভীর খাদে লম্ফ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামিজীর পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণ করা পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাস ছিল, সুতরাং তিনি ক্লান্তিবোধ না করিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। জুনাগড় হইতে ২৩৭০ ফুট উপরে একটী প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে, তন্মধ্যে দুর্গের ন্যায় দুর্ভেদ্য ১৬টী জৈন মন্দির আছে। এখানে আসিয়া স্বামিজী মন্দিরগুলির অত্যদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল ও মণিরত্ন-বিভূষিত তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর প্রাচীন মহাপুরুষদিগের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ও ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া

পুনরায় আরও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মন্দিরের শিখরে উপনীত হইলেন। এ স্থানটী ৩৩৩০ ফুট উচ্চ। এখান হইতে যতদূর চক্ষু যায়, দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে হইল সমস্ত ভারতক্ষেত্র যেন একটী বিশাল ধর্ম্মমন্দির।

এই শিখর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি আর একটী শিখরে অবধূত দত্তাত্রেয়ের পদাঙ্ক দর্শন করিবার জন্য আরোহণ করিলেন। নিম্নে বহুদূরবিস্তৃত শৈলমালা, অদূরে ৪ অঙ্কের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটী হ্রদ—লোকে বলে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর আকার ঐরূপ। মোটের উপর গীর্ণার পাহাড় দেখিয়া স্বামিজী অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং তথায় সাধন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অনতিবিলম্বে একটী নির্জ্জন গুহা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে কিয়দ্দিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন এবং জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব ভুজরাজ্যের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর কয়েকখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর রাজা ও রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত এত আলাপ-পরিচয় করার কি প্রয়োজন? সত্য বটে, আপাত-দৃষ্টিতে ইহা যেন স্বামিজীর চরিত্রের বিরুদ্ধভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, এই তেজস্বী পুরুষ, যিনি চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অর্থের লালসা করেন নাই, যিনি মনে করিলে আপনার অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক শক্তিবলে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, মানী ও সমাজ-শিরোমণি হইতে পারিতেন, তিনি স্বীয় নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা রাজা-মহারাজের প্রসাদা-

কাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের দ্বারস্থ হন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অতি উচ্চ, অতি মহৎ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের কল্যাণসাধন করিতে হইলে শুধু ক্ষুৎপিপাসাকাতর দীন-দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচার করিলেই হইবে না, কিন্তু সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, অর্থ ও জনবলসহায় রাজন্যবর্গের চিত্তের গতি বিলাস-বৈভব হইতে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রভু, প্রজা-দিগের পালক, রক্ষক ও সকল উন্নতির মূল। সুতরাং তাঁহাদিগেরই মতি-পরিবর্ত্তন হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সাধারণ জনমণ্ডলীর সুখ-দুঃখের প্রতিই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল, রাজা ও রাজপুরুষগণের সাহায্যলাভের চেষ্টা শুধু সেই মূল উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছিল।

কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ পরিব্রাজক-জীবন ত্যাগ করিয়া রাজারাজড়ার গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। আর তাহা ছাড়া তাঁহার অন্তঃকরণ বৈরাগ্যের বিমল দীপ্তিতে চির-সমুজ্জ্বল। ত্যাগী পুরুষের নিকট রাজপ্রাসাদই বা কি আর পর্ণকুটীরই বা কি? তিনি যখনই কোন রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তখন এই বলা থাকিত যে, কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে যেন দ্বার হইতে বিতাড়িত না হয়, আর বাস্তবিক হইতও তাহাই। কোন সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনকামনায় রাজ-প্রাসাদে গিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। তিনি যখন যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, তাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিত। একদিন লোকে হয়ত দেখিল তিনি রাজোদ্যানে রাজ-পারিষদবর্গের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন বা চতুরশ্ববাহিত রাজশকটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারাই আবার অনেক সময় দেখিত যে

তিনি একাকী ধূলিপূর্ণ রাজপথে পদব্রজে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কোন দরিদ্র ভক্তের পর্ণকুটীরে দেখা করিতে চলিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি রাজা মহারাজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের সংসর্গেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আর রাজাদিগের নিকট কখনও তাঁহাদিগের অনুগ্রহ-প্রত্যাশীর ন্যায় শশব্যস্তভাবে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার নিজের মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল যে, তিনি কোন রাজারাজড়াকে তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার নিজের প্রকৃতিই অনেকটা রাজপ্রকৃতির ন্যায় গম্ভীর ও গরীয়ান ছিল। তিনি নিজে কিছু বুঝিতে পারিতেন না—কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার অনেকেই তাঁহার ধরণ-ধারণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত এবং বড় বড় পরিবারের অনেকেই তাঁহাকে দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হইবেন বলিয়া ভ্রম করিতেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রাজা-মহারাজাদিগের সহিত অবস্থান না করিয়া তাঁহাদিগের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ রাজাদিগের অপেক্ষা এই সকল উচ্চপদস্থ রাজভৃত্যের ক্ষমতা অনেক অধিক। শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি বা অন্য কোন প্রকার সংস্কারকার্য্যে দেওয়ানেরাই প্রকৃতপক্ষে অধিকতর সাহায্য করিতে সমর্থ, রাজারা ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিয়া এ সকল দিকে ইচ্ছাসত্ত্বেও তত দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

এই সব কারণে ভুজরাজ্যে উপনীত হইয়া তিনি তত্রত্য দেওয়ানের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বামিজীর জনৈক শিষ্যের সঙ্গে এই দেওয়ানজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন,

কিন্তু স্বামিজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির ইয়ত্তা হয় না, তাঁহার দর্শনেই আনন্দ বোধ হইত এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় এমনি একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত সেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। অতি গভীর চিন্তাসমূহও তিনি অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন।" জুনাগড়ের প্রধান অমাত্যের ন্যায় এই দেওয়ানজীর সহিতও উক্ত রাজ্যের শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে স্বামিজী অনেক আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই যাইতেন, সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানের আর্থিক অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং কৃষকদিগের অবস্থা ও জমীর অবস্থা কিরূপ, সন্ধান লইতেন—শ্রমজীবীদিগের উন্নতির উপায়-উদ্ভাবনের জন্য দিবারাত্র চিন্তা করিতেন। দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু-স্মৃতিকারদিগের ব্যবস্থানুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, এইটী তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল এবং রাজপুরুষেরা প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের বিষয় যাহাতে গভীরভাবে চিন্তা করেন, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেন। তিনি যে সকল রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেন, প্রত্যেক স্থানে তত্রত্য প্রধান রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে সাধারণ প্রজার উন্নতিসাধন, হিন্দু-আদর্শানুযায়ী শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন এবং হিন্দুজাতির নব নব উদ্ভাবনী শক্তিশালী প্রতিভার পুনর্জাগরণের প্রবল বাসনা প্রজ্বলিত করিতেন। ইহাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি যতই অধিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ততই দরিদ্র প্রজার অভাব-অনটনের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

ভুজরাজ্যে পৌঁছিয়া স্বামিজী প্রথমে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন ও পরে তাঁহার সাহায্যে মহারাজের সহিতও পরিচিত হইলেন। মহারাজের সহিত তাঁহার যে সুদীর্ঘ আলাপ হয়, তাহার ফলে মহারাজের মনে তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা অঙ্কিত হইয়া যায়। তিনি এখান হইতে দূরে ও নিকটে যত তীর্থ ছিল, সব জায়গায় ঘুরিলেন এবং বহু সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেন। তাহার পর জুনাগড়ে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন; বিশ্রামান্তে পুনরায় বহির্গত হইলেন। এবার ভেরাওয়াল ও সোমনাথপত্তন, লোকে যাহাকে সাধারণতঃ প্রভাস বলে, সেইদিকে চলিলেন। ভেরাওয়াল অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু সোমনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। প্রবাদ আছে যে, সোমনাথের প্রথম মন্দির সোমরাজ কর্তৃক স্বুবর্ণ দ্বারা ও দ্বিতীয় মন্দির রাবণ কর্তৃক রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয়। তৃতীয় বারে কৃষ্ণ এক দারুময় মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও সর্ব্বশেষে ভীমদেব কর্তৃক সেইস্থানে এক প্রস্তরময় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা নাকি তিনবার ধ্বংস ও তিনবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, পূর্ব্বে এই মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দশ সহস্র গ্রাম ইহার অধীন সম্পত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তিন শত বাদক এই মন্দিরের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কালের করাল কবলে নিপতিত এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের নিকট আসিয়া স্বামিজী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন ও ভারতের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধূলিপরমাণু হিন্দুর আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে। কারণ এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ যোগসমাধিতে তনুত্যাগ করেন এবং এই-খানেই যদুবংশীয়গণ পরস্পরের প্রাণবধ করিয়া সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হন। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, একজন কৃষ্ণকায় ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরে

শ্রীকৃষ্ণ হত হন। কথাটা কতদূর সত্য তাহা এখন নির্ণয় করা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঐস্থানে স্বামিজী একজন কৃষ্ণকায় আদিমবাসীকে দেখিয়াছিলেন, তাহার আকার-প্রকার অবিকল কাফ্রীর ন্যায়। ভেরাওয়ালবাসীদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, সোমনাথের নিকটবর্ত্তী গীর পর্ব্বতে বহুকাল হইতে একদল কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী আছে, তাহাদের আকৃতি আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগের আকৃতি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে, কিন্তু কতকাল ধরিয়া যে তাহারা ঐ স্থানে বাস করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সোমনাথের মন্দির দেখিয়া তিনি সূর্য্যমন্দির দেখিতে গেলেন। এখন এই বহুকালপ্রসিদ্ধ মনোহর মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভেরাওয়াল ও সোমনাথ উভয় স্থানই সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সোমনাথে তিনটি নদীর সঙ্গমস্থান বলিয়া একটী অতি পবিত্র স্নানতীর্থ আছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে গেলেন। প্রভাসে পুনরায় ভুজরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার বৈদ্যুতিক আকর্ষণে মুগ্ধ ও গভীর বিদ্যাবত্তায় স্তম্ভিত হইয়া রাজা বলিলেন, "স্বামিজী, অনেকগুলি বই এক সঙ্গে পড়িলে যেমন মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আপনার কথা শুনিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। আপনি এতটা প্রতিভা লইয়া কি করিবেন? একটা কোন বিরাট কার্য্য সম্পাদন না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না দেখিতেছি।" ভেরাওয়ালে অল্পদিন থাকিয়া তিনি পুনরায় জুনাগড়ে ফিরিয়া গেলেন। এই স্থানটী যেন তাঁহার কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছদেশ ভ্রমণের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৃতীয়বার জুনাগড় ত্যাগ করিয়া তিনি পোরবন্দরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য প্রধান মন্ত্রীকে দিবার জন্য একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইলেন। ভাগবত-পাঠকেরা যে সুদামাপুরীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এই

পোরবন্দরই সেই প্রাচীন সুদামাপুরী বলিয়া খ্যাত। এখানে স্বামিজী প্রাচীন সুদামামন্দির ও দর্শনযোগ্য অন্যান্য স্থান দেখিলেন। তারপর দেওয়ানজীর গৃহে যাইবামাত্র পরমসমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে দেওয়ানজী তাঁহাকে মহারাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পোরবন্দরে তিনি ৮।৯ মাস ছিলেন এবং মহারাজের আহ্বানে রাজ-বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে আরও একটু সুযোগ জুটিয়াছিল। মহারাজের সভায় কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যে স্বামিজী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদি বিষয়ে বহুল আলোচনা করিতেন। তিনি দিবারাত্রই অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন, শুধু অপরাহ্ণে বিশ্রামের জন্য কখন কখন রাজকুমারদিগের সহিত অশ্বারোহণ বা অন্যান্য ক্রীড়ায় যোগ দিতেন।

পোরবন্দরে অবস্থানকালে তাঁহার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত স্বামিজীর দেখা হয়। ঘটনাটি এইরূপ—ত্রিগুণাতীত স্বামী কিছুকাল হইতে তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি দ্বারকা হইয়া জাহাজে করিয়া সম্প্রতি পোরবন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় হাটকেশ্বর শিবমন্দিরে উঠিয়াছিলেন। সেখানে কতকগুলি সাধু হিঙ্গলাজ তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানটী পোরবন্দর হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং তাঁহারাও ইতঃপূর্ব্বে বহু পথ ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত ও বিক্ষতপদ হইয়াছিলেন, সুতরাং পদব্রজে হিঙ্গলাজ গমনের আশা ত্যাগ করিয়া ষ্টীমারযোগে প্রথমে করাচী ও পরে করাচী হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি পার হইয়া সেস্থানে যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ইহাতে অর্থের প্রয়োজন। এখন অর্থ কোথা হইতে আসে? অনেক যুক্তি-পরামর্শ হইল, কিন্তু কিছু সাব্যস্ত হইল না। ইতোমধ্যে একজন সাধু বলিলেন, "শুনিতেছি পোরবন্দর-মহারাজের আলয়ে একজন বাঙ্গালী

পরমহংস অবস্থান করিতেছেন। তিনি নাকি গড় গড় করিয়া ইংরাজী বলিতে পারেন ও একজন মস্ত পণ্ডিত। তাহা ছাড়া মহারাজের সঙ্গে তাঁহার খুব খাতির আছে; আমি বলি কি, ত্রিগুণাতীতও বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এবং ইংরাজীও জানেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে রাজাকে বলিয়া তিনি আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করুন।"

ত্রিগুণাতীত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ন্যাসীদের অনুরোধ-রক্ষায় স্বীকৃত হইলেন এবং তৎপরদিন দ্বিপ্রহরের সময় ঐ সাধুদের একজনকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বাঙ্গালী পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তখন মোটেই বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ পরমহংস আর কেহ নহেন, তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথ।

সামান্য সাধু দেখিয়া প্রথমে প্রহরিগণ প্রবেশ করিতেই দিল না। শেষে অনেক হাঙ্গামা করিয়া "আমরা দুইজন সাধু উক্ত পরমহংসের সাক্ষাৎ-প্রার্থী," এই মর্ম্মে ইংরাজীতে একটু লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইল। স্বামিজী সেই সময়ে পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে যাহার-তাহার সহিত দেখা করিতেন না। এই কারণে তিনি গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর আসিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সে সময় স্বামী ত্রিগুণাতীত গাড়ী-বারান্দার ভিতর দিকে ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে নীচে নামিয়া আসিলেন—আসিয়াই দেখেন সারদা দাঁড়াইয়া। স্বামী ত্রিগুণাতীতও পরমহংসের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশে আসিয়া তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন স্বামিজী অপর সাধুটীকে বিদায় করিয়া দিয়া ইঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত নানা কথাবার্ত্তা কহিলেন। কথায় কথায় বলিলেন,

"ঠাকুর যে বলতেন, এর ভিতর সব শক্তি আছে, ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।" স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বলিলেন, "ভাই! আমি কতকগুলি সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরোধে এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে এখানে এরূপ ভাবে রহিয়াছ, তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। উঁহারা হিঙ্গলাজতীর্থে যাইবেন বলিয়া রাজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য চান, তা তুমি যদি এ বিষয়ে রাজাকে বলিয়া কিছু সাহায্য করিতে পার, এই জন্য আমাকে লইয়া উঁহাদের একজন এখানে আসিয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ছি ছি, তুমি অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? কেন? ভিক্ষা করিবে কি জন্য? যদি কেহ স্বেচ্ছায় কিছু দেয় ভাল, নতুবা অর্থের জন্য পরের নিকট হাত পাতিবে! এ কি হীন বুদ্ধি! আর আমিই বা তোমাদের হইয়া রাজাকে অনুরোধ করিতে যাইব কেন? তুমি জান, আমি কখনও কাহারও নিকট অর্থের জন্য হাত পাতি না। আজ রাজপ্রাসাদে আছি, কাল হয়ত দরিদ্রের কুটীরে গিয়া থাকিব। সন্ন্যাসীর তাতে কি আসে যায়? আর বাস্তবিকও আমি ২।৪ দিনের মধ্যেই আবার পথে পথে ঘুরিব। তোমরা সকলেই পরিব্রাজক, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে চুপ করিয়া সহ্য করিবে। যদি তোমার কাছে কিছু থাকে তাহা দিয়া দিতে পার।" যাহা হউক, স্বামিজীর নিকট বিদায় লইয়া পরদিন প্রত্যূষে ত্রিগুণাতীত স্বামী তাঁহার পুঁটলি-পাঁটলা বাঁধিতেছিলেন, উদ্দেশ্য অন্যস্থানে চলিয়া যাওয়া; এমন সময়ে সেই হাটকেশ্বর মন্দিরে স্বামিজী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নিজে জোর করিয়া পুঁটলি হাতে করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতকে নিজের নিকট লইয়া গেলেন ও তথায় দুইদিন রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "আমি যে এখানে রহিয়াছি, তাহা মঠে, বিশেষতঃ অখণ্ডানন্দের নিকট কোন মতে জানাইবে না।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই স্বামিজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তাঁহার শীঘ্র ঐস্থান হইতে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্পের বিষয় জানাইতেই তিনি বলিলেন, এত শীঘ্র যাওয়া হইতে পারে না, তাঁহাকে আরও কিছুদিন তথায় থাকিতে হইবে। স্বামিজীর মনে হইল, বোধ হয় এখানে কিছুদিন যাপন করার মধ্যে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় আছে, সুতরাং তিনি অগত্যা মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া ঐস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ও দিবারাত্র পাঠাদিতে রত হইলেন।

রাজসভায় এ সময়ে শঙ্কর পাণ্ডুরাং নামে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য সভ্য বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। তিনিও স্বামিজীকে কিয়দ্দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া উক্ত অনুবাদ-কার্য্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে কয়েক মাস ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। স্বামিজী পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা বেদের মহিমা উত্তরোত্তর গভীরতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অধ্যয়ন ও মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হইলেন। এখানে পূর্ব্বাবশিষ্ট পতঞ্জলির মহাভাষ্য-পাঠও সমাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের কূট বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পণ্ডিতজীর সাহায্যে ফরাসী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মোটামুটী ঐ ভাষায় অধিকার লাভ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "স্বামিজী, দেখিবেন ভবিষ্যতে উহা আপনার কাজে আসিবে।"

বেদানুবাদকালে পণ্ডিতজী স্বামিজীর অদ্ভুত ধীশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামিজী, আমার মনে হয় যে, আপনি এদেশে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ এদেশে আপনার শক্তির যথাযোগ্য পরিমাণ-নির্দ্ধারণে সমর্থ লোকের

সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আপনার উচিত একবার ইউরোপাদি দেশে গমন করা। সেখানকার লোকে আপনার মর্য্যাদা বুঝিবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি তাহাদের মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার উপর নূতন আলোকরশ্মিপাত করিতে পারিবেন।” স্বামিজী চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার নিজের মনেও কিছুদিন হইতে ঐরূপ একটা চিন্তার ক্ষীণাভাস উঠিতেছিল, পণ্ডিতজীর কথার সহিত তাহার ঐক্য দেখিয়া তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। এমন কি জুনাগড়ে অবস্থানকালে সি, এইচ, পাণ্ডিয়া মহোদয়ের নিকটও তিনি একদিন পাশ্চাত্যদেশে যাইবার ইচ্ছা কথায় কথায় একটু প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে একটা অস্থায়ী কল্পনার মত মনে উদয় হইয়াই অদৃশ্য হইয়াছিল, কারণ তখন ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়টা স্বামিজীর মনে প্রবল অস্থিরতার উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বেই আমরা ত্রিগুণাতীত স্বামীর প্রসঙ্গেও তিনি যে নিজের ভিতর একটা প্রবল শক্তির বিকাশ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতই তাঁহার মধ্যে এরূপ একটা শক্তির উন্মেষ সে সময়ে শুধু তিনি নিজে নহে, পোরবন্দর রাজসভার পণ্ডিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শঙ্কর পাণ্ডুরাংএর মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন, “সত্যই স্বামিজী, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন এবং একবার সে দেশে আগুন জ্বালিয়া আসুন—দেখিবেন, এদেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে বসিতেছে।” এ সময়ে তিনি যে যে স্থানে ভ্রমণ ও যে যে রাজা, রাজপুরুষ বা শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার মধ্যে দেশের জন্য একটা

কিছু করিবার মত প্রবল ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অন্তরের গভীরতার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন, তিনি প্রবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন। বস্তুতঃ তখন তাঁহার মনে কি করিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। তিনি পুরাতনপন্থীদিগের অন্ধতা ও আধুনিক সংস্কারকদিগের অপরিণামদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা আপনাদিগকে জনসাধারণের নেতা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের অনেকের কপটতা ও মূঢ়াচার—সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র দ্বেষহিংসা, স্বার্থানুসন্ধান ও একতার অভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের মধ্যে গগনস্পর্শী গৌরব ও মহত্ত্বের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে—আর্য্য-সভ্যতার অতুলনীয় সম্পদ্‌রাশি দেশমাতার পদতলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে পতিত রহিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহপঙ্কে নিপতিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, নির্ম্মম সংস্কারকের করাল কুঠার ও কূপমণ্ডুকের ন্যায় আত্মগর্ব্বস্ফীত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্ধতা ও বধিরতা—এই উভয় বিপদ মিলিত হইয়া দিন দিন দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তিনি দেখিলেন, এই উভয় বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য তিনি যে সকল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন, তাহাদের সকলকেই বলিয়াছিলেন যে, একটা নূতন যুগ আসিতেছে—তাহাতে পুরাতনের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে বটে, কিন্তু আমূল ধ্বংস হইবে না, অথচ জগতের চতুর্দ্দিক হইতে একটা নূতন আশা, নূতন আশঙ্কা ও নবতর রশ্মি এই প্রাচীন দেশে আসিয়া পড়িবে। তিনি বেশ

বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে কেবল ধ্যান-ধারণা, সমাধি বা তপস্তায় নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা, এই দরিদ্র পতিত অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার ও উন্নত করা অধিকতর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র ধর্ম্মকে জাগ্রত ও পুনর্জ্জীবিত করাই এখনকার শ্রেষ্ঠ কার্য্য। দেশীয় নরপতিবৃন্দ ও প্রধান প্রধান রাজ-অমাত্যদিগকে তিনি এই কথাই বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও সেই আত্মসাক্ষাৎলব্ধ মহাপুরুষের হৃদয়োত্থ গম্ভীর কল্যাণ-নির্ঘোষ অবনত মস্তকে শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তখন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, জগতের চক্ষে ভারতকে আবার উন্নত করিতে হইলে প্রথমে একবার পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ভারতের গৌরবের দিনের সংবাদটা শুনাইতে হইবে, ভারতের ধর্ম্ম-দর্শনের মধ্যে যে অনন্ত আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহা সেই বিলাসবাত্যাবিক্ষুব্ধ ভোগনিপীড়িত বলমদদৃপ্ত পাশ্চাত্য বীরজাতিদিগের নিকট বহন করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই আজি পোরবন্দরবাসী পণ্ডিতদিগের কথা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে সবলে আঘাত করিতে লাগিল—প্রতি আঘাতে হৃদয়সমুদ্রের চতুষ্কোণ হইতে অগণন ভাব-তরঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি যতই অভিনিবেশ সহকারে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, যতই আর্য্যঋষিদিগের প্রচারিত দর্শনাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, সত্যই ভারত জগতের বরেণ্যা ধর্ম্মজননী, আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ও মানব-সভ্যতার আদি জন্মভূমি। কিন্তু ভারতের এই গৌরব-মহিমা যে অজ্ঞতার অন্ধকারময় স্তূপের নিম্নে চিরপ্রোথিত হইয়া রহিল, কোটি কোটি ভারত-সন্তান তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না, এইটাই তাঁহার বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, জলস্রোতে

জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রবল আক্রমণে ধ্বংসোন্মুখ আর্য্যসভ্যতা আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না; আর যাঁহারা সেই সভ্যতার কর্ণধার, শিক্ষার ন্যাসপাত্র ও গৌরবের রক্ষক, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা পুরোহিতগণের অনেকেই কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, ধর্ম্মপালনে উদাসীন, আচার-ব্যবহারে অসংযত এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ। শুধু ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণ ও দর্শনের গুটিকতক বাঁধা বুলি আওড়াইয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেছেন —সদসদ্ বিচার দ্বারা পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা বা জাতীয়তার বৃদ্ধি কোনদিকেই অগ্রসর নহেন। এই সকল বিষয়ে স্বামিজী যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। "আমি কি করিতে পারি", "আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব?"—পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তথাপি ঐ চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, অবশেষে একদিন তিনি পোরবন্দর-বাসীদিগের মায়া কাটাইয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকাধামে উপনীত হইলেন। দ্বারকার আজি আর সেদিন নাই—যে স্থানে একদিন অতীত ভারতের হৃদয়দেবতা পুণ্যস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাহা সতত প্রবলপরাক্রান্ত যাদববীরগণের পদভরে কম্পিত হইত, আজি সেথায় মহাসাগরের নীল জলরাশি সকৌতুকে ক্রীড়া করিতেছে! হায় সে প্রাচীন দিন!

দ্বারকায় আসিয়া স্বামিজী আবার পূর্ব্ববৎ পরিব্রাজকের স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কখনও গভীর ধ্যানে থাকিতেন, কখনও অতীতের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিতেন, কখনও নিরাশার বিভীষিকায় তাঁহার বেদনা-কাতর হৃদয় ভূগর্ভের তিমিরপুঞ্জের মধ্যে ডুবিয়া

যাইত, কখনও বা আশার উজ্জ্বল আলোকে আনন্দলহরী তালে তালে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিত। তিনি আশা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং ইষ্টদেবতার নিকট মনোবাঞ্ছা-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতেও বিরত ছিলেন না। তিনি অকূল বারিধির কূলে বসিয়া উদ্দাম স্রোতোবেগ নিরীক্ষণ করিতেন আর ভাবিতেন—বৈদেশিক সভ্যতার প্রচণ্ড স্রোত কি করিয়া বন্ধ করা যায়। এইভাবে নীল-সিন্ধুজলের অপর পারে চাহিয়া চাহিয়া উদাসভাবে কুজ্‌ঝটিকাবৃত ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে স্বামিজী সময় সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

দ্বারকায় তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহান্তজী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য একটি নির্জ্জন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ভাবিতেন—এক সময়ে এই মঠ কিরূপ বিদ্যালোচনার স্থান ছিল, এখানে যুগে যুগে কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত যতি ও কত পণ্ডিতের চরণধূলি পতিত হইয়াছে, আর আজি ইহার কি দশা! ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ভাবোদ্বেল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে নয়নদ্বয় প্লাবিত হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া শুধু কাঁদিতেন না—কিসে এ দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে, অহরহঃ তাহার চিন্তা করিতেন। সে চিন্তার আদি অন্ত ছিল না—সে দিকহীন, কূলহীন চিন্তাসাগরে তিনি যেন একখানি কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যহারা হইয়া ভাসিয়া চলিতেন। কিন্তু একদিন কূল মিলিল—সারদামঠের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাইলেন।

দ্বারকা ত্যাগ করিয়া স্বামিজী মাণ্ডবী গমন করিলেন; সেখানে

অনেক ভক্তবন্ধুর শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া প্রথমে নারায়ণ-সরোবর নামক তীর্থে ও পরে আশাপুরী, কোটীঘর প্রভৃতি হইয়া পুনরায় মাণ্ডবীতে প্রত্যাগত হইলেন। সব স্থানেই পূর্ব্ববৎ যত্রতত্র শয়ন, ভিক্ষামাত্র সম্বল ও ইষ্টদেবতার চিন্তারত হইয়া তিনি স্বেচ্ছাবিহারী সিংহের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

মাণ্ডবীতে অখণ্ডানন্দ স্বামী পুনরায় স্বামিজীর সহিত দেখা করেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন, স্বামিজী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন; তাই সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। এবারও উভয়ে এক বৃদ্ধা শেঠীর গৃহে আট দিন ছিলেন। শেষে অখণ্ডানন্দ, স্বামিজীকে ছাড়িতে না চাওয়ায় স্বামিজী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিদায় করেন। মাণ্ডবী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি ভুজরাজ ও তাঁহার দেওয়ানের আমন্ত্রণে আর একবার ভুজরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বহুক্রোশ ভ্রমণ করিয়া তিনি পলিটানা নামক প্রাচীন স্থানে শত্রুঞ্জয় নামক পবিত্র জৈনমন্দির দর্শন করিলেন। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের উপরে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি হনুমানজীর মন্দির ও হেন্‌গার নামক কোন মুসলমান পীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মুসলমান দেবালয় আছে। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে চতুর্দ্দিক্‌কার দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। নিম্নে বহুদূরপ্রসারী সমতলক্ষেত্র, পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগর ও উত্তরে চামর্দ্দীশিখর-শোভিত শিহোরের শৈলমালা—সে দৃশ্য অতি সুন্দর। এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কত জাতি উদিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, কে তাহাদের কথা মনে করে! অদূরে পশ্চিম ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী প্রাচীন বল্লভীপুর নগর—যাহা রোমনগরী অপেক্ষাও প্রাচীন—আজি তাহার সে গৌরব কোথায়!

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া স্বামিজী পলিটানার অন্তর্গত শত শত মন্দির দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভাস ও পলিটানায় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটিয়াছিল। অনন্তর তিনি বরোদার গায়কবাড়ের রাজধানীতে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুর মনিভাইয়ের বাটীতে অল্পকালের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মধ্য-ভারতের অন্তর্গত খাণ্ডোয়া সহরে উপনীত হইলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামক একজন উকীলের বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। কাছারী হইতে বাটী ফিরিয়া হরিদাস-বাবু দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রথম দর্শনে তিনি মনে করিয়াছিলেন, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী হইবে, কিন্তু দুই চারিটী কথা কহিয়াই বুঝিলেন যে, এত বড় পণ্ডিতসাধু আর কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। সুতরাং তিনি তাঁহাকে নিজগৃহে আহ্বান করিলেন এবং বাটীর সকলে নিকট-আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ রহিলেন, মধ্যে একবার ইলোরা ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

খাণ্ডোয়ার বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকেরা স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যে অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বামিজীকে সাধারণের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে স্বামিজী বলিলেন যে সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বে গুরুশিষ্যের মধ্যে যেরূপভাবে কথোপ-কথন হইত, সেই ভাবে পরস্পর সম্মুখে বসিয়া কোন বিষয় আলোচনা করা ভাল; ইহাতে আলোচ্য বিষয়টিও সুপরিস্ফুট হয় আর বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বেশ ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে।

কিন্তু তথাপি হরিদাসবাবু আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকিলে তিনি অর্দ্ধসম্মত হইয়া বলিলেন যে, সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস না থাকাতে কি করিয়া স্বরের উচ্চাবচ আয়ত্তাধীন করিতে হয়, সে অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, তবে যদি অনেকগুলি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনুরাগী শ্রোতা আসিয়া জুটে, তবে তাহাদের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি দুচার কথা বলিতে পারেন। কারণ অনুরাগী শ্রোতা পাইলে বক্তার অন্তর্নিহিত বক্তৃতাশক্তি আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু খাণ্ডোয়ার ন্যায় সামান্য স্থানে এরূপ শ্রোতার অভাব হওয়ায় হরিদাস-বাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। খাণ্ডোয়ায় অবস্থান কালে দেওয়ানী আদালতের জজ বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামিজীর সম্মানার্থ স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে একদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে সময়টা বেশ আনন্দে ও শিক্ষায় কাটিবে এই ভাবিয়া স্বামিজী উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর একখণ্ড হাতে লইয়া নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলে সমবেত হইলে তিনি কতকগুলি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য স্থান আবৃত্তি করিয়া অতি সরল শিশু-ধারণোপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাবু পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী নামে একজন উকীল ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, সুতরাং সভায় তিনিই সমালোচকের স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যে সকল অপূর্ব্ব সরল ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তিনি অবশেষে নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইলেন। স্বামিজীর পাঠ সমাপ্ত হইলে পিয়ারীবাবু হরিদাসবাবুর কাণে কাণে বলিলেন, "স্বামিজীকে দেখিয়াই মনে হয়, ইনি ভবিষ্যতে একজন জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন।"

খাণ্ডোয়াতেই প্রথম স্বামিজীর মনে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায়

যাইবার সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। জুনাগড় ও পোরবন্দরে যে চিন্তার অঙ্কুরমাত্র হইয়াছিল, এখানে তাহা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। তিনি একদিন হরিদাসবাবুকে বলিলেন, "যদি কেউ আমার যাতায়াতের খরচ দেয়, তা হলে আমি যেতে পারি।" খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হরিদাসবাবু স্বামিজীকে আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, "তোমরা সবাই এত যত্ন করিতেছ যে, তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আমার থাকিবার যো নাই। আমি তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি—রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। যদি আমি এই ভাবে প্রত্যেক স্থানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আর আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না।" হরিদাসবাবু যখন দেখিলেন, স্বামিজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার বোম্বাই-প্রবাসী এক সহোদরের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার ভ্রাতা আপনাকে মিঃ ছবিলদাসের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। বোধ হয় তিনি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক স্বামিজী, আপনার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "বলিতে পারি না, কিন্তু গুরুজী ত আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতেন।" এইরূপে খাণ্ডোয়ার বহু ভক্ত ও বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। হরিদাসবাবু তাঁহাকে একখানি টিকিট কিনিয়া দিয়া রেলে যাইতে অনুরোধ করেন। স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামিজী বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিলেন। এখানে হরিদাসবাবুর ভ্রাতার সাহায্যে প্রখ্যাত-নামা ব্যারিষ্টার রামদাস ছবিলদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি রামদাসবাবুর অনুরোধে তাঁহারই গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এখানেও অধিকাংশকাল বেদচর্চ্চা লইয়া রহিলেন। দৈবক্রমে একদিন অভেদানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তিনি বলেন, "এ সময়ে স্বামিজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হইয়াছিল। আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, অহর্নিশ ইহাই ভাবিতেন।" স্বামিজীর চিত্তের উৎকণ্ঠা দেখিয়া অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তখন স্বামিজীকে দেখিলেই একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলিয়া মনে হইত।" স্বামিজী নিজেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।"

কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি পুণায় গমন করিলেন। স্বামিজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে বালগঙ্গাধর তিলক ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামিজীকে দেখিয়া ঐ ভদ্রলোকেরা ইংরাজী ভাষায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামিজী ইংরাজী জানেন না, সেই জন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন, আর তিলক সন্ন্যাসীদের পক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন। স্বামিজী প্রথমটা চুপ করিয়া

ইঁহাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন, শেষে ইঁহাদের কথায় যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে স্বামিজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুণায় নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া এক মাস রাখিলেন।

এই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বহুবিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামিজী বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লিমড়ীরাজ মহাবালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া স্বামিজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ পুনরায় গুরুর দর্শনলাভে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিরস্থায়িভাবে লিমড়ীতে বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, "মহারাজ, এখন নহে, এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যতদিন না কার্য্য শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নাই। তবে যদি কখন বিশ্রামের সময় থাকে, নিশ্চয় জানিবেন আপনার ওখানে গিয়া থাকিব।"

অতঃপর স্বামিজী বেলগাঁওয়ে সাবডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে নয় দিবস যাপন করিয়াছিলেন। হরিপদবাবুর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় দিলাম।

"১৮৯২ সালের ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। আমার একজন উকীল বন্ধু একটি পুষ্টদেহ প্রফুল্ল-কান্তি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে লইয়া আমার বাসায় উপস্থিত। বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ-মানসে আসিয়াছেন।' সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্ত্তিটি বেশ প্রশান্ত, চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, অঙ্গে আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া

পাগড়ী এবং পায়ে মহারাষ্ট্রদেশীয় চটিজুতা। সে অপরূপ মূর্ত্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন চক্ষুর সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল— তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন হুঁকা নাই, আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি। আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস গেরুয়াবেশধারী সন্ন্যাসীমাত্রেই জুয়াচোর। ভাবিলাম, ইনিও সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন, কিম্বা উক্ত মারাঠী বন্ধুর বাটীতে থাকিবার অসুবিধা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় আমার বাটীতে থাকিবার মতলব। মনে এইরূপ নানা তোলাপাড়া করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকীলবাবুর বাসায় বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে। কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহভক্তি করিতেছেন, অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।' সে রাত্রে বড় বেশী কথা-বার্ত্তা হইল না। কিন্তু দুই চারি কথা যাহা কহিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন; তথাপি টাকাকড়ি স্পর্শ করেন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ

স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন ও উকীলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম। মনে হইল এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম, 'যাহার পয়সা নাই, তাহার মরণ ভাল,' 'বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব'। কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিয়া ফেলিল।"

পর দিবস ভোর ছটার সময় উঠিয়া হরিপদবাবু অনেকক্ষণ স্বামিজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেলা ৮টা বাজিয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকটির গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে এক বৃহৎ সভা হইতেছে, তাহাতে অনেক প্রধান প্রধান উকীল, পণ্ডিত ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া স্বামিজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন ও খুব কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বামিজী কাহাকেও ইংরাজীতে, কাহাকেও সংস্কৃতে এবং কাহাকেও হিন্দুস্থানীতে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে একবার একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না। এক ভদ্রলোক হাক্সলীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান নিহিত আছে মনে ভাবিয়া সেই সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্বামিজীকে পরাস্ত করিবাব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর নিকট সে সব কতক্ষণ টিকিবে? তিনি বহু পূর্ব্বেই হাক্সলীর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং কখন গভীর যুক্তিতে, কখন বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে, কখনও বা আপনার আধ্যাত্মিক তেজ-

প্রভাবে সহজেই প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করিলেন। মিত্রজা স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া অবাক হইয়া বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলেন—'ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা ?'

নয়টার পর যাহাদের অফিস বা কোর্ট ছিল, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামিজীর দৃষ্টি হরিপদবাবুর উপর পড়ায় চা খাইতে যাইবার কথা মনে পড়িল। বলিলেন, "বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।" মিত্রজা পুনরায় স্বামিজীকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামিজী বলিলেন, "আমি যাঁহার বাটীতে আছি, তাঁহার মত করিতে পারিলে যাইতে পারি।" অনেক চেষ্টার পর গৃহস্বামী হরিপদ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বামিজীর সঙ্গে ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক, একটি কমণ্ডলু ও একখানি মাত্র গেরুয়া বস্ত্র ছিল।

হরিপদবাবুর বাটীতে সহরের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামিজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। ক্রমাগত ধর্ম্মালোচনা, বিচার ও প্রশ্নোত্তরে তিন দিবস কাটিয়া গেল এবং এই অল্পকালের মধ্যেই হরিপদবাবুর মনের দীর্ঘকালসঞ্চিত সন্দেহরাশি দূর হইল। চতুর্থ দিবসে স্বামিজী বলিলেন, "আর নহে, এবার যাইতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে সহরে তিন দিন ও গ্রামে এক দিনের অধিক থাকা বিধি নহে, বেশী দিন থাকিলেই আসক্তি জন্মায়। সন্ন্যাসী মায়াপাশ হইতে যথাসাধ্য দূরে দূরে থাকিবে।" কিন্তু মিত্রজা তাঁহাকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার একান্ত অনুরোধে স্বামিজী আরও কয়েক দিবস ওখানে রহিলেন।

সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া হরিপদবাবু

একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া স্বামিজীকে বক্তৃতা দিতে বলিলেন ; কিন্তু স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "না, উহাতে নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে। ওটা আমি পছন্দ করি না। আর তা ছাড়া ওরূপ বৃহৎ সভা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা সামনা-সামনি বসিয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল।"

একদিন স্বামিজী অর্থ স্পর্শ না করিয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা হরিপদবাবুর নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাসের পর নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় একজন এরূপ ভীষণ ঝাল তবকারী খাইতে দিল যে, তাহা রসনায় পড়িবামাত্র উদর পর্য্যন্ত ভয়ানক জ্বলিতে লাগিল, অবশেষে বাটি বাটি তেঁতুল-গোলা খাইয়াও সে জ্বালা থামাইতে পারেন না! আর এক জায়গায় একবার ভিক্ষা চাহিবামাত্র গৃহস্থ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, "এখানে চোর-ছেঁচড়, সাধু-ফকির, যোচ্চোর এ সবের জায়গা হবে না।" আবার অনেক দিন ধরিয়া তিনি কিরূপ ডিটেকটিভ পুলিশের নজরে নজরে থাকিতেন, তাহাও বলিলেন। হরিপদবাবু তাঁহার প্রবাস-ভ্রমণের ক্লেশকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা, ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত সহ্য করিয়াছেন!' কিন্তু স্বামিজী সে সব যেন কত মজার কথা এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন। শেষে বলিলেন, "সবই মহামায়ার খেলা।"

স্বামিজীর অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম ও দরিদ্রদিগের প্রতি সহানুভূতির উল্লেখ করিয়া হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "একদিনের কথা—কলিকাতা সহরে এক ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে একথা পড়িয়া স্বামিজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে,

বলিবার কথা নহে। বারবার বলিতে লাগিলেন, 'এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!' কেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'এদেশে চিরদিন ভিখারীর জন্য মুষ্টিভিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যতই গরীব হউক না কেন ভিক্ষা করিয়া দুবেলা দুমুঠা পায়। দুর্ভিক্ষ না হইলে একেবারে না খাইয়া মরে না। কিন্তু এই আমি প্রথম শুনিলাম কলিকাতার মত জনপূর্ণ সহরে একটা লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।' ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় আমি তখন দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। সুতরাং বলিলাম, 'স্বামিজী, ভিখারীদের যৎসামান্য কিছু দেওয়াতে কি অর্থের সদ্ব্যবহার হয়? আমার ত বোধ হয় উহাতে তাহাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইয়া থাকে; কারণ বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া তাহারা গাঁজা গুলি খায় ও আরও অধঃপাতে যায়; লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়।' স্বামিজী বলিলেন, 'যদি অবস্থায় কুলায় তবে ভিখারীকে যাহা হয় কিছু দেওয়া উচিত। দিবে ত ২।১টি পয়সা, তাহা নিয়া কে কি করে না করে সে জন্য তোমার মাথা ঘামাইবার অত দরকার কি? যদি তাহার প্রকৃতই অভাব হয় আর তোমার নিকট সে কিছু না পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চুরি করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে আরও বেশী অনিষ্ট হইবে। কারণ গাঁজা গুলিতে শুধু তাহার নিজেরই ক্ষতি, কিন্তু চুরি করিলে সমস্ত সমাজের ক্ষতি। এদেশে ভিখারী চিরদিনই ভগবানের নামে ভিক্ষা করে। দাতারও উচিত ভিখারীকে নারায়ণজ্ঞানে ভিক্ষা দেওয়া, কারণ সে দানরূপ কর্ম্মদ্বারা তোমার চিত্তশুদ্ধি-সাধনের সহায়তা করিতেছে। তুমি যাহা দিতেছ, তাহার বদলে যাহা পাইতেছ, তাহার মূল্য অনেক অধিক।"

আর একদিন হরিপদবাবু বলিলেন, "স্বামিজী! আপনার আজ তর্ক-

বিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian, * তাহাতে যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জানিও, যে সকল লোক সভায় তর্ক-বিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ঐরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে,—তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।" হরিপদবাবু বলিলেন, "ভাল স্বামিজী! সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?" তিনি বলিলেন, "ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন, কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।" হরিপদবাবু বলিলেন, "আচ্ছা স্বামিজী! তাহা হইলে দেখিতেছি, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "নিজে ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়া আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার চেয়ে কে বুঝিয়াছিল।"

হরিপদবাবুর বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদাসন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে স্বামিজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া ওকথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন, "ইহাই আমার Famine

---

* যাহাতে অধিক লোকের প্রভূততম সুখ হয়—তাহা সকল সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য—এই মতবাদ (হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ) এর সমর্থক।

Insurance Fund (দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল)। যদি পাঁচ সাতদিন খাইতে না পাই, তবু এই চর্ব্বিগুলি আমায় বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে, যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়-ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখিয়া-শুনিয়া ভোগ-বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

"বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, সেইজন্য তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া

আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না—কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্ম্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া, দেখিয়া-ঠেকিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।"

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য স্বামিজীর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন, "পর্য্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়, তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষনিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লঙ্কা খাই।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "The test of pudding lies in eating" (খাইলেই পিষ্টকের ভালমন্দ বুঝা যায়), তাহা না হইলে কিছুই চলিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, বলিতেন, "ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল। নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।" হরিপদবাবু বলিলেন, "কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটী হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি সর্ব্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগদ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে সকল কাজ ধর্ম্ম-লাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না।" উত্তরে তিনি পরমহংসদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন,

"কখন ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম্ম করিও। কেহ দোষ করিলে দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।" পরে পূর্ব্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, "এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম ; লোকটির বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫৲ টাকা, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার বাসার খরচ মাসে ২।৩ শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?' তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতর সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের কাছে কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট হইতে প্রচুর টাকাকড়ি বাহির হয়। যাহাদের চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুসঘাস কিছু লই না'।"

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথায় তিনি আর একবার বলিয়াছিলেন, "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক পরোয়ানার ভয়ে কিম্বা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই! সে পেট ভরিয়া খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি জুতা বা ছাতা পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করিবার যো নাই। কেন, সে ত মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই, ইহাও ভুল। এক সময়ে আমার একটী সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে

নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।" হরিপদবাবু কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।"

'বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল' বলায় স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না; কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন! বিশ্বাস কি কখনও জোর করিয়া হয়? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব!" আর একবার ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন, "যাহা অভীষ্ট কার্য্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ; ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচুনীচুর বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে, তত দুই এক হইয়া যাইবে। চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে; কিন্তু আমরা সব এক দেখি— সেইরূপ।" স্বামিজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

বাল্যবিবাহের উপর স্বামিজী অত্যন্ত চটা ছিলেন। সর্ব্বদাই লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখা যায় না। বিলাত হইতে ফিরিবার পর যাহারা স্বামিজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন সম্বন্ধে কিরূপ সতর্ক ছিলেন। তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধা-বাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই, কোন লোক একবার এ কথা বলায় তিনি

বলিয়াছিলেন, "দেখ, মন বেটা বড় পাগল, চুপ করিয়া কখনই থাকে না ; একটু সময় পাইলেই আপনার পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। সেজন্ত সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহার খুব দখল আছে, তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এই বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করে—সে স্ত্রৈণ নয়, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেয় মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

বেলগাঁওয়ে যাঁহারা স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও উচ্চাঙ্গের গণিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক এ সময়ে স্বামিজী ধর্ম্মবিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলি প্রায়ই বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেন। ধর্ম্মের যে কোন প্রসঙ্গ উঠিত, তিনি ঠিক তদনুরূপ একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিতেন। দেখাইতেন—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য মূলে এক, অর্থাৎ সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা।

হরিপদবাবু বলেন, "বাস্তবিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামিজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

"ইতঃপূর্ব্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন একটী সুন্দর পদ্যে লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম্ম সত্য—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। সেই পদ্যটি আমার তখনকার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল

হওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে স্বামিজীকে তাহা পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনরীদের সহিত 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান এককালে দুই-ই হইতে পারেন না' এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যা-পূরণ স্বামিজীও করিতে পারিবেন না। স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি ত science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—centripetal and centrifugal [১] কি act (ক্রিয়া) করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিরুদ্ধ শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায়—দুই opposite (বিরুদ্ধ) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না? All I can say is that you have a very good idea of your God.' [২] আমি ত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য is absolute (নিরপেক্ষ)—সমস্ত ধর্ম্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে সকলই relative truth (আপেক্ষিক সত্য)। Absolute (নিরপেক্ষ) সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মনবুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মনবুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন

১। বিরুদ্ধ শক্তি—একটী কেন্দ্রাভিমুখিনী ও অপরটী কেন্দ্রাপসারিণী।

২। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার বেশ ভাল ধারণা আছে।

আকার বা ভাবগুলি, নিত্য সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর, যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (আলোক-চিত্র) লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। নিত্য সত্যের সম্বন্ধে আপেক্ষিক সত্যসকল ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জন্য নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।"

Infinity (অনন্ত পদার্থ) সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিলে স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য—"There can be no two infinites." (দুটো অনন্ত পদার্থ হতে পারে না)। হরিপদ-বাবু সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলিলেন, "আকাশ অনন্তটা বুঝলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা ত বুঝলাম না। যা হোক, একটা পদার্থ অনন্ত একথা বুঝি, কিন্তু দুটো জিনিষ অনন্ত হলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখবে যে সময়ও যা, আকাশও তাই। আরও অগ্রসর হয়ে বুঝবে সকল পদার্থই অনন্ত—সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুটা দশটা নয়।"

স্বামিজী বলিতেন, "চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিষ দেখতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিষ মনে করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার করে ঐ সমস্ত জিনিষগুলো ৬৩টা মূল দ্রব্য হতে উৎপন্ন হয়েছে স্থির কল্লে। ঐ মূলদ্রব্য-গুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্রদ্রব্য বলে এখন তার সন্দেহ হয়েছে। আর যখন রসায়নশাস্ত্র শেষ মীমাংসায়

পৌঁছুবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থাভেদমাত্র বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত বিভিন্ন জিনিষ বলে সকলে জানত। এখন প্রমাণ হচ্ছে যে ওগুলো সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে। তারপর দেখলে যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে—চেতন প্রাণীর ন্যায় গমন-শক্তি নেই মাত্র। তখন খালি দুই শ্রেণী রইলো—চেতন ও অচেতন। আবার কিছু দিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও স্বল্প-বিস্তর চৈতন্য আছে। (ইহার পরে অধ্যাপক জগদীশ বসু তাড়িত প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।)

"পৃথিবীতে যে উঁচু-নীচু জমি দেখা যায়, তাও সতত সমতল হয়ে একভাবে পরিণত হবার চেষ্টা কচ্ছে। বর্ষার জলে পর্ব্বতাদি উঁচু জমিগুলি ধুয়ে গিয়ে গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখলে উহা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ কর্ত্তে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন-বিকীরণাদি (conduction, radiation) উপায় অবলম্বনে সর্ব্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

"গাছের ফলফুল পাতা শেকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখলেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করেছে। তিনপল কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে এক সাদা রং রামধনুকের সাতটা রং এর মত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভেতর দিয়া দেখলে সমস্ত লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মনুষ্যের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যটাকে ধর্ত্তে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না।"

এই সব কথা শুনিয়া হরিপদবাবু বলিলেন, "স্বামিজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল এনে সমান্তরাল রাখলে দেখায় যেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে! উহারই নাম vanishing point—মরীচিকা, রজ্জুতে অহিভ্রম প্রভৃতি দৃষ্টিবিভ্রম সর্ব্বদাই হচ্ছে। Calespar নামক পাথরেব নীচে একটা রেখাকে double refraction (দ্বিগুণ কিরণ-বিবর্ত্তন) এ দুটো দেখায়। একটা পেন্সিল আধ গ্লাস জলে ডুবুলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চক্ষুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা lens (বীক্ষণকাচ বা কাচপুটক) মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স ভিন্নশক্তি-বিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য তাহারও ত প্রমাণ নেই! জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ সত্য সত্য করে পাগল, কিন্তু বাস্তবিক সত্য (Absolute Truth) বোঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই! কারণ ঘটনাক্রমে বাস্তবিক সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য এটী সে বুঝবে কি করে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), absolute (নিরপেক্ষ, নির্গুণ) বোঝবার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝতে পারবে না।"

স্বামিজী। তোমার বা সচরাচর লোকের absolute (নিরপেক্ষ)

জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বলে কারো নেই, এ কথা কি করে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলে দু'রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান! সত্য জ্ঞানের উদয় হলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব দেখায় এক। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত।

হরিপদ। আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাবছেন, তাও ত মিথ্যাজ্ঞান হতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলছেন, তাও ত সত্য হতে পারে?

স্বামিজী। ঠিক বলেছ, তজ্জন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। মুনি-ঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য 'অনুভব করে যা বলে গিয়েছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য আমাদের বিচার করে বলবার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারব ততক্ষণ কেমন করে বলব কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে! শুধু দুটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে—এইটী বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক তখন অন্যটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হয়ত কলকাতায় কেনা-বেচা কল্লে, উঠে দেখ বিছানায় শুয়ে আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখবে না এবং পূর্ব্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে পারবে। কিন্তু এ সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হতে না হতেই রামায়ণ-মহাভারতও পড়বার ইচ্ছা করলে চলবে কেন? ধর্ম্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়। হাতেনাতে কর্ত্তে হবে, তবে এর সত্যাসত্য বুঝতে পার্ব্বে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন-শাস্ত্র), Physics (পদার্থ-শাস্ত্র) প্রভৃতিরও অনুমোদিত। আর দু বোতল Hydrogen

(উদজান) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) নিয়ে জল কৈ বল্লে কি জল হবে, না, তাদের একটা শক্ত জায়গায় রেখে electric current (তাড়িত প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) হলে তবে দেখতে পাবে ও বুঝবে যে জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হতে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি কর্ত্তে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। এক মুহূর্ত্ত শ্মশানবৈরাগ্য হল আর বল্লে কিনা, কৈ আমি ও সব এক দেখছি না!

হরিপদ। স্বামিজী, আপনার ও কথা সত্য হলে যে অদৃষ্টবাদ এসে পড়ে। যদি বহুজন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে তখন আমারও হবে।

স্বামিজী। তা নয়। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ কর্ত্তে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মফল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের ৫০ খানা ছবি ১০ মিনিটেও দেখান যায়— আবার দেখতে দেখতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে স্বামিজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। "সৃষ্টবস্তুমাত্রেই চেতন ও জড়, সুবিধার জন্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতন ভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্ম্মাণ করেছেন; কেহ বলেন—মানুষ ল্যাজবিহীন বানরবিশেষ। কেহ বলেন—মানুষেরই কেবল বিবেচনা-শক্তি আছে; কেহ বলেন—তাহার কারণ মানুষের

মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী—যাহাই হউক, মানুষ প্রাণীবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি বোঝবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করে এটা কি, ওটা কি অনুসন্ধান কর্ত্তে লাগলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্ব্বরা ভূমিতে শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করে কৌপীন পরে প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোয় বসে আদা-জল খেয়ে বিচার কর্ত্তে লাগলেন—এমন জিনিষ কি আছে, যা জানলে সব জিনিষ জানা যায়! [তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্ব্বাকের বস্তুসত্য মত (ultra materialistic theory) থেকে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়।] দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপস্থিত হচ্ছেন ও এক কথাই এখন বলতে আরম্ভ করেছেন। দুই দলই বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল ও আকাশ (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়। ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় ছিল যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আসবে যখন আবার সূর্য্য থাকবে না, ইহা নিশ্চিত। তা হলে অখণ্ড সময় একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বললে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় অল্প সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও তদ্রূপ সময়ের মত অনির্ব্বচনীয়

একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হতে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্ত্তা আছেন, কিন্তু তা হলে সৃষ্টিকর্ত্তারও ত সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক? তা থাকতে পারে না। অতএব আদিকারণ সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল কয়টি অনন্ত পদার্থই এক এবং একই ঐ সকল রূপে প্রকাশিত।

হরিপদবাবু দেখিলেন, স্বামিজী শুধু দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, নাটক নভেলাদিও বিস্তর পড়িয়াছেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী পিকউইক পেপারস্ হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। হরিপদবাবু নিজেও ঐ গ্রন্থখানি অনেকবার পড়িয়াছিলেন, সুতরাং বুঝিতে পারিলেন, কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া তাঁহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলেন, 'সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ বলিলেন? পূর্ব্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন।' কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল আর একবার।" হরিপদবাবু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?" স্বামিজী বলিলেন, "একান্তমনে পড়া চাই, আর খাদ্যের সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া উহা assimilate (শরীরের অন্তর্ভুক্ত করা চাই।"

আর একদিন স্বামিজী মধ্যাহ্নে একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন, হরিপদবাবু অন্য ঘরে ছিলেন। হঠাৎ স্বামিজী এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, এ হাসির বিশেষ কোন

কারণ আছে ভাবিয়া হরিপদবাবু তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিশেষ কিছুই হয় নাই, স্বামিজী যেমন বই পড়িতেছিলেন তেমনই পড়িতেছেন; তিনি প্রায় ১৫ মিনিট স্বামিজীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাপি স্বামিজীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না। খানিক পরে স্বামিজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও তিনি অতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন শুনিয়া বলিলেন, "যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা এক মনে এক প্রাণে সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজীপুরের পওহারী বাবা ধ্যানজপ পূজাপাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটীটিও তেমনি একমনে মাজিতেন। এমনি মাজিতেন যে সোনার মত দেখাইত।"

মিত্রজা বলেন, "স্বামিজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে, বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে তাঁহার ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিত—ইঁহার ভিতর এত শক্তি! এই ত দেখিতেছিলাম আমাদেরই মত একজন! আমার বাটীতে কত রকম লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কেহ আসিত উপদেশ লইতে, কেহ আসিত পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে, কেহ বিদ্যাপরীক্ষা-মানসে, আবার কেহ বা শুধু খোসগল্প শুনিবার জন্য। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে যে ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন ও তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির নিকট হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার বা কোন কিছু গোপন রাখিবার সাধ্য ছিল না। তিনি যেন

প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। একটি সম্ভ্রান্ত ধনি-সন্তান পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য প্রায় তাঁহার নিকট আসিত ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ বলিত। স্বামিজী কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, 'এম, এ, টা পাশ করে তারপর আমার কাছে সাধু হবার জন্য এসো। কারণ সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়ে এম, এ, পাশ করাটা ঢের সোজা।' ঐ সময়ে আমার বাসায় একটি চন্দন বৃক্ষের তলায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা জন্মেও ভুলিতে পারিব না।"

এই সময়ে হরিপদবাবুর একটা বদ অভ্যাস ছিল। তিনি প্রত্যহ স্বাস্থ্যের জন্য নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিতেন। স্বামিজী সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন বলিলেন, "যখন দেখবে কোন রোগ এত প্রবল হয়েছে যে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে, আর উঠবার শক্তি নেই, তখনই ঔষধ খাবে, নতুবা নয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ সকল রোগের হাত থেকে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চেয়ে বেশী লোককে মারেন। মনের অবস্থা যদি সম্পূর্ণ বদলে যায় তাহলে কোন পীড়া থাকে না।" তারপর বলিলেন, "আর দিনরাত পীড়ার কথা ভেবেই বা কি হবে? মনে প্রফুল্লতা আন, ধর্ম্মপথে থাক, সদ্বিষয় চিন্তা কর, আমোদ-আহ্লাদ কর, কিন্তু সাবধান! আমোদ করতে গিয়ে যেন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এনে ফেলো না বা এমন কিছু করো না যাতে চিত্তের অনুতাপ জন্মে। আর মৃত্যুর কথা বলছ—তা তোমার আমার মত ২।৪টা লোক মলেই বা কি আসে যায়? ওতে পৃথিবীটা উল্টে যাবে না। এমন মনে করো না যে তোমার আমার অভাবে পৃথিবীটা একেবারে অচল হয়ে যাবে বা মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।" সেই দিন হইতে মিত্রজা অকারণ ঔষধ-সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করেন।

এই সময়ে নানা কারণে হরিপদবাবুর সহিত তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের মনোমালিন্য চলিতেছিল। একটু কড়া কথা বলিলেই তিনি চটিয়া আগুন হইতেন, কিন্তু মুখে তাহাদের কিছু বলিতে পারিতেন না, চাকরির মায়াও ত্যাগ করিতে পারিতেন না; কারণ চাকরিটী ভাল, উপার্জ্জন যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অন্তরের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিয়া তিনি দিবারাত্র সাহেবদিগের নিন্দা করিতেন। স্বামিজী একদিন তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি টাকার জন্য চাকরি করিতে আসিয়াছ এবং যে কাজ কর তাহার জন্য উপযুক্ত বেতনও পাও। তবে কেন দিনরাত এই সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া তোলাপাড়া কর, আর 'কি বন্ধনেই পড়িয়াছি' বলিয়া আক্ষেপ কর? কেহ তোমাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, তুমি ইচ্ছা করিলেই কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পার। তবে কেন দিনরাত মনিবের নিন্দা ও সমালোচনা কর? যদি ভাব যে তোমার আর গতি নাই, তবে তাহাদের দোষ না দিয়া নিজেকে দোষ দাও। তুমি কি মনে কর তুমি কাজ কর বা না কর তাহাতে তাহাদের কিছু আসে যায়? তুমি ছাড়িয়া দিলে এখনই শত শত লোক ঐ পদের প্রার্থী হইবে। তবে কেন মনের তাপ বাড়াও? তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা নীরবে সম্পাদন করিয়া যাও।" এইরূপে স্বামিজী মিত্রজাকে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"আপ্ ভাল ত জগৎ ভাল। আমরা নিজেদের ভিতরে যেমন বাহিরে ঠিক সেই রকম দেখি। আজ থেকে মন্দটি দেখা একেবারে ত্যাগ কর, দেখিবে তোমার উপর অন্যলোকের পূর্ব্বভাবও কেমন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে দেখি।"

ইতঃপূর্ব্বে হরিপদবাবু ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়িবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার মধ্যে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর মুখে গীতার দুই একটী স্থলের ব্যাখ্যা শুনিয়া গীতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি বলেন, "সেই হইতে বুঝিলাম গীতা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় গীতার শিক্ষা কি প্রয়োজনে আসিতে পারে। কিন্তু স্বামিজীর উপদেশে আমি শুধু গীতা নহে, কার্লাইলের রচনাবলী ও জুলস্‌ভার্ণের বৈজ্ঞানিক-রহস্যপূর্ণ উপন্যাসগুলিরও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামিজী ঐ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিতেন। গল্পটি এইরূপ —

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। আর একজন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া তিনি একটি মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন ও রাজ্যরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, "রাজ্যের চতুর্দ্দিকে একটী গভীর খাল কাটিয়া তাহার ধারে বৃহৎ ও উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করা দরকার।" ইহা শুনিয়া সূত্রধর বলিল, "হাঁ, ঠিক বটে, তবে প্রাচীরটা কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেই ভাল হয়।" চর্ম্মকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না, কাষ্ঠ অপেক্ষা চর্ম্ম অধিক মজবুত, সুতরাং প্রাচীরটা চর্ম্মেরই হউক।" কামার ইহা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, "চামড়া আর কত মজবুত হইবে? তার চেয়ে লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করে গুলিগোলা আসতে পারবে না।" উকীল-মোক্তারেরা বলিলেন, "মহারাজ, ও সব কিছুই করিতে হইবে না। শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক যে, এইরূপ

ভাবে বলপূর্ব্বক পরের সম্পত্তি লইবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। এ কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ।”

তখন পুরোহিত মহাশয়েরা বলিলেন, “তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ যে হে! দেবতার সন্তোষ অগ্রে না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। মহারাজ, হোম যাগ করুন, স্বস্ত্যয়ন করুন, তুলসী দিন, দেখিবেন কাহারও সাধ্য নাই—আপনার একটী প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করে।” এইরূপে রাজ্যরক্ষার পরিবর্ত্তে সকলেই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য মহা কোলাহল, তর্ক ও পরিশেষে আত্ম-কলহে ব্যাপৃত হইল। গল্পটী শেষ করিয়া স্বামিজী বলিলেন, “অধিকাংশ লোকই এইরূপ। আমি যা বুঝি আর কেউ তেমন বুঝে না—এই ভাবটা প্রায় সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামিজী কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিবেন না বা নিজের নিকট কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপরের নিকট হইতে যাজ্ঞা করা দূরে থাকুক, সাধিয়া দিলেও লইতেন না। কেবল নিতান্ত ভক্ত বন্ধুদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিতে অনিচ্ছুক হইয়া কখন কখন একখানি কাপড়, একজোড়া খড়ম, একখানি রেলওয়ে টিকিট বা ঐরূপ কোন সামান্য শ্রদ্ধার দান গ্রহণ করিতেন। কোলাপুরের রাণী তাঁহাকে কোন একটি বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণী তাঁহাকে একজোড়া গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন—দরকার ছিল বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিয়া পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করত রাণী-প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করিলেন ও বলিলেন, “সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই

ভাল।" হরিপদবাবুও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া অবশেষে তাঁহার মারাঠি জুতার পরিবর্ত্তে একজোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি তাঁহার সহিত দিয়াছিলেন।

একদিন স্বামিজী হরিপদবাবুকে বলিলেন, "তোমার সহিত অরণ্যে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু চিকাগোতে ধর্ম্মসভা হইবে, যদি তথায় যাইবার সুবিধা হয় ত যাইব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিপদবাবু আনন্দের আবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন নয়, বৎস! এখনও সময় হয় নাই। রামেশ্বর দর্শন শেষ না হইলে অন্য কিছুতেই হাত দিতে পারিতেছি না।"

স্বামিজী রামেশ্বর যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া হরিপদবাবু বাটীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে হরিপদবাবুর গৃহিণী মন্ত্র লইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, কিন্তু হরিপদবাবু বলিয়াছিলেন, "যাকে তাকে গুরু করিও না, এমন লোককে গুরু করিবে যেন তাঁহাকে দেখিয়া আমারও ভক্তি হয়। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।" তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এরূপ মনোমত গুরু না পাওয়াতে তাঁহাদের মনের ইচ্ছা এতাবৎকাল পূর্ণ হয় নাই। স্বামিজীকে দেখিয়া অবধি হরিপদবাবুর মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?" তিনিও সাগ্রহে বলিলেন, "উনি কি গুরু হইবেন? হইলে ত আপনাদের কৃতার্থ মনে করি।"

হরিপদবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি যেমন করিয়া পারি স্বামিজীকে রাজী করাইব। ওঃ কি লোক! এ সুবিধা ছাড়িয়া দিলে আর কি জীবনে এমন লোকের দেখা পাইব?" এই বলিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, আমার একটা প্রার্থনা পূরণ করিবেন?" স্বামিজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে তিনি সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। স্বামিজী প্রথমে রাজী হইলেন না, বলিলেন, "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের সব ভার ঘাড়ে লইতে হয়; বিশেষ আমি সন্ন্যাসী। আমি কোথায় মায়াপাশ কাটাইবার চেষ্টা করিব—না আরও বেশী ফাঁদে পা দিবার কথা বলিতেছ। তা ছাড়া দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুশিষ্যে অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার ইত্যাদি।" কিন্তু হরিপদবাবু স্বামিজীর কথায় ভুলিলেন না। তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "স্বামিজী, যদি আপনি আজ আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ না করেন, তবে আমরা চিরদিনের জন্য জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।"

স্বামিজী তাঁহার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তাঁহাদের উভয়কে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর হরিপদবাবু স্বামিজীর একখানি ফটো তুলিয়া লইবার জন্য বলিলেন। স্বামিজী প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর ও হরিপদবাবুর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া শেষে উহাতে সম্মত হন।

২৭শে অক্টোবর স্বামিজী হরিপদবাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। মিত্রজা একখানি রেলওয়ে টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "স্বামিজী, জীবনে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

দাক্ষিণাত্যে

বেলগাঁ হইতে মরমাগোয়া নামক সমুদ্রতটবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী মহীশূররাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় কয়েক দিবস তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি অবিলম্বে মহীশূর রাজার দেওয়ান স্যার কে, শেষাদ্রি আয়ারের নিকটে পরিচিত হইলেন। অল্পক্ষণ আলাপেই বুদ্ধিমান শেষাদ্রি আয়ারের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই যুবা সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যাহা কালে এ দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। স্বামিজী এই অমাত্যপ্রবরের বাটীতে প্রায় একমাসকাল থাকিয়া মহীশূর রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য, সুশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি যেখানেই যাইতে লাগিলেন, শুধু হিন্দু নহে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরও সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। মিঃ আবদুল রহমন সাহেব নামে মহীশূররাজের একজন মুসলমান সভাসদ্ স্বামিজীর নিকট কোরাণের কয়েক স্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে যে সন্দেহ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইলেন। রহমন সাহেব হিন্দু ফকিরের মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, স্বামিজী বহুদিন পূর্ব্বেই কোরাণের অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভাব নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। শেষাদ্রি আয়ার এই পণ্ডিত সাধুকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত

হইলেন। তিনি বলিতেন, "এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা অনেকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইয়াছে? আমি ত আমাদের মধ্যে এমন কাহাকেও জানি না, যিনি শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ অনুধাবনে এই যুবক সন্ন্যাসীর সমকক্ষ। ইনি এক অত্যাশ্চর্য্য পুরুষ। বোধ হয় ইনি ধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা হইয়াই জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, নতুবা এরূপ অল্প বয়সে বেদ-বেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্রে এরূপ অসাধারণ অধিকার কি করিয়া জন্মিল?"

এই তরুণ আচার্য্যকে দেখিয়া মহীশূর-রাজ প্রীত হইবেন মনে করিয়া স্যার শেষাদ্রি আয়ার স্বামিজীকে মহীশূরে লইয়া গিয়া মহা-রাজের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। গৈরিকবসনধারী স্বামিজী যখন মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার রাজসুলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন—স্বামিজীর বিদ্যা-বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মবিষয়ে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কথাবার্ত্তা ও চালচলন সবই যেন তাঁহার হৃদয় হরণ করিল। তিনি স্বামিজীর বাসের জন্য রাজ-প্রাসাদে কতকগুলি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং প্রায়ই ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বহু গুরুতর বিষয়েও স্বামিজীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ক্রমে মহারাজের সহিত স্বামিজীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। একদিন মহারাজ সপার্ষদ সভাগৃহে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, আমার পার্ষদদিগকে আপনার কেমন লাগিতেছে?" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনি স্বয়ং অতি মহানুভব ব্যক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সদাসর্ব্বদা পার্ষদমণ্ডলী-বেষ্টিত থাকেন। আর মহারাজ, পার্ষদেরা

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপ।" রাজা এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সভার অন্যান্য লোকেরা প্রথমে একটু কৌতুক বোধ করিয়া পরক্ষণেই স্বামিজীর উপর বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, উত্তম সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ স্পষ্টবক্তা হইয়া থাকেন, কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলেন না। মহারাজ স্বামিজীকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তিনিও ঐরূপ চমৎকার উত্তর দিতে লাগিলেন, এমন কি দেওয়ানজীর প্রতিও ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে বিরত হইলেন না। মহারাজ অবশেষে নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। দরবার শেষ হইলে তিনি স্বামিজীকে এক নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন ও সর্ব্বশেষে বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি যেরূপ স্পষ্টবাদী তাহাতে আমার ভয় হয় পাছে আপনার জীবনে কোন আশঙ্কা ঘটে। হয়ত কেহ বিষপ্রয়োগে আপনাকে হত্যা করিতে পারে—অন্যান্য অনেক সাধুর জীবন এইরূপে নষ্ট হইয়াছে।" স্বামিজী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি! আপনি কি ভাবেন, প্রকৃত সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে সত্য বলিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয়? মনে করুন আপনারই পুত্র যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কিরূপ লোক, আমি কি বলিব আপনি সর্ব্বগুণাধার, আপনার মধ্যে যে যে গুণ নাই, ভয়ে বলিব, সে গুণ আছে? মিথ্যা বলিব? মহারাজ! তোষামোদ চাটুকারদিগের ব্যবসায়, সন্ন্যাসীর ব্যবসায় সত্যকথন।" মহারাজের সম্মুখে ঐরূপ বলিলেও তিনি কতবার মহারাজের অসাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই ছিল এইরূপ—যাহার যে দোষ বা দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহার সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিতেন; কিন্তু অপরের নিকট তাহার বিষয়ে উল্লেখকালে কখনও তাহার গুণ ভিন্ন দোষ কীর্ত্তন করিতেন না।

মহীশূর রাজসভায় স্বামিজীর সহিত একজন বিখ্যাত অষ্ট্রীয়া-দেশবাসী সঙ্গীতজ্ঞের ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হয়। সেই ব্যক্তি ও সভাস্থ অন্যান্য সকলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সঙ্গীতে তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর এক দিন রাজপ্রাসাদে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একজন প্রসিদ্ধ তড়িৎশিল্পীর (electrician) সহিত তড়িৎ বিষয়ে স্বামিজীর অনেক কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি তড়িৎ বিষয়ে নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও স্বামিজীর নিকট থাই পায় নাই।

একদিন রাজবাটীর বৃহৎ দালানে প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে বেদান্ত বিষয়ে একটি বৃহৎ পণ্ডিতসভা আহূত হইল। পণ্ডিতেরা অনেকে অনেক কথা বলিলেন, অনেক যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিভিন্ন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোটের উপর কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হইল না। অবশেষে স্বামিজী কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য আহূত হইলেন। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে পাঁজি-পুঁথি ছাড়িয়া তাঁহার নিজের প্রাণের ভাষায় বেদান্তশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিলেন ও অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত মিলাইয়া ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসার দেখিয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া রহিলেন। সকলেই বুঝিল, দর্শন তাঁহার নিকট কতকগুলি বাক্য ও ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে—প্রকৃত প্রাণের বস্তু। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে নতমুখে সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রধান অমাত্য স্বামিজীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন

তাঁহাকে কোন উপহার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার একজন সেক্রেটারীকে স্বামিজীর সহিত বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দোকানে গিয়া তাঁহার যে জিনিষ অভিরুচি হয়, তাহা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। স্বামিজী অমাত্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া লোকটীর সহিত বাজারে গেলেন। সেক্রেটারী মনে করিলেন, যখন দেওয়ানজীর আদেশ ও স্বামিজীর উপহার তখন কি জানি কত টাকা ব্যয় হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার চেক বইখানি সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন যে, আবশ্যক হইলে এক সহস্র মুদ্রাও খরচ করিবেন। দোকানে গিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় এ দ্রব্য ও দ্রব্য করিয়া বহু দ্রব্য দেখিলেন ও প্রশংসা করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, "বন্ধু, যদি আমি আমার অভিলষিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলেই দেওয়ানজী সন্তুষ্ট হন, তবে এক কাজ করুন, এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চুরুট আনিয়া আমায় দিন।" সে ব্যক্তি ত তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্। তিনি যাহা যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহার একটাও ত খাটিল না। তিনি জীবনে প্রথম দেখিলেন যে এত বড় একটা সুযোগ হাতে পাইয়াও লোকে তাহা ত্যাগ করিতে পারে। দোকান হইতে বাহির হইয়া স্বামিজী তাঁহার এক টাকা মূল্যের চুরুটটী ধরাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ও অনতিবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজী প্রথমে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তারপর হাসিয়া উঠিলেন। বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত সন্ন্যাসীরা এইরূপই হইয়া থাকেন।

একদিন মহারাজ স্বামিজী ও প্রধান অমাত্যকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন, "স্বামিজী, আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইতে পারে?" স্বামিজী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া জ্বলন্তভাষায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার প্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘণ্টাধিক কাল বক্তৃতা করিলেন। দেখাইলেন, ভারতের বলিতে আছে শুধু তাহার দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা; কিন্তু ভারতের নাই, ভারতের অভাব—বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও ভিতর হইতে আমূল সংস্কার। মহারাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী আরও বলিলেন—তাঁহার মনে হয় ভারতের যাহা কিছু আছে, তাহা পাশ্চাত্য জগৎকে দান করাই হইবে ভারতের কার্য্য এবং তিনি স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট বেদান্তধর্ম্ম-প্রচারের জন্য গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আমি চাই যে তাহারা আমাদিগকে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া আমাদের আর্থিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবে।" হৃদয়ের আবেগে তিনি ক্রমশঃ অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। মহারাজ তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে গমনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কি জন্য জানি না—বোধ হয় রামেশ্বর-দর্শন অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া স্বামিজী মহারাজের নিকট এই অর্থসাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। সেইদিন হইতে রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর ধারণা হইল—"এই মহাপুরুষ ভারতের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মহারাজ স্বামিজীর গুণে উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তারপর যেদিন স্বামিজী বিদায় গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, সেদিন মহারাজের আন্তরিক বেদনা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তিনি স্বামিজীকে আরও কিছুকাল তাঁহার নিকট

বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, "স্বামিজী, আমি আমার নিকট আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাই। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড তুলিয়া লই। আপনার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় ফনোগ্রাফে ২।৪ কথা বলুন, যেন চিরদিন আপনার কথা আমাদের কানে বাজিতে থাকে।" স্বামিজী সম্মত হইলে রেকর্ড তোলা হইল। আজও পর্য্যন্ত মহীশূরের রাজপ্রাসাদে সে রেকর্ড সযত্নে রক্ষিত আছে, তবে বহুদিন হইতে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মহীশূররাজ স্বামিজীর গুণগ্রামের এতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার পাদপূজার পর্য্যন্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী উহাতে সম্মত হন নাই।

কিয়দ্দিন পরে স্বামিজী বলিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিতেছেন না। একথা শুনিয়া মহারাজ স্বামিজীর সহিত বিবিধ মূল্যবান উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, স্বামিজী ঐ সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি সামান্য সন্ন্যাসী। বহুমূল্য উপহার লইয়া কোথায় রাখিব, কি করিব?" কিন্তু মহারাজ কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে স্বামিজী বলিলেন, "রাজন্, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থ স্পর্শ বা কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।" মহারাজ তথাপি পুনঃ পুনঃ উপহারগ্রহণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা স্বামিজী তাঁহাকে নিরাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যদি নিতান্তই না ছাড়েন, তবে আমাকে ধাতু-সম্পর্কবিহীন একটা হুঁকা দিন, ওটা আমার বেশ কাজে লাগিতে পারে।" মহারাজ তখন তাঁহাকে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত একটী সুন্দর রোজউড্-নির্ম্মিত হুঁকা দান করিলেন। মহীশূর হইতে প্রস্থানকালে মহারাজ স্বয়ং স্বামিজীর চরণযুগল

ধারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রধান অমাত্য তাঁহার সঙ্গে একতাড়া নোট দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামিজী উহা লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমায় কিছু দিতে ইচ্ছা কর, তবে কোচিনের একখানি টিকিট কিনিয়া দাও। আমি রামেশ্বর চলিয়াছি; ২।৪ দিন কোচিনে থাকিতেও পারি।" অমাত্য-বর অগত্যা তাঁহাকে কোচিন পর্য্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন ও কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করিয়ার নিকট তাঁহার একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন।

কোচিনে তিনি অল্প কয়েকদিন কাটাইয়া কেরলের (মালাবার) অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এখানকার চিত্রবৎ মনোরম-শোভা-সন্দর্শনে তিনি অতিশয় পুলকিত হইলেন ও রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষক অধ্যাপক সুন্দর-রমণ আয়ারের * বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ রঙ্গচারীয়ার মহারাজের কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের এস, কে, নায়ার লিখিতেছেন—"রঙ্গচারীয়ার ও সুন্দররমণ উভয়েরই সংস্কৃত ও ইংরেজীতে অগাধ পাণ্ডিত্য; ইঁহারা স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীত ও

---

* ইনি এ সময়ে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান রাজকুমার মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার তাঁহার সাহায্যে বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

উপকৃত হইলেন। বাস্তবিক স্বামিজীর সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। একস্থানে একসঙ্গে বহু ব্যক্তির বহু প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার তাঁহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্পেন্সার হউক, কালিদাস, সেক্ষপীয়র হউক, ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ হউক, ইহুদীদিগের ইতিহাস হউক, আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা হউক, অথবা বেদ-বেদান্ত, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র হউক—কোন বিষয়ে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না। যে কোন প্রশ্ন হউক তাহার ঠিক উত্তরটি তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। তাঁহার মুখাবয়বে সরলতা ও মহত্ত্ব স্পষ্ট লেখা ছিল এবং নির্ম্মল হৃদয়, তপস্যাপূত জীবন, উদার বুদ্ধি, উন্মুক্ত চিত্ত, অসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে সহানুভূতি এইগুলি তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল।”

এখানেও তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে বহুবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও পতিত জাতিদিগের উদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দররমণের পুত্র লিখিয়াছেন—তিনি রাজেন্দ্রগমনে আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যদি তাঁহার অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে রাজাই মনে করিতাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাব সবই বিস্ময়জনক। ভারতের সমুদয় ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি সমগ্র ভারতকে এক অখণ্ড প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত পদার্থরূপে দেখিতেন। বাস্তবিক তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমের যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে-ই অনুভব করিয়াছে যে ভারতের কল্যাণের জন্য এক মহান্ আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।”

আমরা এখানে সুন্দররমণের স্বরচিত বৃত্তান্তটী ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"১৮৯২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ত্রিবান্দ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া এইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত একজন মুসলমান অনুচর ছিল। তাঁহারও বেশভূষা এইরূপ যে দেখিয়া মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। আমার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া সেই ভাবে আমাকে খবর দিল। আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির পর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলাম। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই আমাকে মুসলমান চাকরটীর আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি কোচিনরাজ্যের একজন পিয়ন, তত্রত্য দেওয়ান মহোদয়ের সেক্রেটারী ভিজাগাপট্টম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলিউ, রামাইয়া বি, এ, কর্ত্তৃক স্বামিজীকে এখানে পৌছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামিজী নিজের জন্য কোনপ্রকার পরিচয়পত্র গ্রহণ বা সুবিধামত বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে এখানে কোনরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। শুনিলাম, দুই দিন হইতে তিনি দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অগ্রে মুসলমান অনুচরটীর আহারের ব্যবস্থা না হইলে স্বয়ং আহার করিতে সম্মত হইলেন না।

"২।৪ মিনিট কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, স্বামিজী একজন বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধারণতঃ তিনি কিরূপ খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত। তিনি উত্তর করিলেন, 'যাহা আপনার অভিরুচি; আমরা সন্ন্যাসী, যাহা পাই তাহাই খাই।' তিনি বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া আমি বলিলাম, 'বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক মহৎ ব্যক্তির জন্ম

হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' ইহার উত্তরে আমি প্রথম তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ও তদীয় আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শ্রবণ করিলাম। তিনি কেশববাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় বালক বলিয়া উল্লেখ করাতে আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তাহার পর শুনিলাম শুধু কেশববাবু নহেন, কিছুদিন পূর্ব্বেকার অনেক খ্যাতনামা বাঙ্গালীই এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কেশববাবু স্বয়ং শেষ জীবনে তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমতের বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এমন কি অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের পরিচালক মিঃ সি, এইচ, টনি মহোদয় পরমহংসদেবের চরিত্র, প্রতিভা, উদারভাব এবং দৈবীশক্তির উল্লেখ করিয়া একটী সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

"ইতোমধ্যে স্বামিজীর আহার্য্য প্রস্তুত হইল, তিনি প্রায় দুই দিন পর পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। তাঁহার আকৃতি, কণ্ঠস্বর, চক্ষের দিব্যজ্যোতিঃ, উচ্চভাব এবং অদ্ভুত বচনবিন্যাস আমাকে এতদূর মুগ্ধ করিল যে, আমি সেদিন আর রাজপুত্র মার্ত্তণ্ড বর্ম্মাকে পড়াইতে গেলাম না। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমি স্বামিজীকে লইয়া সন্ধ্যার সময় ত্রিবান্দ্রম কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রঙ্গাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া আমরা ত্রিবান্দ্রম ক্লাবে গেলাম। কিঞ্চিৎ পরে রঙ্গাচার্য্য উপস্থিত হইলে, আমি স্বামিজীকে তাঁহার সহিত, অধ্যাপক সুন্দররাম পিলে এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র ও

শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। এই সময়কার একটী ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে। নারায়ণ মেনন নামে আমার এক বন্ধু (ইনি বর্ত্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একজন দেওয়ান-পেশকার) ক্লাব হইতে বিদায়-গ্রহণ-কালে একজন ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকারকে প্রণাম করিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি শূদ্রকে প্রত্যভিবাদন করিবার প্রচলিত রীত্যানুসারে দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্ত কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। স্বামিজীর দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে; তিনি এই ঘটনাটী লক্ষ্য করিলেন। তারপর কত লোক আসিল—চলিয়া গেল। সর্ব্বশেষ আমরা পাঁচজন মাত্র রহিলাম—স্বামিজী, উক্ত দেওয়ান-পেশকার, তাঁহার ভ্রাতা, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য ও আমি। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আমরাও স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য উঠিলাম। দেওয়ান-পেশকার স্বামিজীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু স্বামিজী প্রতিপ্রণাম না করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের নিয়মমত শুধু নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে পেশকার মহাশয়ের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু স্বামিজী এদিকে অতি শান্তস্বভাব এবং শিষ্ট ও মধুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেও বিশেষ প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকে কিরূপ উত্তর দিয়া নীরব করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। দেওয়ান-পেশকারের উত্তরে বলিলেন, 'আপনি যদি নারায়ণ মেননকে প্রত্যভিবাদন করিবার সময়ে আপনাদিগের প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন তবে আমি সন্ন্যাসীর রীতি অনুযায়ী প্রত্যভিবাদন করাতে আপনার ক্রোধের উদয় হওয়া কি সঙ্গত?' এই উত্তরে আশানুরূপ ফল ফলিল। পরদিন পেশকার মহাশয়ের ভ্রাতা আমাদিগের নিকট আগমন করিয়া পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার জন্য স্বামিজীর নিকট ক্রটী স্বীকার করিলেন।

"ঐ দিন সন্ধ্যায় ক্লাবে অল্পক্ষণ থাকিলেও স্বামিজীকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি সকলেরই সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে তাঁহার সহিত আলাপের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিলেন। বাস্তবিক অগাধ পাণ্ডিত্য, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, ভাষায় অদ্ভুত অধিকার, প্রয়োজনমত বিপুল বিদ্যাবুদ্ধিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া কোন বিষয় হইতে নূতন শিক্ষা লাভ করা বা কাহারও যুক্তির ভ্রম-প্রমাদ প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা এবং প্রকৃতি ও মনুষ্যকৃত শিল্পের মধ্যে যাহা কিছু উত্তম ও সুন্দর তাহার প্রতি অনুরক্তি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত উক্ত অধ্যাপকের সৌসাদৃশ্য ছিল।

"পরদিন স্বামিজী রাজকুমার মার্ত্তণ্ড বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি আমার শিক্ষাধীনে থাকিয়া এম, এ, পড়িতেছিলেন। এক্ষণে আমার নিকট হইতে এই নবাগত অতিথির অসাধারণ জ্ঞান ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ও আমার সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। স্বামিজী ভ্রমণকালে অনেক দেশীয় রাজন্য-বর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন শুনিয়া রাজকুমারের মনে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী বলিলেন, তাঁহার সহিত যে সকল দেশীয় রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে বরোদার গাইকোয়ারের কার্য্যদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি ও রাজকার্য্য-পরিচালনে বিচক্ষণতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রসঙ্গে তিনি খেতড়ির ক্ষুদ্র রাজপুত রাজার গুণগ্রামেরও বহু প্রশংসা করিলেন এবং শেষে বলিলেন যে, তিনি যতই দক্ষিণের দিকে অগ্রসর

হইয়াছেন ততই রাজাদিগের চরিত্র ও শক্তির অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিজী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিবাঙ্কুররাজকে দেখিয়াছেন কি না? স্বামিজী বলিলেন, 'না।'* তারপর মহীশূর মহারাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথার পর স্বামিজী রাজকুমারের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ২।৪টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য লোকের ন্যায় রাজকুমারও স্বামিজীর আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিবার সখ ছিল। সুতরাং স্বামিজীর একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ লইলেন। পরে উহা মান্দ্রাজ মিউজিয়মেব চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়।

"তিনি সর্ব্বশুদ্ধ নয় দিবস আমার বাটীতে ছিলেন। এই কয়দিনই তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সকল কথা আমার এখন স্মরণ নাই, তবে মৎস্য-মাংসাদি-ভক্ষণ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইলেও মোটের উপর ঐ নয় দিবসের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জাগরূক আছে ও আজীবন থাকিবে। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধার উল্লেখ করিয়া তিনি একদিন বলিলেন যে ধর্ম্মের যেমন গোঁডামি আছে বিজ্ঞানেরও তেমনি গোঁড়ামি দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই অনুমানসূচক এবং সমজাতীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সুসামঞ্জস্য-বিধানে অসমর্থ। অথচ অনেক বৈজ্ঞানিকই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা জগতের সমুদয় রহস্যই ভেদ

* ইহার দুই দিন পরে রাজ-দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার মহোদয়ের সাহায্যে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের সহিত অল্পক্ষণের জন্য স্বামিজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া দেওয়ানজীকে তাঁহার থাকিবার ও রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

করিয়াছেন। অনেকে আবার অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে শুধু তাঁহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। বুঝা যায় যে, ভারতে চিত্তসমাধানের যে সকল বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব তাহার কোন সংবাদই রাখে না এবং সেই জন্য অন্তঃপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসা করিতেও সমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সেখানে অপূর্ব্ব আলোক প্রদান করিয়াছে—দেখাইয়াছে, ঐ সকল উচ্চ অনুভূতি ও অবস্থাকে কি করিয়া চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। আর একটী বিষয় সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছিলেন—উহা লৌকিক ও অলৌকিক জগতের বিশেষত্ব। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বন্ধনের মধ্যে বাস করে। এই উভয়কে অতিক্রম না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ বা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। জাতিভেদের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ যতদিন নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করিবেন ও মুক্তহস্তে জ্ঞান বিতরণ করিবেন ততদিন তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার কথাগুলি আজও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন।' স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ ও সমাজে তাঁহাদিগের স্থান লইয়া কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিয়ম প্রচলন করিবার চেষ্টা তিনি আদৌ অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দ্বারা তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে পারিলে আপনারাই বুঝিতে পারিবে সমাজের কোন্‌খানে তাহাদের স্থান

নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, কি কি কার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত এবং কোন্‌টী রক্ষা বা বর্জ্জন করা আবশ্যক।' আমি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেদান্ত-প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সামাজিক অবস্থা আরও উন্নত করা দরকার। যাঁহারা প্রাচীন আচার-বিচারের সম্মান করিতে চাহেন তাঁহারা উহা করুন, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল হিন্দু কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত আচারাদি নিয়ম-পালনে অক্ষম হইবেন তাঁহাদিগকে ঘৃণা প্রদর্শন করিবারও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।'

"স্বামিজী আমার আলয়ে উপস্থিত হইবার দুই তিন দিন পরে আমি ত্রিবান্দ্রমে আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রেরণ করিলাম। ইনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রগাঢ় জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, পবিত্র জীবন এবং অকপট ঈশ্বর-প্রীতির জন্য আমি ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতাম এবং এখনও করিয়া থাকি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাম রাও। ইনি ত্রিবাঙ্কুরের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিভাগের পরিচালক। স্বামিজীর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও তীব্র ঈশ্বরানুরাগ দর্শনে রাম রাও সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একদিন নিজ আবাসে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভিক্ষান্তে উভয়ে একত্রে আমার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামিজী পূর্ব্ববৎ আমাদের সহিত বিবিধ শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার আজও পর্য্যন্ত পরিষ্কার স্মরণ আছে যে, রাম রাও তাঁহাকে একবার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সম্বন্ধে দুইচারি কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী একটী অতি সুন্দর গল্পের

অবতারণা করিলেন। গল্পটি অনেকাংশে 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম্'-রচয়িতা বিখ্যাত কবি লীলাশুকের উপাখ্যানের অনুরূপ। গ্রন্থের নায়ক শেষ অবস্থায় বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তখনকার এক শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়ে পড়িয়া নির্য্যাতন ভোগ করিলে ক্ষোভে অনুতাপে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণধ্যানে মগ্ন হইয়াছিল। এই ঘটনাটি স্বামিজী এমনই চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে আজ একুশ বৎসর পরেও আমি যেন তাঁহার কথাগুলি অবিকল সেইভাবে শুনিতে পাইতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। কুম্ভকোণমের ভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত শক্তিশালী সঙ্গীতজ্ঞ শরৎ শাস্ত্রীয়ারের অমর বংশীধ্বনির ন্যায় তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি এখনও যেন আমার কর্ণে লাগিয়া আছে।

"ঐ দিন বা তৎপর দিবস তিনি আমায় মান্দ্রাজের তদানীন্তন সহকারী একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসা অনুসন্ধান করিবার জন্য বলিলেন। মন্মথবাবু ঐ সময়ে ত্রিবান্দ্রমের রেসিডেন্টের কোষাগারে এক তহবিল-তছরূপ তদন্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্ধান পাওয়ার পর হইতে স্বামিজী প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া একেবারে আহারাদি শেষ করিয়া আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একদিন আমি ঐ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, 'দেখুন, আমাদের বাঙ্গালী জাতটা এক জায়গায় দল বাঁধিয়া থাকিতে বড় পছন্দ করে। তাহা ছাড়া মন্মথের উপর আমার দুইটি দাবী আছে। প্রথমতঃ সে আমাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র; দ্বিতীয়তঃ সে আমার সহাধ্যায়ী। তাহার উপর আর একটা কথা এই যে, আপনাদের এই দক্ষিণ দেশে আসা অবধি

আমি বরাবর এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; সুতরাং বহুদিন মাছ-মাংসের সম্পর্কে আসি নাই, সে জন্যও মন্মথের ওখানে খাওয়াটা আমার একটু ভাল লাগিতেছে।' আমি মৎস্য-ভক্ষণের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলাম। তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন, 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মাংস ভক্ষণ করিতেন, এমন কি যজ্ঞাদির সময়ে বা অতিথিকে মধুপর্ক দিতে হইলে তখন গোবধ করা হইত।' তিনি আরও বলিলেন, 'বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মাংসভোজন প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে হিন্দুশাস্ত্রে আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেটা কতদূর পালিত হইত তাহা বিচার্য্য বিষয়। আর এটাও ঠিক যে, আমিষ-ভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তিসামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে গেলে প্রাচীন হিন্দুজাতি ও সম্মিলিত হিন্দু-রাজ্য সমূহের স্বাধীনতা লোপের এক প্রধান কারণ এই মাংস-ভক্ষণ প্রথার উচ্ছেদসাধন।' আমি তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, তাঁহার মতে যদি হিন্দুজাতিটাকে জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাদের আবার মাংসাশী হইতে হইবে। আমি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না। বরং 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ও সাধারণ যুক্তির সাহায্যে তাঁহার সহিত অনেক তর্ক করিলাম। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতটা জানিতাম বলিয়া পরে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে মাংসাদি ভোজনের কথা শুনিয়া আমি তেমন আশ্চর্য্য বোধ করি নাই, এবং বেশ বুঝিতে পারি ঐ বিষয় লইয়া তখন তাঁহার বিরুদ্ধে

যে একটা নিন্দা ও আন্দোলন হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপ নীরব অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

"একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামিজী দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। সেদিনও পুনরায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দেওয়ান সাহেব আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, 'প্রাচীনকালে যজ্ঞ বা অন্য কোন সময়েই প্রাণিবধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না।' ইহাতে কিয়ৎ-ক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলিল; শেষে দেওয়ানজীর জামাতা মিঃ এ, রামিয়ার স্বামিজীর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'যজ্ঞে পশুবধ ও মাংস-ভোজনের বৃত্তান্ত সত্য বটে, শাস্ত্রে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।' ঐ দিন 'ভক্তি' সম্বন্ধেও দেওয়ানজীর সহিত স্বামিজীর কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কেমন করিয়া কথাটা উঠিল ও এ সম্বন্ধে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে আমার কিছুই স্মরণ নাই। দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার সে সময়কার একজন অতিশয় বিদ্বান পুরুষ ছিলেন এবং এত অধিক বয়সেও (তখন তাঁহার বয়স ৫৮) খুব পড়াশুনা করিতেন ও নানাবিধ পুস্তকপাঠে প্রত্যহ আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু সেদিন স্বামিজীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা তেমন জমে নাই, আর বেশীক্ষণ আলাপ করিবার মত অবকাশও তাঁহার ছিল না, সুতরাং আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায়কালে দেওয়ানজী স্বামিজীকে বলিলেন, রাজ্যমধ্যে ভ্রমণকালে তাঁহার যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীকে জানাইবা-মাত্র সিদ্ধ হইবে ইত্যাদি। কিন্তু স্বামিজীর কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় নাই বা তিনি কিছু প্রার্থনাও করেন নাই।

"ইতোমধ্যে একদিন হুজুর আফিসের পেস্কার শ্রীযুক্ত পেরুমল পীলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য

ছিল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে সকল বিবিধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে ঐ সম্বন্ধে স্বামিজীর জ্ঞান কতটা তাহাই নির্ণয় করা। সুতরাং তিনি আসিয়াই অদ্বৈত বেদান্তের উপর গোটাকতক খোঁচা বসাইলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজীর ন্যায় গুরু ও আচার্য্যশ্রেণীর লোকদিগের জ্ঞানের গভীরতার পরিমাণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা অপেক্ষা তিলার্দ্ধকাল নষ্ট না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে যতটা উচ্চভাব আদায় করিয়া লইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা অধিক বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই উপলক্ষে আমি স্বামিজীর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিলাম। ১৮৯৭ সালে মান্দ্রাজের ফার্ণান ক্যাস্‌লে তাঁহার নয় দিবস অবস্থানকালে আর একবার এটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এই—কোন আত্মাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিবামাত্র তিনি এক নিমিষে তাহার দৌড় বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বুদ্ধি ও বিচারানুরূপ উপদেশ দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা এত অধিক এবং কৌশল এরূপ চমৎকার ছিল যে, সে ব্যক্তি বুঝিতেও পারিত না তিনি কখন তাহাকে তাহার উপযুক্ত সমভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। এদিনও পেস্কারের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী 'ললিত বিস্তর' হইতে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক সুললিতকণ্ঠে এমন মধুরভাবে আবৃত্তি করিলেন যে, আগন্তুক ভদ্রলোকটির হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল এবং তিনি প্রশ্ন-কর্ত্তার আসন ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই শ্রবণোৎসুক শ্রোতার পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। স্বামিজী সেই সুযোগে তাঁহার চিত্তে বুদ্ধের বৈরাগ্য, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের একটি স্থায়ী চিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন। প্রসঙ্গটি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিল, উহা শ্রবণ করিয়া

প্রশ্নকর্তার পূর্ব্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। তিনি তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করিলেন এবং প্রস্থানকালে বলিয়া গেলেন, 'স্বামিজীর ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, এবং আজিকার এই কথাবার্ত্তা এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।'

"ইহার পর আরও কয়েকদিন ধরিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা হইল এবং আমি তত্তৎ বিষয়ে স্বামিজীর অভিমত জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন সব কথা মনে নাই, তবে দুটী বিষয় মোটামুটি বেশ স্মরণ আছে। একবার আমি তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং উহাতে তিনি হাস্যাস্পদ ও অকৃতকার্য্য হইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাই যদি হয় তবে আপনি চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় মহীশূরাধিপের অনুরোধ রক্ষার্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে কেমন করিয়া সাহস করিতেছেন?' স্বামিজী ইহার যে উত্তরটী দিয়াছিলেন তাহা তখন আমার মনঃপূত হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম বুঝি কথাটা কাটাইয়া দিবার জন্য যাহোক একটা জবাব দিলেন, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় যে আমি তাঁহার কার্য্যসাধনের উপায় হইব এবং আমার মুখ দিয়াই তাঁহার বাণী জগতে ঘোষিত হইবে তাহা হইলে তিনি আমায় তদুপযোগী শক্তি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।' আমি বলিলাম, 'আমি ঈশ্বরের ওরূপ কিছু করা সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না।' ঐরূপ বলিবার কারণও ছিল। আমি তৎকালে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বগুলিতে যথেষ্ট বিশ্বাসবান হইলেও মূল শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ তখনও পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতিপাদিত বিষয়গুলিতে এতাদৃশ অন্তর্দৃষ্টি-লাভ বা সে সম্বন্ধে এরূপ

প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় নাই যে, তদ্দ্বারা স্বামিজীর বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হই। আমার কথা শুনিয়া স্বামিজী তৎক্ষণাৎ যেন প্রচণ্ড গদাহস্তে আমার উপর পড়িলেন। আমি বিশ্বের গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনে বিধাতার ক্ষমতার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমার এ কি বুদ্ধি! যাঁহার শক্তির আদি অন্ত নাই, তুমি তাঁহাকে সীমার মধ্যে আনিতে চাও? তুমি বহিরাচার ও বাক্যে গোঁড়ামি দেখাইলে কি হইবে? অন্তরে যে এখনও নাস্তিক রহিয়াছ, নতুবা এখনও তাঁহার শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই কেন?'

"আর একবার ভারতবাসীদের জাতি ও বর্ণতত্ত্ব লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হয়। তিনি বলিলেন, 'কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে উহাতে দ্রাবিড়-রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে'; আমি বলিলাম, 'তাহার অর্থ কি? মনুষ্যের বর্ণের তারতম্য জলবায়ু, আহার, কর্ম্ম ইত্যাদি নানা বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে।' স্বামিজী ইহার উত্তরে অনেক প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন অন্যান্য মনুষ্যজাতির ন্যায় ব্রাহ্মণও একটি মিশ্রিত জাতি। তাহাদের শোণিতগত বিশুদ্ধতার কথা নিতান্ত কাল্পনিক। আমি সি, এল, ব্রেস ও আরও অনেক হোমরা-চোমরা লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজ বাক্যের পোষকতা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না।

"এইবার আমার বক্তব্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিব, তবে এইখানে একটা কথা বলা বিশেষ দরকার। তিনি যে কয়দিন আমাদের নিকট ছিলেন, সে কয়দিন প্রত্যেকের হৃদয় তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকট নিরবচ্ছিন্ন মধুরতা, কোমলতা ও সৌন্দর্য্যের আকর ছিলেন। আমার পুত্রেরা প্রায় সদাসর্ব্বদাই তাঁহার সংসর্গে থাকিত; তাহাদের একজন এখনও কথায় কথায় তাঁহার নাম উচ্চারণ

করিয়া থাকে এবং তাঁহার আগমন ও অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় অতি সুন্দর মনে করিয়া রাখিয়াছে। স্বামিজী গুটিকতক তামিল শব্দ শিখিয়াছিলেন এবং আমাদের বাটীর পাচক ব্রাহ্মণের সহিত তামিল ভাষায় কথোপকথন করিতে বড় আমোদ পাইতেন। আমাদের মনে হইত না যে, একজন বাহিরের লোক আমাদের পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল।

"তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর আমাদের ত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পণ্ডিত বঞ্চিশ্বর শাস্ত্রী নামে সংস্কৃত-ব্যাকরণরূপ দুরূহ শাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ এক ভদ্রলোক ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান রাজকুমারের বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং বিদ্যা, বিনয় ও ধর্ম্মশীলতার জন্য সকলের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজকুমার আমার অনুরোধে তাঁহাকে আমার পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বামিজী যতদিন আমাদের গৃহে রহিলেন তাহার মধ্যে তিনি একবারও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই। শুনিয়াছিলেন বটে যে উত্তর ভারত হইতে একজন মহা-পণ্ডিত সাধু আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দেখা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্বামিজী ও মন্মথবাবু যখন গাড়ীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন ঠিক সেই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে যত অল্প সময়ের জন্যই হউক একবার যেন স্বামিজীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য-দর্শনে আমি স্বামিজীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতজীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। মোটের উপর ৭।৮ মিনিট কথাবার্ত্তা হইল। আমি সে সময় সংস্কৃত

জানিতাম না, সুতরাং কি কথাবার্তা হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পণ্ডিতজী বলিলেন, 'ব্যাকরণ শাস্ত্রেরই একটা মহা জটিল ও তর্কযোগ্য বিষয়ে প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল এবং ঐ অল্প সময়ের আলাপেই স্বামিজী সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।'

"এই ভাবে নয় দিনের অবসান হইল। এই নয় দিনের ঘটনাবলি আমার স্মৃতি-পথে 'নয় দিনের আশ্চর্য্য'রূপে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে; এ জীবনে আর সে স্মৃতি মুছিবার নয়। স্বামিজীর মহৎ চরিত্র ও অমানুষিক জীবন ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই পবিত্র ভূমিতে যে সকল অমরকীর্ত্তি আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ দিব্য জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সহিত একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতীত দিনের এই সকল ব্যক্তিগত স্মৃতি যদিও নিতান্ত সামান্য ও সেই মহনীয় আচার্য্যের চরিত্রমহিমার সম্যক তাৎপর্য্য-প্রদানে অতীব অকিঞ্চিৎকর, তথাপি যিনি তাঁহার সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরসমাজের হৃদয়কে এমন বাঁধনে বাঁধিয়াছিলেন ও এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করাও অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে।"

স্বামিজী এখান হইতে রামেশ্বর অভিমুখে গমন করিলেন। পথে মাদুরায় রামনাদরাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুশিক্ষিত ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অন্যতম, ভক্তশ্রেষ্ঠ রামনাদপতি স্বামিজীর একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিলেন ও পরিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। মহীশূর-রাজের ন্যায় ইহার নিকটও স্বামিজী সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও কৃষিবিষয়ক উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা

করেন এবং ভারতের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান ও তাহার ভবিষ্যৎ মহৎ সম্ভাবনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। রামনাদ-রাজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন যে, এতদিনে সত্যই ভারতে একজন প্রকৃত কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামিজী সেই কর্ম্মবীর—দেশজননীর সেই সুসন্তান। স্বামিজীর কথাবার্ত্তার উপর তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা জন্মিল যে, তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিকাগো মহাসভায় যাইবার জন্য বলিলেন ও সে জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে হইল, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আলোকের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এরূপ সুযোগ আর সহসা হইবে না। কিন্তু স্বামিজী তখন রামেশ্বর-দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র, সুতরাং এ সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করেন পরে তাহা মহারাজের কর্ণগোচর করিবেন বলিয়া শীঘ্র ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্বামিজী রামেশ্বর দর্শন করিলেন। তাঁহার বহুকালের মনোবাসনা এতদিনে পূর্ণ হইল। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড—দৈর্ঘ্যে চারি শত হস্ত, প্রস্থে এক শত হস্তের উপর এবং সিংহদ্বারটি প্রায় এক শত ফুট উচ্চ। মন্দিরের প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া যে বারাণ্ডাগুলি আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য মোটের উপর চারি সহস্র ফুট হইবে। দরজার উপর ও ছাদে কোন কোন প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ ফুট হইবে।

রামেশ্বর-দর্শন শেষ হইলে স্বামিজীর মনে কন্যাকুমারী-দর্শনের অভিলাষ হইল। কন্যাকুমারী ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে। এখানে এক দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। স্বামিজী ভিক্ষা করিতে করিতে কুমারিকা অন্তরীপের মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবীদর্শন সমাপ্ত হইলে মন্দির-চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা বহুক্ষণ চলিয়াছিল। তৎ-সম্বন্ধে তিনি পরে

চিকাগো হইতে মঠের ভ্রাতাগণকে লিখিয়াছিলেন—"কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে—ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর বসে ভাবতে লাগলাম—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন (metaphysics) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না? এই যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দুপা দিয়ে দলিয়েছি" ইত্যাদি।

এই ভাবে দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া গেল—তথাপি চিন্তার বিরাম নাই।*

---

* শুনা যায়, কুমারিকা অন্তরীপে স্বামিজী মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুমারী কন্যাকে কুমারীপূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ এই স্থানে মন্মথবাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন।

প্রব্রজ্যাকালের অন্যান্য কাহিনী

এ পর্য্যন্ত স্বামিজীর প্রব্রজ্যাকালের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি পাঠক যেন মনে করিবেন না তাহাই সম্পূর্ণ। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনের কত ঘটনা চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়, কে তাহার সংবাদ রাখে! কত অরণ্যের নির্জ্জন পথ, কত কণ্টকময় বৃক্ষতল, কত কঠিন পাষাণশয্যা যে কত কাল হইতে কত সাধু-সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকের জীবনের কত কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? স্বামিজীর জীবনেও এরূপ হইয়াছিল। আমরা তাঁহার জীবনের যে যে অংশ তাঁহার বা অন্যান্য লোকের নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া পাঠকদিগের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়াছি, কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সব শেষ হয় নাই। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার কিছু কিছু অপরের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার সম্বন্ধে স্বামিজী, কি কারণ বশতঃ জানি না, কখনও কোন কথা নিজমুখে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু না বলিয়া কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। স্বামিজী-চরিত্র সম্যক্ বুঝিতে হইলে ঐ সকল ঘটনা বাদ দেওয়া চলে না। আমরা সেই জন্য এই স্থানে তাহাদের কতক কতক লিপিবদ্ধ করিলাম।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গাজীপুরের অপরপারে তাড়িঘাট ষ্টেশনে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটিয়াছিল।

স্বামিজী যখন ট্রেণ হইতে তাড়িঘাট জংসনে অবতরণ করিলেন,

তখন মধ্যাহ্নকাল। নিদাঘ সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে মরুময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালুকারাশি অগ্নিতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে উষ্ণ ঘূর্ণিবাত্যা বহিতেছে। স্বামিজীর হস্তে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ও কম্বল এবং পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা। সঙ্গে আর কিছু নাই—এমন কি একটি জলপাত্র পর্য্যন্ত নহে। চৌকিদার তাঁহাকে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ছায়ায় বসিতে দিল না, বাহির করিয়া দিল। তিনি অগত্যা কম্বলখানি উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পাতিলেন ও বিশ্রামাগারের বাহিরে একটি খুঁটি হেলান দিয়া সেই কম্বলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আশেপাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তর ভারতের একজন মধ্যবয়সী বেনে একটু দূরে স্বামিজীর ঠিক সম্মুখে ষ্টেশনের ছাউনীর নীচে একটা সতরঞ্চির উপর বসিয়াছিল এবং স্বামিজীর বিশুষ্ক বদন ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও তামাসা করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি ও তাহার কয়েকজন সহচর গাড়ীতে স্বামিজীর সহিত একত্রে আসিয়াছে ও স্বামিজীকে যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছে। স্বামিজী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কয়েকটা ষ্টেশনে পানীয় জল সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে একটিও পয়সা না থাকাতে পানিপাঁড়েদিগের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত হইলেন। কারণ তাহারা যাহাদিগের নিকট পয়সা পাইতেছিল সর্ব্বাগ্রে তাহাদের জল সরবরাহ করিতে লাগিল এবং ইতোমধ্যে ট্রেণও ছাড়িয়া দিতে লাগিল। বেনেটী এদিকে পয়সা খরচ করিয়া এক লোটা ঠাণ্ডা পানি যোগাড় করিল ও তদ্দ্বারা আপন তৃষ্ণা দূর করিতে করিতে ঈষৎ অবজ্ঞাভরে স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওহে, দেখছো কেমন ঠাণ্ডা জল! তুমি ত সন্ন্যাসী হয়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছ। সঙ্গে এমন একটি পয়সা নেই যে জল কিনে খাও। তা দেখ মজা! তার চেয়ে যদি আমার মত পয়সা

রোজগারের চেষ্টা কর্ত্তে তবে আর এ দুর্দ্দশা ভোগ কর্ত্তে হত না।" সে ব্যক্তি এই প্রকার বাক্যবাণে স্বামিজীকে বিদ্ধ করিতে লাগিল অথচ তাঁহাকে এক বিন্দু জল দিয়া সাহায্য করিল না। তাহার মতে যাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম না করিয়া সন্ন্যাসী হয় তাহাদের উপবাস করাই উচিত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ হইতে নামিয়াও পূর্ব্ববৎ স্বামিজীকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল ও নিজে প্লাটফর্ম্মের ছায়ায় বসিয়া রৌদ্রক্লিষ্ট স্বামিজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "দেখহে, পয়সার ক্ষমতা দেখ—তুমি ত পয়সা-কড়ি গ্রাহ্য কর না, তার ফলও দেখ—আর আমি পয়সা-কড়ি রোজগার করি তার ফলও দেখ—এ সব পুরী, কচুরী, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পয়সায় হয়?" স্বামিজী বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিলেন।

ইত্যবসরে আর একটি লোক, ঐখানেই তাহার বাড়ী, দক্ষিণ হস্তে একটি পুঁটলী ও লোটা এবং বাম হস্তে এক কুঁজা জল ও একটা সতরঞ্চি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ষ্টেশনের চারিদিকে বারকতক ঘুরিয়া অবশেষে স্বামিজীর নিকট আসিয়া বলিল, "বাবাজী, আপনি রৌদ্রে বসিয়া আছেন কেন? ভিতরে চলুন, আমি আপনার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি—দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া লোকটি তাঁহাকে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া জল ও পান খাইতে দিল এবং সঙ্গে আনীত হুঁকা-কলিকায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। তাঁহার সমুদয় অভাব এইরূপ আকস্মিকভাবে দূর হইতে দেখিয়া স্বামিজী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি কে, কোথা হইতে আসিল ও কেমন করিয়া তাঁহার কথা জানিল। তাহাতে সে উত্তর করিল, "আমি একজন হালুইকর। এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে

আমার এক মিষ্টান্নের দোকান আছে। আমি আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন, 'আমার সাধু ষ্টেশনে পড়িয়া অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন। কাল হইতে তাঁহার খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। তুই শীঘ্র গিয়া তাঁহার সেবা কর।' আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনের খেয়াল ভাবিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু আরও দুইবার ঐ প্রকার স্বপ্ন দেখায় আর কালবিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ পুরী তরকারী প্রস্তুত করিয়া সকালের প্রস্তুত মিঠাই, কিঞ্চিৎ জল, পান ও তামাক লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে দৌড়াইয়া আসিলাম।" স্বামিজী প্রশ্ন করিলেন, "আমিই যে সেই সাধু তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে?" সে ব্যক্তি বলিল, "আমারও প্রথমে ঐ সন্দেহ হইয়াছিল, সেই জন্য এখানে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় সাধুর দর্শন না পাওয়ায় বুঝিতেছি ঐ সাধু আপনি ব্যতীত আর কেহ নহেন।"

শ্লেষপ্রিয় বেনিয়াটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। শেষে সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামিজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রাজপুতানায় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেটি বড় কৌতুককর। স্বামিজী যে কামরায় আসিতেছিলেন সেই কামরাতে দুইজন ইংরেজ ছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে নিরক্ষর সাধু বিবেচনায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করিতেছিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিলে স্বামিজী ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট ইংরেজীতে এক গ্লাস খাবার জল চাহিলেন। সাহেবদ্বয় যখন দেখিল যে, তিনি ইংরাজী জানেন ও

তাহারা যাহা বলাবলি করিতেছিল সব বুঝিতে পারিয়াছেন তখন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিয়াও কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "বন্ধুগণ, মূর্খলোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে এই প্রথম নয়, আমি ঢের বেকুফ দেখিয়াছি।" সাহেবদ্বয় ইহাতে প্রথমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার সুগঠিত অবয়ব ও দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া নিবৃত্ত হইল ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আর একবার ইহাপেক্ষা আরও একটা কৌতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

একজন কৃতবিদ্য থিয়োসফিষ্ট স্বামিজীর সহিত এক কামরায় আসিতেছিলেন। সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তিনি স্বামিজীকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি হিমালয় গিয়াছেন কি না ও সেখানে যে সব বড় বড় মহাত্মা আছেন তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন কি না? স্বামিজী সকল কথায় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল মহাত্মারা দেখিতে বিশালকায়, দীর্ঘজটা ও অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অমর পুরুষ কি না?" স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই, যিনি যত বড় মহাত্মা তাঁহার দেহ তত বড়, জটা তত দীর্ঘ ও শক্তি সেইরূপ অদ্ভুত।" লোকটী এইরূপ যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন তিনি ক্রমাগত সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন ও মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তারপর তিনি কল্পনাসাহায্যে সেই সকল মহাত্মাদের নানারূপ বিচিত্র শক্তির কথা সেই লোকটীর নিকট

সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। লোকটী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলেন ও শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তাঁহারা বর্ত্তমান কল্পের (cycle) স্থিতিকাল সম্বন্ধে কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "বলিয়াছিলেন বৈ কি! এ সম্বন্ধে যে অনেক কথা হইয়াছিল। তাঁহারা বলিলেন, 'এ কল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। আর মহাত্মারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য এই এই কার্য্য করিবেন।" এই বলিয়া মহাত্মারা যে যে কার্য্য করিবেন তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দিলেন। সেই অতিবিশ্বাসী ভদ্রলোকটী স্বামিজীর প্রত্যেক কথা বেদবাক্যের ন্যায় বিবেচনা করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এবং এতগুলি নূতন সংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহার উপর অত্যন্ত খুশী হইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে বলিলেন। স্বামিজীও তাহাতে অসম্মত হইলেন না। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তাহার উপর বকিয়া বকিয়া ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কোনরূপ দ্রব্যসঞ্চয় বা অর্থগ্রহণ করাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে ভদ্রলোকটীর প্রদত্ত আহার্য্য-দ্রব্যাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি হইল না।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে স্বামিজী লোকটীকে অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাহার অন্তঃকরণটি উন্নত বটে, কিন্তু অলৌকিক ঘটনার প্রতি তাহার আস্থা কিছু বেশী। একটা কিছু অলৌকিক হইলে হয়! সে আর তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুরুন্মীলনে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে বেশ একটু কড়া করিয়া বলিলেন,

"তোমরা হচ্ছ পণ্ডিত-মূর্খের দল! এদিকে লেখাপড়া ও সুশিক্ষার খুব বড়াই কর, অথচ বিনা বিচারে কতকগুলো যাচ্ছেতাই গাঁজাখুরি গল্পও গলাধঃকরণ করতে ছাড় না।"

লোকটী লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া তিনি দয়ার্দ্র হইলেন ও তাহার মস্তিষ্ক হইতে কুসংস্কাররাশি দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া ত বাপু বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার ত একটু বিবেচনা-শক্তি খাটান দরকার! ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্য সম্পর্ক আছে এটা কেমন করিয়া তোমার মাথায় ঢুকিল? কিন্তু ইহা দেখিতেছ না, ঐসব সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত বড় কামনার দাস! অহঙ্কারের ঢেঁকি! যথার্থ ধর্ম্ম মানে চরিত্র—সেইটাই প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান পুরুষেরই রিপুদমন ও বাসনাক্ষয় হইয়াছে। আর যাহারা সিদ্ধি সিদ্ধি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও একটা অলৌকিক শক্তি চায় তাহারা জীবন-সমস্যা-সমাধানের পথে একটুও অগ্রসর হয় নাই, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার করিতেছে ও স্বার্থপঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই পাগলামি করিয়াই দেশটা উচ্ছন্ন গেছে। তার চাইতে বরং পার যদি জীবনের আসল সত্যের দিকে লক্ষ্য স্থাপন কর; যাহাতে মানুষ হইতে পার এমন বিবেচনাবুদ্ধি লোকহিতৈষণা নিজেদের মধ্যে জাগাইয়া তোল। বৃথা শক্তি-ফক্তির লোভে ছুটিও না—ওসব আলেয়া। এখন আমরা এমন ধর্ম্ম চাই যাহাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে, জাতীয় সম্মানবোধ জন্মায়, আর পতিত দরিদ্রদের তুলিবার ক্ষমতা ও বল

ফিরিয়া আসে। দেশের শত শত লোক অনাহারে আছে, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে সুশিক্ষার অভাবে জন্তু-জানোয়ারের সামিল হইতেছে —এখন এই দেখিবে, না কোথায় আকাশের কোণ হইতে হিমালয়ের চূড়ার উপর কোন্ কল্পান্তরের মহাত্মা খসিয়া পড়িতেছেন তাহাই দেখিতে ছুটিবে! বেশ করিয়া বুঝ বাপু! যদি ভগবানকে চাও, আগে মানুষের সেবা কর। যদি শক্তি চাও, আগে লোকসেবায় দেহক্ষয় কর।"

স্বামিজীর কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটীর চৈতন্য হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও ওসব কাল্পনিক কথায় বিশ্বাস করিবেন না।

গিরিশবাবুকে স্বামিজী এই সময়ের একটা ঘটনা বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা বর্ণিত হইল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"আমি একবার কোন স্থানে যাইবার জন্য এক রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেস্থানে যাওয়া হইল না। অগত্যা সেই ষ্টেশনেই কয়েক দিন থাকিতে হইল। সেই সময়ে অনেক লোক দলে দলে আমার নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম; আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি তিন দিন ত অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।" আমি ভাবিলাম বুঝি নারায়ণ স্বয়ং দীনের বেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমাকে কিছু আহার করিতে দিবে?" সে ব্যক্তি অতি

কাতরভাবে বলিল, "আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার-প্রস্তুত-করা রুটী দিব! যদি বলেন, আমি আটা ডাল আনি, রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।" সে সময়ে আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, "তোমার-প্রস্তুত-করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।" শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত। সে খেতড়ির রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে সে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার-প্রস্তুত-রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং চাই কি তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিতেও পারেন। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।" এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু তথাপি সে বলবতী দয়া-প্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিল। সে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ! তাহার দয়া দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম, "এইরূপ কতশত উচ্চচেতা ব্যক্তি পর্ণকুটিরে বাস করে, কিন্তু আমাদের চক্ষে তাহারা চিরদিন ঘৃণ্য, হীন।"

তাঁহাকে উপরোক্ত মুচির প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া ষ্টেশনের কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিয়াছিল, "আপনি যে এই নীচ ব্যক্তির স্পৃষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিলেন, এটা কি ভাল হইল?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমরা ত এতগুলি লোক আজ তিন দিন ধরিয়া আমায় কত বকাইলে, কিন্তু আমি কিছু খাইলাম কি না তাহার কি খোঁজ লইয়াছ? অথচ নিজেরা ভদ্র, আর ও ব্যক্তি নীচ বলিয়া বড়াই করিতেছ! ও যে মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছে তাহাতে ও নীচ কিসে?"

খেতড়িরাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার পর স্বামিজী এই ব্যক্তির দয়ার কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। মহারাজ কয়েকদিন পরেই লোকটিকে ডাকাইলেন। সে অতিশয় ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, না জানি অদৃষ্টে কি নির্য্যাতন-ভোগ আছে। কিন্তু রাজা তাহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন ও সেইদিন হইতে তাহার দুঃখ দূর হইল।

আর একবার পদব্রজে বহু পথ পর্য্যটন করিয়া তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ও তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। জগৎ প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ও সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। সহসা তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত আলোকরাশির ন্যায় তাঁহার দৌর্ব্বল্য ও অবসাদের মাঝখানে একটা প্রবল চিন্তা জাগিয়া উঠিল। "ইহা কি সত্য নহে যে আত্মার মধ্যে জীবের সমগ্র শক্তি নিহিত আছে? তবে আমি দেহেন্দ্রিয়ের শ্রান্তিতে এত কাতর হইতেছি কেন? এ দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আসিল?"—এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার শরীর ও মন বিপুল শক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি আবার চলিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে বহু পথ অতিক্রম করিলেন। মনের এই অদম্য তেজ, জড়ের উপর চৈতন্যের এই প্রভাব বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। ক্যালিফর্ণিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"আমি কতবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি, গাছের

তলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে 'আমার আবার মৃত্যুভয় কি? আমার জন্মও নাই, মরণও নাই; ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং সোঽহং। প্রকৃতি আমায় নষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতি ত আমার দাসী। হে মহেশ্বর, তোমার শক্তি প্রকাশ কর, হৃতরাজ্য পুনর্জ্জয় কর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ইত্যাদি।' অমনি আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে, বাহুতে বল আসিয়াছে, হৃদয়ে সাহস দেখা দিয়াছে, মনে তেজ বাড়িয়াছে, আর তাই আজও আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি। এইরূপে যখনই আমার জীবনাকাশে চারিদিক হইতে মেঘ ঘিরিয়া আসিয়াছে তখনই সেই মেঘের পশ্চাতে আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছি; অমনি সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক সকলই স্বপন, পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদ হউক না কেন, ভয় পাইও না—দেখিবে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। আঘাত কর, দেখিবে ইহা অন্তর্হিত হইয়াছে; পদাঘাত কর, দেখিবে চূর্ণ হইয়াছে।"

আর একবার কচ্ছদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক মরুভূমির মধ্যে গিয়া পড়েন। সূর্য্যদেব মস্তকোপরি অনলবর্ষণ করিতেছেন, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অথচ নিকটে মনুষ্য-বাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও অবশেষে সম্মুখে নির্ম্মলবারিশোভিত একটী গ্রাম দেখিতে পাইলেন। গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলি দেখা যাইতেছে, আশে-পাশে ফলভরে অবনত কত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষলতা, তাঁহার মনে এতক্ষণ পরে আশার সঞ্চার হইল। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—আর দুই চারি পা যাইলেই আকণ্ঠ বারি পান করিবেন ও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়

বসিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই যেন গ্রামখানি সরিয়া যাইতে লাগিল। ঐ যে একটুখানি ব্যবধান তাহা কিছুতেই শেষ হইল না। আগেও যতদূর ছিল এখনও যেন ততদূর রহিয়াছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন, মিথ্যা গ্রাম—মিথ্যা বৃক্ষাবলীশোভিত কুটীর—মিথ্যা বারিপূর্ণ হ্রদ—সবই মরীচিকা! তিনি হতাশ হইয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া পড়িলেন ও আকুলনয়নে উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল 'ওঃ কি ভ্রম! জীবনও বুঝি এইরূপ! মায়ার ছলনা এইরূপ! হা সত্য, তুমি কোথায়! হা ঈশ্বর, তুমি কোথায়! একবার দেখাও তোমরা কোথায়।' অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তানিবিষ্ট থাকিয়া তিনি পুনরায় উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষ-লতা-হ্রদ-শোভিত গ্রামখানি নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু আর তিনি ভুলিলেন না। সত্যভ্রমে মরীচিকার পশ্চাতে আর ধাবিত হইলেন না। পাশ্চাত্য দেশে একটী বক্তৃতা করিবার সময় এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি মায়াকে মরীচিকার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

আর একবার একজন শিষ্যের সাক্ষাতে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন—"ওঃ, কি সব কষ্টের মধ্য দিয়াই দিন গিয়াছে! একবার উপর্য্যুপরি তিন দিন খাইতে না পাইয়া রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। জলে ভিজিয়া শরীরটা একটু সুস্থবোধ হইতেছিল। তখন উঠিয়া আস্তে আস্তে আবার পথ হাঁটি ও এক আশ্রমে পৌছিয়া কিছু মুখে দিই, তবে প্রাণ বাঁচে।"

এইরূপে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামিজীকে বহুবার বহু বিপদের

সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বহু কষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অনেক সময় একখানি গীতা ও পরমহংসদেবের একখানি ফটো ব্যতীত আর কিছু সম্বল না লইয়া তিনি পথ চলিয়াছেন। মধ্যভারতে সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়া ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে যাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন—যাহারা নিতান্ত অসভ্য ও অতিথি-সৎকার-বিমুখ, এক মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে দেয় নাই, আশ্রয় মাগিলে তাড়াইয়া দিয়াছে। অনেকদিন এমন ঘটিয়াছে যে, কয়েক দিবস নিরম্বু উপবাসের পর কোন-রূপে জীবনধারণোপযোগী দুটি সামান্য কিছু আহার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ও এইরূপ অন্যান্য কয়েকটী ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্ত্বের অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতিবিধানের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তিনি ধরণীর ধূলিরাশির মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—দরিদ্রের জীর্ণকন্থার অন্তরালে পরদুঃখে দুঃখী, সমবেদনায় স্নিগ্ধবারি-সিঞ্চিত কোমল মানব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রাণ তাহাদের দুঃখের বোঝা দূর করিবার জন্য আকুল হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতের কোটী কোটী পতিত সন্তানকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে ছুটিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রমণের পরিসর যতই বাড়িতে লাগিল, যতই তিনি নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন অবস্থার সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন ততই মাতৃভূমির প্রকৃত অভাব তাঁহার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তিনি ইহার গরিমা উপলব্ধি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহার দুর্ব্বলতাও দেখিতে পাইলেন। সে দুর্ব্বলতা প্রধানতঃ দেশবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব—জাতির জাতীয়ত্বহানি—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ। তিনি বুঝিলেন, এই দারুণ অনিষ্ট-নিবারণের একমাত্র উপায় ঋষিদিগের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন। তিনি বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম এই দুর্দ্দশার কারণ নহে, ধর্ম্মের অভাবই ইহার কারণ। কর্ম্মজীবনে পরিণত হইলেই ধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি পায়।"

কিন্তু দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে উদিত থাকিলেও স্বামিজী অন্তরে চিরদিনই সত্যকাম সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বিবিধ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, ত্যাগই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির ভিত্তিভূমি। তাই দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য-দেশের মঠাধ্যক্ষগণ এক সময়ে পাশ্চাত্যজগতের রাজনীতি-পরিচালনা ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা সাধনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাই ভারতের ইতিহাসেও দেখিতে পাই চিরকাল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ জনকাদি যোগী এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, রামদাস, নানক প্রভৃতি সন্ন্যাসি-গণের এত প্রভাব! সৃষ্টির প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একথা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না যে, ভারতের বর্ত্তমান অবনতি-স্রোত রোধ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে চালিত করিতে হইলে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক-তার অনাবিল প্রবাহে সমুদয় দেশ প্লাবিত করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি ত্যাগের আদর্শকে আরও উচ্চ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসীর শিরোমণি হইয়াও দেশের ও সমাজের কল্যাণচিন্তায় মুহূর্ত্তমাত্র বিরত হইলেন না। অপরাপর সন্ন্যাসীরাও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন এবং তিনিও প্রকৃত বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী দেখিলেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

আদর্শের রক্ষক বিবেচনায় চিরদিন তাঁহাদের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। হিমালয়ে ভ্রমণকালে একদিন তিনি এক শীতার্ত্ত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং দেখিবামাত্রই তাঁহাকে একজন সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিপ্রবর শীতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া স্বামিজী যাইতে যাইতে নিজের কম্বলখানি দ্বারা তাঁহার গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন ও 'নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী তাঁহার সমপ্রাণতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত এমন কি দোষ বা কলঙ্কের কাহিনীও প্রকাশ করিয়া ফেলিত ও পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য বিষম আত্মগ্লানি অনুভব করিত। হৃষীকেশে এরূপ একটী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও পবিত্র আচার ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এ ব্যক্তি প্রকৃতই জ্ঞানপথের পথিক। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, এই ব্যক্তিই একসময়ে গাজীপুরের পওহারী বাবার জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময়ে পওহারী বাবা তাহা টের পাওয়াতে সে উহা ফেলিয়া দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে পওহারী বাবা বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলেন ও জিনিষগুলি তাহার হাতে দিয়া ছাড়েন। স্বামিজী পূর্ব্বেই এই গল্পটী শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সৌম্যমূর্ত্তি সাধুটিকে স্বমুখে সেই পূর্ব্ব ঘটনা বিবৃত করিতে দেখিয়া মহাপুরুষ-সংসর্গে তাঁহার জীবনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া পুলকে পূর্ণ হইলেন। সাধু বলিলেন, "তিনি (পওহারী

বাবা) যখন আমায় নারায়ণজ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।"

সাধুর বাক্যশ্রবণে স্বামিজী এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবারও অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কারণ প্রকৃতই এই ব্যক্তির অন্তরে তখন সাধুতা বিরাজ করিতেছিল। যে হৃদয় এক সময়ে পরদ্রব্যহরণে লোলুপ ছিল তাহা এক্ষণে সাধুসংসর্গের নির্ম্মল সলিলে প্রক্ষালিত। সেখানে আর কোন কলুষ নাই—কোন মালিন্য নাই। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামিজীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল। স্বামিজী বুঝিলেন লোকটির বস্তুলাভ হইয়াছে। তার পর তিনি কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কথা প্রায়ই স্মরণ করিতেন এবং আজীবন তাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এমন কি পরে আমেরিকায় প্রচারকালে বোধ হয় এই ঘটনা মনে রাখিয়াই তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "পাপীদিগের মধ্যেও সাধুতার বীজ নিহিত আছে।"

আর একবার এক তিব্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, কলিযুগ আ গিয়া"। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন" ? তাহাতে সে উত্তর করিল, "দেখুন, পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কেমন নিঃস্বার্থ ভাব ছিল, একাধিক পুরুষ একজন স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত! কিন্তু এক্ষণে প্রত্যেক পুরুষ একটী করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।" যদিও তাহার অদ্ভুত যুক্তি ও তর্কপ্রণালী দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে হাস্য করিলেন তথাপি তাহার সরল বিশ্বাস ও অকপটতায় তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না। সেইদিন হইতে তাঁহার মনে হইল, প্রত্যেক জিনিসেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু না কিছু বলিবার আছে। এই ঘটনা ও ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশের

বহুধা বিভিন্ন আচার-পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তির প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি একটা জিনিসকে বহুভাবে বহুদিক হইতে দেখিতে ও বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন।

এই তাঁহার প্রবাসভ্রমণের কাহিনী। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিতেন ও মধ্যাহ্নে কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার সময় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী কন্যাকুমারিকা হইতে পণ্ডিচেরী নামক ফরাসী উপনিবেশে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত একজন ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্মণের তর্ক হয়। সে ব্যক্তি তাঁহার উদার ও উন্নত ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার উপর বিষম চটিয়া গেল ও তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্ব্বক বিদেশীয়দিগের নিকট হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া বলিল, "আমাদের এ সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারের কোন আবশ্যকতা নাই, ম্লেচ্ছরা উহার কি বুঝিবে? উহাদের সংস্পর্শে শুধু জাতিনাশ হইবে মাত্র।" এইরূপ বলিয়া তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিল। স্বামিজীও তাহাকে যত বুঝাইবার চেষ্টা করেন সেও তত তাহার প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে তিনি যে কথা বলিতে লাগিলেন সেই কথাতেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া কেবল বলিতে লাগিল—'কদাপি ন'—'কদাপি ন'।

পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত পুনরায় মন্মথবাবুর সাক্ষাৎ হয়। মন্মথ-বাবু তাঁহাকে মান্দ্রাজে আপন বাসায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইলে উভয়ে একত্রে মান্দ্রাজ পৌঁছিলেন। প্রথম দিনেই মান্দ্রাজে স্বামিজীকে লইয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত সহরে রটিয়া গেল 'এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।'

বাস্তবিক মান্দ্রাজেই স্বামিজী সর্ব্বপ্রথম জনসমাজের নিকট বিস্তৃত-ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজবাসী যুবকেরাই সর্ব্ব-প্রথম তাঁহার উন্নতভাব সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া-

ছিল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ গমনের পথ সুগম করিয়াছিল। এ হিসাবে বঙ্গদেশ চিরদিন মান্দ্রাজের নিকট ঋণী থাকিবে।

এখানেও পূর্ব্ববৎ দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইতে লাগিল। মন্মথবাবুর বাটীতে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "স্বামিজী, হিন্দুদের বেদান্তধর্ম্ম থাকাতেও তাহারা মূর্ত্তিপূজক কেন?" তিনি প্রশ্নকর্ত্তার দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "কারণ, আমাদের যে হিমালয় রহিয়াছে।" লোকটি প্রথমে উত্তর শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তারপর যখন তিনি বুঝাইলেন, ভারতের চতুর্দ্দিক যে মহান্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বেষ্টিত তাহাতে কোন লোক তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন উত্তরটা তাহার বোধগম্য হইল। সেদিন তিনি বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধবশতঃ প্রতি দেশে প্রতি জাতির মানসিক গঠন ও অভিব্যক্তি কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি, যে যেরূপ লোক তাহাকে ঠিক সেই ভাবে উপদেশও দিতে লাগিলেন; যে ভক্তিপ্রবণ তাহার নিকট ভাব ভক্তি অবতারতত্ত্বের উপদেশ দিতেন ও নিজের অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন; আবার যে বিচারপরায়ণ তাহার সহিত বিচার ও কূটতত্ত্বমীমাংসার কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

মান্দ্রাজবাসীরা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি যে সাধনবলে বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে—তাহা তাহারা এই প্রথম অনুভব করিল, এবং প্রতিদিন স্বামিজীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইতে

লাগিল। একদিন কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, সেক্সপিয়র ও বায়রণ—অন্যদিন হেলেন ও ট্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ—এইভাবে দিন দিন কত প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল।

তাঁহার গুণাবলীও তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কলনিনাদী কণ্ঠধ্বনি—সেই কণ্ঠের পীযুষপূর্ণ সঙ্গীত, বিপুল আত্মশক্তি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অজেয় তর্কযুক্তি, অদ্ভুত বাগ্মিতা ও শুভ্র-স্বচ্ছ হাস্য-পরিহাস—কোন্‌টির কথা বলিব? তাঁহাকে দেখিবার জন্য মন্মথবাবুর গৃহে দিন দিন জনতা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তেজও যেমন ছিল বিনয়ও সেইরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা ঔদ্ধত্যবশতঃ তাঁহাকে অপমান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ করযোড়ে 'আমি অতি মূর্খ' বলিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন, আবার কখনও প্রচণ্ড ঝটিকার মত তাঁহাদের সকল যুক্তি-তর্ক ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার অভিমান ছিল না, বা তিনি বিদ্বেষভাব-প্রণোদিত হইয়া কখনও কাহাকে কোন কথা বলিতেন না; তবে প্রয়োজন হইলে স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন বা তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। মান্দ্রাজে একদিন এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-বন্দনা ত্যাগ করায় কোন প্রত্যবায় আছে কি না?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্যাগের হেতু কি?" পণ্ডিত বলিলেন, "সময়াভাব"। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কি! সময়াভাব? প্রাচীনকালের সেই মহামহা-আর্য্যঋষিগণ, যাঁহাদের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে গেলে তোমার জীবন ফুরাইয়া যায়—তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনার সময় পাইতেন, আর তুমি সময় পাও না?" সেইদিনই একজন সাহেবী গোছের হিন্দু বৈদিক ঋষিদের উপদেশগুলিকে অর্থহীন বাজে জিনিষ বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে স্বামীজির চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত

হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' বলিয়া একটা কথা আছে। তোমার হইয়াছে তাই। নতুবা, তুমি কি বলিয়া সেই প্রাচীন মনস্বিগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছ ও তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তোমার ধমনীতে প্রবাহিত সেই সকল পূর্ব্ব-পুরুষের রক্তের অসম্মান করিতেছ? তুমি কি তাঁহাদের উপদেশের কিছু জান? তুমি কি বেদ কখনও দেখিয়াছ বা তাহার একটী ছত্রও পাঠ করিয়াছ? তবে বৃথা কেন বাক্যব্যয় কর? ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও জগতের সম্মুখে হিমালয়ের ন্যায় অটল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। জগৎকে ডাকিয়া বলিতেছে—'এস, যদি পার আমাদিগকে উল্টাইয়া দাও।' যদি কারও সাহস থাকে আসুক, দেখুক, পরীক্ষা করুক; সে সত্য উল্টাইবার নয়। তোমার মত কতগুলো গোঁড়া ও একদেশদর্শী লোকই এ জগৎটাকে এত ঘৃণ্য করে তুলেছে।"

দিবারাত্র লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ক্লান্তি বোধ হইলে স্বামিজী ক্লান্তিদূরীকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানে জলমধ্যে আকটিনিমজ্জিত অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় ধীবরসন্তানগণকে তাহাদিগের গর্ভধারিণীর সহিত জলমধ্য হইতে মৎস্য শিকার করিতে দেখিয়া দুঃখে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত এবং তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, "হা ভগবান! এই সকল হতভাগ্যগণকে কেন সৃজন করিয়াছ? উহাদের কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না! কতদিন প্রভু, কতদিন ধরিয়া উহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিবে!" তাঁহার সঙ্গের যুবকবৃন্দও তাঁহার হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়া মনে মনে ব্যথিত হইত। স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে ভারতের পতিতজাতিদিগের উন্নতিবিধানের জন্য সকলকেই উঠিয়া-পড়িয়া

লাগিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "যদি অবনত ভারতকে আবার উন্নত দেখিতে চাও তবে এই সকল হতভাগ্যদিগকে বুকে তুলিয়া লও। বেদবেদান্তাদি রত্নরাশি তাহাদিগের মধ্যে অকাতরে বিতরণ কর ও সমাজের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দাও।"

তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে গুপ্ততত্ত্ব বা রহস্যবিদ্যা ইত্যাদি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের পথ ত সরল উদ্দাম উন্মুক্ত! ইহার মধ্যে আবার লুকোচুরি কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। বলিতেন, "গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক রহস্য—এ সকল দিকে ছুটিও না। শক্তি লাভ হইবে, সিদ্ধি লাভ হইবে, এ সব মনে ভাবিও না। এমন কি নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত চাহিও না। শুধু পরের মুক্তি খোঁজ, ধর্ম্মের উদ্ধার কিসে হইবে অনুসন্ধান কর, ভারতীয় ভাব কি করিয়া সমুদয় জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়া উপায় উদ্ভাবন কর।"

একদিন তাঁহার সম্মানার্থ একটি বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে মান্দ্রাজের প্রায় সমস্ত অগ্রণী ও বিদ্বান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন স্বামিজীর প্রতিভাদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন স্বামিজীকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে একটী ক্ষুদ্র দল গড়িলেন ও তাঁহার প্রতি কথা কাটিবার উপক্রম করিলেন। তিনি নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন আপনি ও ঈশ্বর এক। তবে ত আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য এ সব দায়িত্ব কাটিয়া গেল। এখন আপনি যদি কুকার্য্য করেন তবে আপনাকে ঠেকায় কে?" স্বামিজী বলিলেন, "যদি আমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতাম ঈশ্বর ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই—তাহা হইলে আমা দ্বারা কোন কুকার্য্য হওয়া সম্ভবপরই নহে।"

রামনাদের রাজসভায়ও একজন তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল যে, সাধারণ জীবের পক্ষে বাঙ্মনের অগোচর ব্রহ্মকে জানা কি করিয়া সম্ভব? তাহাতে তিনি জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সেই বাক্য-মনের অগোচরকে জানিয়াছি।"

ট্রিপ্লিকেন লিটারেরি সোসাইটির (সাহিত্য সভার) কয়েকটি অধিবেশনে স্বামিজী উপস্থিত ছিলেন ও তাহার সংস্কারপ্রয়াসী সভ্যগণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাহারা ঠিক উল্টা দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে—অর্থাৎ মারো কাটো লোটো এই ভাব। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সংস্কার খুব ভাল জিনিষ বটে এবং তিনি নিজেও সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের আদর্শটাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে পরের আদর্শ বসাইবার চেষ্টা করিলে কিছু হইবে না। তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে। আসল সংস্কারটা হইবে ভিতর হইতে—বাহির হইতে নয়। সব বজায় রাখিয়া—সব ছাঁটিয়া ফেলিয়া নয়।"

একদিন তাঁহার নিকট সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার নামে খৃষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী-অধ্যাপক দেখা করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি ঈশ্বর মানিতেন না। তিনি তর্ক করিবার মানসে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে স্বামিজীর শিষ্য হইয়া গেলেন। স্বামিজী তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন ও কিডি বলিয়া ডাকিতেন। তিনি পরে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "Caeser said, 'I came, I saw, I conquered. But kidi came, he saw, but—was conquered.'" অর্থাৎ কিডি জয় করিতে আসিয়া নিজে বিজিত হইয়া গেল। ইহার পরে ইনি স্বামিজীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই পরামর্শে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহার অবৈতনিক

কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে সাধু-সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন ও সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় বলেন যে, তিনি কতিপয় সহাধ্যায়ীকে লইয়া তামাসা দেখাইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—গুটিকতক প্রশ্ন দ্বারা স্বামিজীকে পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্নগুলির সপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা যাহা বলিবার ছিল তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা ও আয়ত্ত করিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ আয়ার এই সময়ে খৃষ্টান কলেজের ছাত্র ছিলেন ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বেশ একটু টান হইল। এমন কি, এক সময়ে তিনি ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্বামিজী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে একটী হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রথমতঃ তাঁহার তেজোদীপ্ত কান্তি দর্শনে স্তব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" স্বামিজী শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে আপনমনে পূর্ব্ববৎ ধূমপান করিতে লাগিলেন। একটু পরে তিনি হুঁকাটী রাখিয়া চক্ষু চাহিলেন ও প্রশ্ন-কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাপু, শক্তি (energy) জিনিষটা কি বলিতে পার?" যুবকটি তাঁহার বিজ্ঞানের ঝুলি হইতে দু-চারটা বাঁধা বুলি ঝাড়িলেন, কিন্তু স্বামিজী সেগুলি সব খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর সকলে উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামিজী আবার তাহাদিগের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করিলেন। শেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইল। তখন স্বামিজী উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন,

"এ কি হইল ? তোমরা এই শক্তি কথাটা (energy) বুঝাইতে পারিলে না ? প্রতিদিন এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাক, অথচ ইহা কি বলিতে পারিতেছ না—আর আমায় বলিতেছ কি না 'ঈশ্বর কি' তাহা তোমাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে ?" তাহার পর তিনি ঈশ্বর ও শক্তি এই দুইটী কথা একসূত্রে গাঁথিয়া এরূপ একটী গভীর চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন যে যুবকবৃন্দ তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় আপনাদিগকে নিতান্ত শিশু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা আরও দুই চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে যুবকেরা চলিয়া গেল, কিন্তু মিঃ আয়ার স্বামিজীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলেন ও স্বামিজী সমুদ্র-তীরে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পূর্ব্ববৎ নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল এবং অবশেষে হিন্দুদের দৈহিক অধোগতি ও শারীরিক শক্তির অপচয় সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামিজী আয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোকরা তুমি কুস্তি লড়িতে পার ?" আয়ার ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিলে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "এস দেখি, একটু লড়ি।" আয়ার তাঁহার মাংসপেশীর দৃঢ়তা ও ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিন হইতে তাঁহাকে 'পালওয়ান স্বামী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামিজীর হৃদয় ধনী দরিদ্র সকলের জন্য কিরূপ উন্মুক্ত থাকিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে একজন পাচক ছিল, সে স্বামিজীর বিদ্যা-বুদ্ধি বা দার্শনিক জ্ঞানের বিশেষ ধার ধারিতে না পারিলেও তাঁহার সাতিশয় অনুরাগী ছিল। এরূপ অনুরাগের কারণও ছিল। একদিন স্বামিজী দেখিলেন, পাচক ঠাকুরটী এক দৃষ্টে তাঁহার মহীশূররাজপ্রদত্ত

হুঁকাটির দিকে চাহিয়া আছে। তাহার নয়নের সতৃষ্ণভাব দেখিয়া স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি হুঁকাটি চাও?" লোকটি মনে করিল বুঝি তাহার শ্রবণশক্তির ভ্রম হইয়াছে। সেই জন্য চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিল যে তাহার শুনিবার ভুল হয় নাই—সত্যই স্বামিজী হুঁকাটি দিতে চাহিতেছেন; তথাপি স্বামিজীর কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না। এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা! একটা জলজ্যান্ত মহারাজের দেওয়া হুঁকা—সেটা স্বামিজী তাহাকে দিবেন? না না, স্বামিজী বোধ হয় রহস্য করিতেছেন! কিন্তু যখন সে সত্যই দেখিল স্বামিজী নিজে হুঁকাটি তাহার হাতের মধ্যে দিতেছেন তখন তাহার বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। যাহারা তাঁহার ঘটনাটি শুনিতে পাইল তাহারা বুঝিল এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্বামিজী কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। কারণ হুঁকাটি বাস্তবিক তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল।

পরের প্রীত্যর্থ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবিসর্জ্জন স্বামিজীর জীবনে বিরল ছিল না। তাঁহার ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য দেখিয়া যদি কেহ প্রশংসা করিত তবে সে জিনিষটি তাহারই হইয়া যাইত। আমেরিকায় একবার একজন যুবক তাঁহার ভারত-ভ্রমণের নিত্য-সঙ্গী যষ্টিখণ্ডটি দেখিয়া উহা লইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। এই যষ্টিখণ্ডটির সহিত বহু তীর্থের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তৎক্ষণাৎ উহা যুবকটীকে দান করিলেন—তাঁহার কথাই ছিল—"তোমার প্রাণ যাহা চায় সে ত তোমারই"।

মান্দ্রাজে স্বামিজীর বহু ভক্ত জুটিল। আলোয়ারে যাহা হইয়াছিল এখানে তাহাই বৃহদাকারে হইতে লাগিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য নানাস্থান হইতে নানাবিধ লোক প্রত্যহ মন্মথবাবুর বাটীতে

আসিতে লাগিল—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, মানী, জ্ঞানী, পদস্থ কাহারও অভাব ছিল না।

তাঁহার একজন উচ্চশিক্ষিত মান্দ্রাজী শিষ্য এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বামিজীর জ্ঞানের প্রসার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম। ঋগ্বেদ হইতে রঘুবংশ, প্রাচীন বেদান্তদর্শনের উচ্চতম দার্শনিক চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কান্ত ও হেগেল পর্য্যন্ত—এক কথায় প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় সাহিত্য—এমন কি শিল্পকলা, সঙ্গীতবিদ্যা, নীতিবিদ্যা—প্রাচীন যোগবিদ্যা হইতে আধুনিক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমুদয়ই যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল্‌। তাঁহার এই অগাধ বিদ্যা দেখিয়াই আমি একেবারে স্তম্ভিত হই এবং তাঁহার দাস হইয়া যাই।"

তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মান্দ্রাজ তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিঃ কে, ব্যাসরাও বি, এ, নামে একজন মান্দ্রাজী লিখিয়াছেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট—মুণ্ডিত মস্তক, মনোহররূপসম্পন্ন, গৈরিক বসনধারী, ইংরেজী ও সংস্কৃত অনর্গল বলিতে অভ্যস্ত, প্রত্যেক প্রশ্নের চোকা চোকা জবাব দিবার অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন, সঙ্গীতবিদ্যায় এরূপ অভ্যস্ত যে গলা হইতে অতি সহজ ভাবে পুরা সুর বাহির হইয়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মার সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেছে, কিন্তু এদিকে একজন নিঃসম্বল পরিব্রাজক মাত্র। বলিষ্ঠ, সাহসী, উজ্জ্বল পরিহাসরসিক পুরুষ, তথাকথিত মহাত্মাগণের পদানুসরণে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী সম্প্রদায়সমূহের উপর বিজাতীয় ঘৃণাসম্পন্ন···কয়েকজন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির হৃদয়ে অবিনাশী বিশ্বাসের আগুন জ্বালাইয়াছিলেন।"

ইতঃপূর্ব্বে স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিয়া তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"এখন হিন্দুধর্ম্মকে সমুদয় জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঋষিদিগের এই ধর্ম্মকে আর সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না, জগৎময় ইহা ছড়াইতে হইবে। সনাতন ধর্ম্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হইয়াছে; শুধু বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ইহাকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিলে হইবে না। ইহার পুনঃসংস্কার করিয়া জগতের সমক্ষে বাহির করিতে হইবে ও পূর্ণ উদ্যমের সহিত ইহার মহিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে হইবে।" তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভক্তগণ শুধু যে আনন্দিত হইল তাহা নহে, তাহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিল ও অনতিবিলম্বে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল। কিন্তু সত্যই যখন অর্থ সংগৃহীত হইল তখন স্বামিজী বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি নিজের খেয়াল তৃপ্তির জন্য এ সব করিতেছি, না ইহার মধ্যে বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?" তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাগো! তোর কি ইচ্ছা বল্। তুই ত প্রকৃত কর্ত্রী। আমি তোর হাতে কলের পুতুলমাত্র। তোর মনে কি আছে খুলে বল্।" সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সুদূর প্রবাস গমনের পূর্ব্বে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি ইহা জগদম্বার অভিপ্রায়, না তাঁহার নিজের অভিলাষ? যদি জগদম্বারই অভিপ্রায় হয় তবে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা কেন? অর্থ ত আপনিই আসিবে। এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে মার উদ্দেশ্য জানিতে চাহি। যদি আমার গমন তাঁহার

অভিপ্রেত হয় তবে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিন। তাঁর ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনি আসিবে, চেষ্টা করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব তোমরা এই সব অর্থ লইয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ কর।" শিষ্যগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। স্বামিজীরও স্কন্ধ হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল।

তিনি পুনরায় লোকশিক্ষা দিতে লাগিলেন ও নির্জ্জনে ধ্যানস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ জগজ্জনীর চরণে হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কখনও কখনও তিনি হৃদয়ের ভাব অন্তরে নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। তখন ভাবাবেশে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইত ও এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্ন্যাসী ও তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক তখন মায়ের আহ্বান শুনিবার জন্য যেন ক্ষুদ্র শিশুটীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।

এই সময় হায়দ্রাবাদের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের মান্দ্রাজী বন্ধুদিগের নিকট স্বামিজীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হায়দ্রাবাদে লইয়া যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আহ্বানে স্বামিজী জগজ্জননীর গূঢ় উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন ও হায়দ্রাবাদ গমনে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার যশোরাশি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি সাধারণের অপরিচিত সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী হইতে ক্রমশঃ সর্ব্বজনাদৃত স্বামী বিবেকানন্দরূপে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। মন্মথবাবু হায়দ্রাবাদে রাজ-ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিলেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৩) স্বামিজী হায়দ্রাবাদে পৌছিয়া তাঁহার অতিথি

হইবেন। তৎপূর্ব্বদিন হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের যাবতীয় হিন্দু মিলিত হইয়া স্বামিজীর অভ্যর্থনার জন্য একটী সাধারণ জনসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে, স্বামিজী হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে পদার্পণ করিবামাত্র দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যে হায়দ্রাবাদের মহা সম্ভ্রান্ত আমীর, ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজপারিষদ্, উকীল, পণ্ডিত, ধনী বণিকাদি বিস্তর লোক ছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েকজনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে, যথা—রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজা রম্ভারাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, কাপ্তেন রঘুনাথ, সামসুলউল্‌মা সৈয়দ আলি বেলগ্রামী, নবাব ইসাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব দুলা খাঁ বাহাদুর, নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, মিঃ এইচ্ দোরাবজী, মিঃ এফ্, এস্, মণ্ডন, রায় হুকুমচাঁদ এম, এ, এল-এল-ডি, চতুর্ভুজ ও মতিলাল শেঠ ব্যাঙ্কার্স, বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কালীচরণবাবু কলিকাতায় থাকিতে স্বামিজীকে জানিতেন, এক্ষণে তিনি এই সকল ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প ও পুষ্পমাল্য স্বামিজীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

একজন স্বচক্ষে সেদিনকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন— "স্বামিজী তখন একজন বেশ বলিষ্ঠ যুবক—পরমহংসের বেশে কমণ্ডলু হস্তে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিলেন। তাঁহাকে মধুসূদনবাবুর বাঙ্গলায় লইয়া যাওয়া হইল এবং অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গেলেন। যাঁহারা ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গলাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। একজন স্বামীকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য এত লোকসমাগম হায়দ্রাবাদে কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে বহুসম্মানসূচক রাজোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।”

১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সেকেন্দ্রাবাদের একশত হিন্দু অধিবাসী দুগ্ধ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন উপহার লইয়া স্বামিজীর সকাশে উপস্থিত হইলেন ও মহবুব কলেজে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী সম্মত হইয়া ১৩ই তারিখে বক্তৃতার দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। তারপর কালীচরণবাবু তাঁহাকে গোলকুণ্ডা দুর্গ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখেন হায়দ্রাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ হায়দ্রাবাদাধিপতির শ্যালক নবাব বাহাদুর সার খুরশেদ জা আমীরি-ই-কাবির কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া স্বামিজীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামিজী আসিবামাত্র তিনি নিবেদন করিলেন—নবাব সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদে স্বামিজীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে পর দিবস স্বামিজী কালীচরণবাবুকে সঙ্গে লইয়া নবাবসাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নবাবের এডিকং বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। নবাব সাহেবও স্বামিজীকে পরম সমাদরে স্বীয় আসনের পার্শ্বে বসাইলেন ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে সার বস্তু গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হইলেও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দু তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন।

নবাব সাহেব স্বামিজীর সহিত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিলেন। তিনি নিজে নির্গুণতত্ত্বমাত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে যে সগুণ বা পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের ধারণাও দেখিতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্বামিজী তদুত্তরে

ঈশ্বর ধারণার ক্রমবিকাশপ্রণালীর আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা শুধু যে মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, কিন্তু মানব ঈশ্বরসম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চতর ধারণায় অসমর্থ। দেহাদিভাব দূর না হইলে নির্গুণ ধারণা মানুষের ঠিক ঠিক হইতেই পারে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। এইরূপে তিনি দেখাইলেন যে মনুষ্যজাতির ধর্ম্মবুদ্ধি মনুষ্যপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যানুসন্ধিৎসা হইতে উদ্ভূত। সব ধর্ম্মই এক হিসাবে সত্য, কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালী বিভিন্ন আদর্শলাভেরই উপায় মাত্র, আর প্রত্যেক আদর্শই সম্পূর্ণভাবে লাভ হইলে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হয়। তিনি আরও বলিলেন, মনুষ্যই সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি দ্বারাই বিশ্বের সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মনুষ্য স্বয়ং সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলাভা ধারণ করিল এবং তাঁহার সর্ব্ব অবয়বে একটা বিশেষ শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইল। তিনি যেন অমরলোকবাসী দেবতার ন্যায় মনুষ্য-অনুভূতির প্রতি বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাতসারে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা দর্শনে নবাব সাহেব মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ বলিলেন, "স্বামিজী, আমি আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু স্বামিজী ধন্যবাদের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "নবাব সাহেব, সে সময় এখনও আসে নাই। যখন উপর হইতে আদেশ আসিবে তখন আমি আপনাকে জানাইব।"

নবাব সাহেবের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামিজী মক্কামসজিদ,

মারমিনার, ফলকনামা, বসীরবাগ, নিজামের প্রাসাদাবলী ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ১৩ই তারিখ প্রাতঃকালে তিনি হায়দ্রাবাদের প্রধান অমাত্য সার আশমান জা, কে সি এস আই, পেস্কার মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ও মহারাজ শিউরাজ বাহাদুর এই তিনজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার আমেরিকা গমন কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অপরাহ্ণে মহবুব কলেজে তিনি "আমার পাশ্চাত্যদেশে গমনোদ্দেশ্য" বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। পণ্ডিত রতনপাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একসহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামিজীকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। তিনি এ দিন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অধিকার, বিদ্যাবত্তা, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ও বাগ্মিতায় সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বের উল্লেখ করিলেন। হিন্দুজগতের গৌরবের দিনে তাহাদের শিক্ষা ও সাধনা কতটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন, এবং বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হইবে এবং বেদবেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বাক্যে চমৎকৃত হইলেন।

পরদিবস মতিলাল শেঠ প্রমুখ বেগমবাজারের বিখ্যাত ধনী মহাজনেরা

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে গমনাগমনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী ও সংস্কৃত ধর্ম্মমণ্ডলসভার কয়েকজন সভ্যও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামিজী পুণা হইতে একখানি তার পাইলেন, উহাতে পুণার হিন্দু সভাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পুণায় যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামিজী জানাইলেন, "এখন আমি যাইতে অক্ষম তবে সুযোগ পাইলেই আনন্দের সহিত আপনাদের ওখানে যাইব।" পরদিবস তিনি হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ, বাবা সফরউদ্দীনের বিখ্যাত সমাধিস্থান ও স্যার সালারজঙ্গের প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলেন।

হায়দ্রাবাদে স্বামিজীর সহিত এক অদ্ভুত সিদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি শূন্য হইতে ইচ্ছামত নানাবিধ ফল, ফুল বাহির করিয়া দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারিতেন। স্বামিজীকে তিনি এই সব সিদ্ধাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি যখন স্বামিজীর নিকট গমন করেন তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। তিনি স্বামিজীকে তাঁহার মাথায় হাত দিতে বলেন। স্বামিজী ঐরূপ করাতে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইল। তখন তিনি স্বামিজীকে পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্য ক্ষমতাসকল দেখাইলেন। মানুষের মনের শক্তি কতদূর, সেই সম্বন্ধে ক্যালিফর্ণিয়ায় একটি বক্তৃতার সময়ে স্বামিজী এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে এক সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। কালীবাবু লিখিয়াছেন—"তাঁহার ধর্ম্মপ্রীতি, সরলতা, অদ্ভুত আত্মসংযম এবং গভীর ধ্যানপরায়ণতা হায়দ্রাবাদবাসীদিগের চিত্তে যে স্মৃতির রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা ইহজীবনে অপনীত হইবার নহে।"

সঙ্কল্প নিরূপণ ও আমেরিকা যাত্রা

হায়দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলে স্বামিজীর মাদ্রাজী শিষ্যেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল এই দুই মাস ধরিয়া তাঁহার আমেরিকা যাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। এই যুবকদলের নেতা হইলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল নামে স্বামিজীর একজন নিতান্ত অনুগত শিষ্য। ইনি নিজে মাদ্রাজের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া চাঁদা আদায় করিতে লাগিলেন ও মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, রামনাদ প্রভৃতি স্থানেও লোক পাঠাইয়া স্বামিজীর ভক্ত, বন্ধু ও শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট অর্থভিক্ষা করা হইত, কারণ স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয় তবে সাধারণ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত, কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি—সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।" এ সময়ে আমেরিকা যাত্রার সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছিল, কারণ ধর্ম্মমহাসভার ন্যায় একটা বিরাট সভার অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্মের মহিমাপ্রচারের যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইবে ঐরূপ সুযোগ সচরাচর উপস্থিত হয় না, এটি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি শিষ্যদিগের উদ্যমে বাধা দিলেন না, কিন্তু তথাপি পরিষ্কারভাবে দৈব আদেশ লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। একদিন তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা শ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশস্বরূপিণী। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলে হয় না? তিনি যেরূপ বলিবেন সেইরূপ করিব। কিন্তু উক্ত পত্র লিখিবার পূর্ব্বে সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল,

তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, ঠাকুরের আদেশ—তিনি বিদেশ গমন করেন। ঘটনাটি এইরূপ—একদিন রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া আছেন—বেশ একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে; এমন সময়ে দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্র-তীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর পারের দিকে যাইতে লাগিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ও মনোমধ্যে যেন একটা পরম শান্তির ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কে যেন তখনও তাঁহার কাণে বলিতেছিল—"যাও!" এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তাঁহার মনে আর দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব রহিল না। কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীশ্রীমাকে একখানা পত্র লিখিলেন। এ পত্রে আর তাঁহার মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন না, শুধু তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া লিখিলেন, "মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর লাফ দিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।"

বহুদিন পরে স্নেহাস্পদ নরেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে শুধু যে ঠাকুরের প্রধান শিষ্য বলিয়াই স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তিনি জানিতেন লীলাসংবরণের পর ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন; কারণ ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার একদিন এইরূপ অদ্ভুত দর্শন হইয়াছিল—যেন ঠাকুর নরেন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি প্রায়ই নরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিতেন ও ভাবিতেন—না জানি বাছা বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্টই পাইতেছে। এক্ষণে নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একবার তাঁহার মনে হইল নরেন্দ্রকে বিদেশ গমন করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু ক্ষণকাল

পরেই মনে হইল, না—ভবিষ্যতে ইহা হইতে অনেক সুফল ফলিবে, আর ঠাকুর যখন আছেন তখন উহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি ঠিক নরেন্দ্রের ন্যায় স্বপ্ন দেখিলেন —ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন। অমনি তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয় স্থির হইল, তিনি মনে মনে নিরতিশয় স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি নরেন্দ্রকে জগতের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে দিতেও আর তাঁহার ভয় রহিল না। তিনি নরেন্দ্রকে এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইয়া একখানি আশীর্ব্বাদী পত্র প্রেরণ করিলেন, তৎসঙ্গে অনেক উপদেশও দিলেন।

স্বামিজী এই পত্র পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। আনন্দবেগ প্রশমনার্থ তিনি কিয়ৎক্ষণ নিজ কক্ষে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সমুদ্রতীরে চলিয়া গেলেন ও নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পকে বজ্রবৎ সুদৃঢ় করিলেন। তাঁহার মনে কেবলই উদয় হইতে লাগিল—"আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল। মারও ইচ্ছা আমি যাই।" ভ্রমণান্তে যখন তিনি মন্মথবাবুর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন তখন তাঁহার মুখশ্রীতে দিব্যরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন একটা নির্ম্মল শান্তির ভাব সেখানে ঢলঢল করিতেছে। শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, —হ্যাঁ, আমি এখন পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত। প্রাণপণে আমাদিগকে কাজে লাগিতে হইবে—শ্রীশ্রীমার আদেশ পাইয়াছি।

শিষ্যেরা তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রচুর অর্থ আনিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিল। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার সমুদ্র যাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেল—এমন সময়ে খেতড়ি

মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সব সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিলেন।

স্বামিজী যখন খেতড়িতে ছিলেন তাহার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে খেতড়িতে মহারাজ তাঁহার নিকট পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাকে পুত্রলাভ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যই সে আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছে—কিছুকাল পূর্ব্বে খেতড়ি রাজার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহারাজের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "জগমোহন, এ উৎসবে স্বামিজীর আসা চাই! তিনি না থাকিলে এ উৎসব আনন্দ সবই বৃথা। তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।" জগমোহনজী তদনুসারে এক্ষণে মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন ও অনুসন্ধানে, স্বামিজী মন্মথবাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে যে ভৃত্য ছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী কোথায়?" সে বলিল, "তিনি সমুদ্রে গিয়াছেন"। জগমোহন নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি! তিনি কি তা হলে পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়াছেন? কি বল হে!" কিন্তু সেই সময়ে পশ্চাতের একটি ঘরে তিনি একটা গেরুয়া আলখাল্লা দেখিতে পাইয়া স্থির করিলেন, "না, স্বামিজী কথনই যান নাই।" জগমোহন মাদ্রাজী ভাষা না জানায় ভৃত্যটীর কথা ভুল বুঝিয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল, "স্বামিজী সমুদ্রে গিয়াছেন" অর্থাৎ সমুদ্রতটে ভ্রমণের জন্য গিয়াছেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন স্বামিজী সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন। যাহা হউক স্বল্পকাল মধ্যেই একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারদেশে থামিল ও স্বামিজী তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। জগমোহন স্বামিজীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ

প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তারপর কুশল জিজ্ঞাসাদি হইল। জগমোহন কালবিলম্ব না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। স্বামিজী সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ জগমোহন, আমি ৩১শে মে আমেরিকা যাত্রা করিব—ঠিক হইয়াছে, এখন তাহারই জন্ম গোছগাছ করিতে হইতেছে—এ অবস্থায় মহারাজের সহিত দেখা করিবার আর সময় কৈ?" কিন্তু জগমোহন শুনিলেন না, বলিলেন—"স্বামিজী, আপনি অন্ততঃ একদিনের জন্মও খেতড়ি চলুন।" আপনি যদি না যান মহারাজের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। আর আপনি যে ওদেশে যাইবার জন্ম গোছগাছ বন্দোবস্তের কথা বলিতেছেন ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। আপনি শুধু আমার সঙ্গে চলুন।" জগমোহনজীর আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী অগত্যা খেতড়ি গমনে সম্মত হইলেন। স্থির হইল তিনি আর এদিকে ফিরিবেন না, বরাবর বোম্বাই হইতেই জাহাজে উঠিবেন। অনন্তর তিনি জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া খেতড়ি যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজীরা তাঁহাকে অতি দুঃখিত অন্তরে বিদায় দিল।

যখন তাঁহারা খেতড়িতে উপনীত হইলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ শত শত উজ্জ্বল দীপাবলীতে আলোকিত ও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উৎসবের চিহ্ন বিদ্যমান। আজ ৩।৪ দিন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, অনেক নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজ-অমাত্য স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত, নৃত্যগীতবাদ্যে মুখরিত এবং আনন্দস্রোতে ভাসমান।*

* খেতড়িতে যাইবার সময় পথে আবুরোড ষ্টেশনে বহুকাল পরে স্বামিজীর সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়—তাঁহারা তখন পরিব্রাজকভাবে

স্বামিজী ও জগমোহনলাল শকট হইতে প্রাসাদের সিংহদ্বারে অবতরণ করিবামাত্র রক্ষীরা অস্ত্র-উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। মহারাজ সে সময়ে পত্রপুষ্প, ফল ও মণিমুক্তা-শোভিত সুদৃশ্য রাজতরণীতে বহু রাজ-অতিথি, কুটুম্ব ও অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া জলবিহার করিতেছিলেন। গুরুর আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অন্যান্য সকলেও দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে স্বামিজীকে অভিবাদন করিলেন। স্বামিজী স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। গায়কেরা স্বস্তিগান করিতে লাগিল। স্বামিজীর জন্য একটি বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার শীঘ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ সকলেই এতচ্ছ্রবণে তাঁহাকে বহুধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য শিশু রাজকুমারকে সভামধ্যে আনয়ন করা হইল এবং তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তরক্ষা করিয়া কল্যাণবাক্য উচ্চারণ করিলে চতুর্দ্দিকে আনন্দের কলরোল উত্থিত হইল। অনন্তর স্বামিজী মহারাজ ও অভ্যাগত রাজন্যবৃন্দের সহিত কথোপকথনে নিবিষ্ট হইলেন। সেদিন সমগ্র খেতড়ি রাজ্যে রাজগুরুর উপস্থিতি নিবন্ধন যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহাদের নিকটে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছু বুঝতে পারি বা না পারি দরিদ্র, পতিত, অজ্ঞ নরনারীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে হৃদয়টা খুব বেড়ে যাচ্ছে।"

কিয়দ্দিন পরে স্বামিজী বোম্বাই গিয়া সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিবার জন্য মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অনেকদিন পরে স্বামিজীর দর্শনলাভ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে পুনরায় এত শীঘ্র গমনোদ্যত দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "স্বামিজী মহারাজ, আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চাহি না। তবে আমি জয়পুর পর্য্যন্ত আপনার অনুগমন করিব।" স্বামিজী নিষেধ করিলে মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "অতিথিকে বিদায় দিতে হইলে অন্ততঃ রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ত যাওয়া উচিত।" স্বামিজী আর কি করিবেন। মহারাজ ও জগমোহনলাল রাজকীয় গো-যানে জয়পুর পর্য্যন্ত স্বামিজী সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ জগমোহনজীকে স্বামিজীর সহিত বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইতে আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট স্বামিজীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন ও তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া দিলেন। জয়পুর হইতে স্বামিজী ট্রেণে উঠিলেন। তাঁহাকে একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া মহারাজ প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া স্বামিজী রাত্রিটা একজন রেলকর্ম্মচারীর বাসায় যাপন করিলেন। এই ভদ্রলোকের গৃহে তিনি পূর্ব্বে দিনকতক ছিলেন ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই ষ্টেশনে পুনরায় গাড়ীতে উঠিবার সময় নিম্নলিখিত অপ্রীতিকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

স্বামিজীর একজন বাঙ্গালী ভক্ত তাঁহার কামরায় বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ রেলকর্ম্মচারী আসিয়া সেই ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করিল। ভদ্রলোকটি

সেইখানে বসিয়া রহিলেন। সাহেবের কথা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া সাহেব একটু গরম হইয়া রেলের আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে নামিয়া যাইতে বলিল। ইনিও একজন রেলকর্ম্মচারী, সুতরাং রেলের আইন কানুন জানিতে তাঁহার বাকী ছিল না। তিনি বলিলেন, এমন কোন আইন নাই যাহার দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ইহাতে সাহেবটী আরও রাগিয়া গেল এবং ক্রমে দুইজনে বেশ বচসা আরম্ভ হইল। স্বামিজী তাঁহার ভক্তটীকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ স্বামিজীকে 'তুম্ কাহে বাত কর্‌তে হো' বলিয়া এক ধমক দিলেন। গৈরিকধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়াই বোধ হয় সাহেব ধমকাইয়াছিলেন, কারণ রেলে এইরূপ অনেক সন্ন্যাসী যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং গুঁতাগাঁতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান ; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিল। বুঝিলেন এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছেন। স্বামিজী তাঁহার অভদ্র আচরণে চক্ষু আরক্ত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "'তুম্ তুম্' কচ্ছ কাকে ? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছ অথচ কি করে কথা বলতে হয় জান না ? 'আপ' বলতে পার না ?"

টিকিট কলেক্টর তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও তীব্র ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া থতমত খাইয়া গেল ; বলিল, "অন্যায় হয়েছে, আমি ও ভাষাটা (হিন্দী) ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটাকে—"স্বামিজীর আর সহ্য হইল না ; বজ্রনাদে কহিলেন, "তুমি এই বল্লে দেশী ভাষা জান না, এখন দেখছি তুমি তোমার নিজের ভাষাটাও জান না। 'লোকটা' কি ? 'ভদ্রলোকটি' বলতে পার না ? তোমার নাম নম্বর বল, আমি তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।"

একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। সাহেব দেখিলেন বেগতিক, চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। কাজেই পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তথাপি ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, "এই শেষ বলছি, হয় তোমার নাম নম্বর দাও, নয় ত লোকে দেখুক তোমার মত কাপুরুষ আর দুনিয়ায় নেই।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্বামিজী তখন জগমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছো? এই আত্মসম্মান জ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে যায়। অন্যের নিকট নিজেদের মর্য্যাদা বজায় রাখা দরকার। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতের চেয়ে হীন নয়, কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।"

স্বামিজী জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাই পৌছিলেন ও ষ্টেশনে নামিয়াই আলাসিঙ্গা পেরুমলের দেখা পাইলেন। আলাসিঙ্গা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। খেতড়িরাজ জগমোহনকে বারবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখো, যেন স্বামিজীর কোনরূপ অসুবিধা না হয়।" তদনুসারে তিনি বোম্বাই পৌছিয়াই স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দোকানগুলিতে গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। জগমোহনকে আলখাল্লা ও পাগড়ীর জন্য বহুমূল্য রেশমী

বস্ত্রের পোষাক পরিচ্ছদাদি কিনিতে দেখিয়া স্বামিজী অনেকবার নিষেধ করিলেন। বলিলেন, একটা যে সে রকমের গেরুয়াবস্ত্র হইলেই চলিবে। কিন্তু জগমোহন তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না—স্বামিজীকে রাজোচিত বেশভূষায় ভূষিত করিয়া ও সঙ্গে বহু অর্থাদি দিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানির পেনিনসুলার নামক ষ্টিমারের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। বলিলেন, "রাজগুরু—রাজগুরুর উপযুক্ত বেশে ভ্রমণ করিবেন।"

অবশেষে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন জাহাজ ছাড়িবার কথা। স্বদেশ ও স্বজন ছাড়িয়া বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার পূর্ব্বে মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা স্বামীজি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই; এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। বন্ধুদিগের অনুরোধে তিনি একটি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ ও গৈরিক পাগড়ী পরিধান করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে বেশে তাঁহাকে একজন দেশীয় রাজা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর তখন বিভিন্ন চিন্তায় দগ্ধ ও বিবিধ ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। সকলেরই ভিতরে কি একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব। এ ছাড়াছাড়িতে যেন প্রাণের বাঁধনে টান পড়িতেছে। জগমোহনজী ও আলাসিঙ্গা জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির উপরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন ও শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তারপর ঢং ঢং করিয়া জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। সেই সঙ্গে সকলেরই প্রাণের ভিতর যেন আঘাত পড়িতে লাগিল। হৃদয়দ্বার ভেদ করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল। জগমোহন ও আলাসিঙ্গা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া স্বামিজীর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন ও জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, তারপর ব্যাকুল হৃদয়ে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, বরাহনগরের মঠ ও গুরুভাইদের কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ সমগ্র দেশ, দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা, প্রাচীন মহত্ত্ব, বর্ত্তমান দুঃখ ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল।

তাঁহার যে বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না, কারণ স্বামিজী আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্য অনেকবার নিজ নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজেকে 'বিবিদিষানন্দ', কখনও 'সচ্চিদানন্দ', কখনও বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন, অবশেষে খেতড়ীর রাজার একান্ত অনুরোধে বিবেকানন্দ নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।

সমুদ্র-পথে

জাহাজে উঠিয়া স্বামিজী প্রথম প্রথম জিনিষপত্র লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। কৌপীন-মাত্র-সহায় সন্ন্যাসীর পক্ষে ট্রাঙ্ক, পোর্টম্যান্টো, বিছানাপত্র প্রভৃতি সামলান যেন একটা মহা হাঙ্গামা। যাহা হউক তিনি ক্রমশঃ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই অন্যান্য যাত্রীদের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন। সকলেই এই উজ্জ্বলবদন, গৈরিকধারী মৃগেন্দ্র-তুল্য বিচরণশীল বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে প্রীতির সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন সাহেবও মাঝে মাঝে সময় পাইলে তাঁহার নিকট আসিয়া গল্পগুজব করিতেন ও এঞ্জিনের কলকব্জা হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজের প্রত্যেক স্থান ও প্রতি বিষয় তাঁহাকে যত্নসহকারে দেখাইতেন বা বুঝাইতেন। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভিন্ন দেশবাসী। স্বামিজী এই সকল বিদেশীয় লোকদিগের সহিত কি করিয়া চলাফেরা করিতে হয় প্রথমে তাহা কিছুই জানিতেন না, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই সব শিখিয়া লইলেন। কয়েকজন যাত্রীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও জন্মিল, তাঁহাদের মধ্যে জনকতক ছিলেন জার্ম্মান।

সপ্তাহকাল মধ্যে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌছিল এবং সারাদিন সেখানে রহিল। এই সুযোগে স্বামিজী জাহাজ হইতে নামিয়া সহর দেখিতে গেলেন এবং বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের বিস্তর প্রতিকৃতির মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাণলাভকালীন একটি বিরাট অর্দ্ধশায়িত মূর্ত্তি তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। তিনি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা না

জানায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র কান্দী সহর কলম্বো হইতে ৮০ মাইল দূর। স্বামিজীর সেখানেও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিয়া হইয়া উঠিল না। তিনি দেখিলেন পুরোহিত সম্প্রদায় ব্যতীত সিংহলের স্ত্রী-পুরুষ সকল বৌদ্ধ গৃহস্থই মৎস্য-মাংসভোজী এবং তাহাদের পরিচ্ছদ ও আকৃতি মান্দ্রাজীদের মত। তিনি তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হইল উহা তামিলের অনুরূপ।

ইহার পর জাহাজ মালয়ের রাজধানী পেনাংএ গিয়া থামিল। পেনাং খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে তাহারা বিখ্যাত জলদস্যু ছিল ও বণিক্‌কুলের ভীতি উৎপাদন করিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালের রণতরীস্থিত বৃহৎ বৃহৎ কামানের ভয়ে তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে।

পেনাং হইতে সিঙ্গাপুর। পথে যাইতে যাইতে কাপ্তেন সাহেব সুমাত্রাদ্বীপের উচ্চ পর্ব্বতগুলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে বোম্বেটিয়াদিগের আড্ডা ছিল। সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া স্বামিজী বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে গেলেন। তথায় বিবিধ তালজাতীয় বৃক্ষ (Palm) ও পান্থপাদপ (Traveller's Palm) অপর্য্যাপ্ত। মান্দ্রাজের ন্যায় এই স্থানও বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু এখানকার লোকেরা মন্দ্রাজীদিগের অপেক্ষা অনেক ফরসা। সিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর যাদুঘর আছে।

তারপর জাহাজ হংকং বন্দরে পৌঁছিল। ইহার বিবরণ স্বামিজী যেরূপ দিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হংকংএ আসিলে বুঝা যায় এইবার সত্যই চীনে আসিয়াছি—চীনের

ভাব এখান হইতেই এত অধিক। দেখা যায় সকল কার্য্য, ব্যবসা-বাণিজ্য চীনাদেরই হাতে। যেই জাহাজ কিনারায় নজর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলির একটু বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। হালে প্রায় মাঝির স্ত্রী বসিয়া থাকে এবং একটি হাল হাত দিয়া ও অপরটি পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার পিঠে একটী কচি ছেলে বাঁধা, অথচ সে তাহার হাত পা বেশ নাড়িতেছে। দেখিতে বড় মজা। চীনে খোকা মায়ের পিঠে দিব্যি নড়িতেছে চড়িতেছে, মা ওদিকে প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালাইতেছে, ভারী ভারী বোঝা সরাইতেছে কিংবা খুব ক্ষিপ্রতার সহিত এক নৌকা হইতে আর এক নৌকায় লাফাইয়া যাইতেছে। নৌকা ও ষ্টীমারের এত ভিড় যে প্রতিমুহূর্ত্তেই টিকিসমেত চীনে খোকার মাথাটি একেবারে গুঁড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খোকার কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। সে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোনও ধার ধারে না। কর্ম্মোন্মত্তা মাতা তাহাকে মাঝে মাঝে দুই এক টুকরা পিঠা দিতেছে, সে তাহারই রসাস্বাদনে রত !

"চৈনিক শিশুকে দার্শনিক বলিলেই হয়। কারণ আমাদের দেশের শিশু যখন ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখে না সেই বয়সে সে দিব্যি কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় ঘোরে ফিরে। অভাব যে কি বস্তু তাহা ঐ বয়সেই তাহার বোধগম্য হইয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতার সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের পেষণে সে আর কিছু ভাবিবার অবসর পায় না।

"হংকং বড় সুন্দর সহর—কতকটা পর্ব্বতের পার্শ্বভাগে ও কতক উপরিভাগে অবস্থিত—উপরের অংশটি বেশ শীতল। ট্রাম পাহাড়ের গা বাহিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া থাকে এবং বাষ্প ও তারের দড়ির সাহায্যে চলে।

"আমরা হংকংএ তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলাম। হংকং হইতে একটি নদীর উৎপত্তি স্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যাণ্টনে যাওয়া যায়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একটি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পৌঁছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়া যাইবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রহিয়াছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর ও বৃহৎ, বাস্তবিক সেগুলি দোতালা তিনতালা বাড়ীর মত, আবার চারিদিকে বারাণ্ডা দেওয়া। বাড়ীগুলি সব জলে ভাসিতেছে, অথচ তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াতের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

"আমরা যেখানে নামিলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত —এখানে অগণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, জীবন সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকলরব—মহাব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই

হউক, আমি ইহার মত নোংরা সহর দেখি নাই—তবে ভারতবর্ষে কোন সহরকে নোংরা বলিলে যাহা বুঝায় সে হিসাবে নয়, কারণ চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না! আমি বলিতেছি চীনেদের গা হইতে যে বিষম দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহারই কথা। তাহারা যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কখন স্নান করিবে না। বাড়ীগুলি সব এক একটি দোকান—লোকেরা উপর তলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে চলিতে গেলেই দুধারের দোকানে গা ঠেকিয়া যায়। দশ পা চলিতে না চলিতে মাংসের দোকান চোখে পড়ে। এমন দোকানও আছে যেখানে কুকুর-বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়—অবশ্য খুব গরিবেরাই কুকুর-বিড়াল খায়।

"আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, কেউ কখন তাহাদের দেখিতে পায় না, চীনা মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বাহির হয়। ইহাদের মধ্যেই দেখা যায় এক একটি স্ত্রীলোকের পা আমাদের দেশের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট—তারা হাঁটিয়া বেড়াইতেছে ঠিক বলা যায় না—খোঁড়াইয়া থপ্ থপ্ করিয়া চলিয়াছে।"

ক্যাণ্টনে স্বামিজী কতকগুলি চীনা মন্দির দেখিলেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটিই প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমূর্ত্তি, তন্নিম্নে সম্রাটের ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে পাঁচশত প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণকারীর মূর্ত্তি কাষ্ঠে ক্ষোদিত। স্বামিজী এই সকল কাষ্ঠের কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত ভারতের বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত স্থাপত্যশিল্পের অনেক সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিলেন। ক্যাণ্টনে চীনবাসীদের কার্য্যদক্ষতা ও

অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি প্রায় বলিতেন, "এই বার চীনের উঠিবার পালা।"

ক্যাণ্টনে স্বামিজী একটি চীনে-মঠ দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইলেন। কিন্তু ঐ সকল মঠ এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি পথ-প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সে ব্যক্তি বলিল 'অসম্ভব'। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা যেন আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, যদি কোন বিদেশী মঠের মধ্যে গিয়া পড়ে তাহলে কি হয়?" "মঠবাসীরা তাহার উপর বিষম অত্যাচার করে।" স্বামিজীর মনে হইল বোধ হয় হিন্দু সাধু বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিবেন না। এই মনে করিয়া তিনি দ্বিভাষী ও জার্ম্মান সহচরদিগকে ঐরূপ একটি মঠে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা চলই না কেন, গিয়া দেখি তাহারা আমাদের খুন করিয়া ফেলে, কি, কি করে।" এই বলিয়া তাঁহারা একটি মঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দ্বিভাষী চীৎকার করিয়া বলিল, "পালান, পালান, ঐ দেখুন কতকগুলি লোক তেড়ে আস্ছে।" বাস্তবিক দেখা গেল তিন চারিজন লোক প্রকাণ্ড মোটা মোটা লাঠি হাতে লইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জার্ম্মান সঙ্গীরা ত দেখিয়াই ছুট্! দ্বিভাষীও পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু স্বামিজী তাহার হাত টানিয়া ধরিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাপু, পালাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বলে যেতে হবে চীনা ভাষায় ভারতবর্ষীয় 'যোগী'কে কি বলে।" লোকটা কথাটি বলিয়া দিয়াই দৌড়াইল, ওদিকে জগাই-মাধাইয়ের

দলও প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। স্বামিজী দূর হইতে চীৎকার করিয়া নিজেকে একজন 'যোগী' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। 'যোগী' শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রবৎ কার্য্য হইল। লোক-গুলি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল ও যুক্তকরে বারংবার প্রণাম করিয়া কি সব বলিতে লাগিল। তাহার মধ্যে একটি কথা স্বামিজী বুঝিতে পারিলেন—'কবচ'। তাঁহার বোধ হইল ওটা আমাদেরই দেশী কথা 'কবচ'। কিন্তু আরও নিশ্চয় হইবার জন্য দূরে দণ্ডায়মান দ্বিভাষীকে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবচ শব্দের অর্থ কি?" উত্তরে সে যাহা বলিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন কবচ শব্দে আমাদের দেশে যাহা বুঝায় ও দেশেও তাহাই—অর্থাৎ রক্ষাকবচ, এবং ঐ লোকগুলি তাঁহার নিকট ভূতপ্রেত হইতে আত্মরক্ষার্থ কোনরূপ মন্ত্রপূত কবচ চাহিতেছে। স্বামিজী এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া লইলেন, তার পর পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ছোট ছোট টুকরা করিলেন ও তাহার প্রত্যেকটিতে সংস্কৃত অক্ষরে 'ওঁ' এই কথাটি লিখিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহারা কৃতজ্ঞতাভরে কাগজগুলি মাথায় ঠেকাইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর তাঁহাকে মঠ দেখাইবার জন্য ভিতরে লইয়া গেল।

মঠ বাড়ীটির অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে একটি গৃহমধ্যে স্বামিজী অনেকগুলি হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইগুলি সব প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের স্মৃতিমন্দিরের অভ্যন্তরে যে পাঁচশত বৌদ্ধের দারুময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখের

আকৃতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া ও চীন দেশের প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, এক সময়ে চীন ও বঙ্গদেশের মধ্যে বেশ জানাশুনা ছিল ও বাঙ্গালী ভিক্ষুরা চীনে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় সভ্যতার অনেকটা ছাপ চৈনিক সভ্যতার উপর পড়িয়াছিল। মোটের উপর ক্যাণ্টন সহর দেখিয়া স্বামিজীর বেশ ভাল লাগিয়াছিল ও তিনি অনেক নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্যাণ্টন হইতে তিনি আবার হংকংএ ফিরিলেন ও তথা হইতে জাপানে পৌছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে জাহাজ কিছুক্ষণের জন্য নাগাসাকি বন্দরে লাগিল। স্বামিজী সহরভ্রমণে বহির্গত হইলেন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাপানী জাতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহার অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি চওড়া, সিধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। বাড়ীগুলি দিব্যি ছোট ছোট খাঁচার মত। প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু-বৃক্ষে-ঢাকা চির হরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি—খর্ব্বকায় সুশ্রী অদ্ভুতবেশী জাপগণ—তাহাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী—সবই সুন্দর। সমগ্র দেশটি যেন একখানি ছবি। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বাগান—জাপানী ধরণে সুন্দরভাবে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয় ও ছোট ছোট পাথরের সাঁকো।"

নাগাসাকি হইতে জাহাজ কোবি (Kobe) তে পৌছিল।

এখানে স্বামিজী জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে জাপানের মধ্য দিয়া ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত গেলেন। পথে ওসাকা, পূর্ব্বরাজধানী কিয়োটো ও বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও দেখিলেন। টোকিওর আয়তন ও লোকসংখ্যা কলিকাতার দ্বিগুণ। বৈদেশিক ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না। স্বামিজী এখানে অনেকগুলি মন্দির দেখিলেন—তাহার প্রত্যেকটিরই গাত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র খোদিত। বর্ত্তমানে পুরোহিতদিগের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও সংস্কৃতজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়—তবে তাঁহারা বেশ বুদ্ধিমান এবং তাঁহাদের মধ্যেও আধুনিক উন্নতির ভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই ইয়োকোহামা হইতে তিনি মান্দ্রাজী বন্ধুদিগকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জাপানীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"বর্ত্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন তাহা জাপানীরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহাদের সৈন্যসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত এবং তাহারা তাহাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের কামানগুলি দেশীয় কারিগরের প্রস্তুত। জাপানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের যে অভাব নাই তাহার প্রমাণ তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে—তাহার কোন কোনটা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদিগের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবং যে কোন দ্রব্যের অভাব বোধ করিতেছে তাহা নিজেদের শিল্পিদ্বারা প্রস্তুত করাইতেছে। জাপানী দেশলাইয়ের কারখানা একটি দেখিবার বস্তু। ইহাদের নিজেদের একটি ষ্টীমার লাইন আছে, উহার জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত

করে। ইহা ছাড়া তাহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে আর একটি লাইন খুলিবার মতলব করিয়াছে।"

উপরোক্ত পত্রে ভারতবাসীদের জড়তা ও আত্মোন্নতিচেষ্টার একান্ত অভাব স্মরণ করিয়া তিনি মান্দ্রাজী যুবকদের যে উদ্দীপনাপূর্ণ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। উহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু মূল পত্রখানি অতি সুন্দর।

"জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি কচ্ছ? না, সারাজীবন কেবল বাজে বকছো। এসো এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাহিরে গেলে তোমাদের জাত যায়—এমন আহাম্মক জাত! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় কচ্ছ! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি! আর কচ্ছই বা কি? * * * বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কচ্ছ—ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর

তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে রয়েছে ; না হয় খুব জোর একটা দুষ্টু উকিল হবার মতলব কচ্ছ—ইহাই ভারতীয় যুবকের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ! আবার প্রত্যেক ছাত্রের পায়ে পায়ে এক পাল ছেলে-মেয়ে 'বাবা, খাবার দাও, বাবা, খাবার দাও,' বলে হাঁসের মত প্যাঁক্ প্যাঁক কচ্ছে ! ! ! বলি, সমুদ্রে ত যথেষ্ট জল আছে—তোমরা কেতাব, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সবশুদ্ধ তাতে ডুবে মর্ত্তে পার না ? * * *

"এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে ! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস ? দেশকে ভালবাস ? তা হলে এস, ভাল হবার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক, তবুও পেছনে চেয়োনা—কেবল সামনে এগিয়ে যাও।

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই প্রাণস্পন্দহীন সভ্যতাকে ভাঙ্গবার জন্যই ইংরাজ রাজশক্তিকে এদেশে প্রেরণ করেছেন আর মান্দ্রাজের লোকই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজদিগকে এদেশে আশ্রয় প্রদান করেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত ?—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত্ত বদনে অন্নদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অত্যাচারে যারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ? * * *"

ইয়োকোহামা হইতে স্বামিজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে প্রাচ্য-জগৎ ছাড়িয়া প্রতীচ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ দিনগুলি সাগর দর্শনে ও ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়নে কাটিয়া গেল।

আমেরিকায় প্রথম কয়দিন

প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজ বঙ্কুবর পৌঁছিল। বঙ্কুবর কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্তমহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানকার প্রধান নগরের নামও বঙ্কুবর। তথা হইতে কানাডা-প্যাসিফিক রেল লাইন আরম্ভ হইয়াছে। পথে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আসিবার সময়ে স্বামিজী শীতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন. কারণ যদিও জগমোহনজী প্রভৃতি আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে কাপড়-চোপড় যথেষ্ট দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে, গ্রীষ্মের সময় সমুদ্রবক্ষে শীত ভোগ করিতে হইবে; সেইজন্য তাঁহার সহিত একখানিও শীতবস্ত্র ছিল না।

যাহা হউক কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে ট্রেণে কানাডার মধ্য দিয়া তিনি চিকাগোয় পৌঁছিলেন। ট্রেণ সুবিখ্যাত রকিপাহাড় ভেদ করিয়া চলিল; স্বামিজী চতুষ্পার্শ্বের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

চিকাগোয় পৌঁছিয়া স্বামিজীর অবস্থা কিরূপ হইল, পাঠক কি অনুমান করিতে পারিতেছেন? তখন চিকাগোয় বিশ্বমেলা (World's Fair) নামক এক বিরাট মেলা বসিয়াছে। জগতের নানা স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি ও লোকের গাঁদি। তাহার মধ্যে স্বামিজীর পরিচিত একটি লোকও নাই। তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহাও কিছু ঠিক হয় নাই। এদিকে তাঁহার অদ্ভুত

রকমের বেশ দেখিয়া সকলেই ঘন ঘন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—কেহ কেহ বিদ্রূপও করিল, কেহ হাততালি দিল, ছোঁড়ার দল তাঁহার পাছু লইল ও নানা প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি একে শীতে, অনাহারে জর্জ্জরিত, তাহার উপর এই সকল উৎপাত আরম্ভ হইল। জিনিষপত্র লইয়া পথচলা তাঁহার কোনকালে অভ্যাস ছিল না। সুতরাং সেগুলিকে লইয়াও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। পথে মুটেরা যে যেরূপ পারিল ঠকাইতে লাগিল—যেখানে চারি আনার বেশী খরচ হইবার কথা নহে সেখানে তাঁহার নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিল। এইরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি অবশেষে একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হোটেলের লোকেরা বুঝাইয়া দিল যে এ অবস্থায় হোটেলে থাকাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তিনিও দেখিলেন কথাটা ঠিক। সুতরাং আপাততঃ সেইখানেই উঠিলেন।

চিকাগোয় তিনি ১২ দিন রহিলেন ও প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার, বিপুল আয়োজন—পাশ্চাত্য জগতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, যা-কিছু ভাল, যা-কিছু দর্শনীয় সব সেখানে একত্রিত হইয়াছে—দেশে থাকিতে এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি অস্ফুট ছিল; এক্ষণে তিনি দেখিলেন পাশ্চাত্যের ধন দৌলত ও সভ্যতাগৌরব কল্পনার অতীত।

কিন্তু এত লোকের মধ্যেও তিনি যেন নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ সেখানে একজনও পরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন না। তারপর আর এক বিপদ। আমেরিকা ধনীর দেশ—সেখানে খরচপত্র ভয়ানক রকম। হোটেলের খরচ স্বামিজীর পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এখানে আর কিছু দিন থাকিলেই তাঁহার সম্বল ফুরাইবে। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া

বিষম চিন্তিত হইলেন। মন দমিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন এদেশে আসিয়া ভাল করি নাই। এরূপ ভাবিবার আরও কারণ ছিল। একদিন মেলার অন্তর্গত সংবাদপ্রাপ্তির স্থানে (Information Bureau) ধর্ম্ম মহাসভা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলেন, সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সভার অধিবেশন হইবে না, এবং ভালরূপ পরিচয়াদি না থাকিলেও কেহ সভার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না—আর তাছাড়া প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তখন জুলাই মাস—স্বামিজী দেখিলেন সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে তাঁহার অর্থের অভাব ঘটিবে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে আমেরিকার বিদ্বান ও শিক্ষিত লোকের অনেকেই গ্রীষ্মকাল বলিয়া সহর ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে এখন কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আর অপেক্ষা করিয়াই বা কি লাভ? যে আশায় তিনি এতদূর আসিয়াছেন, তাহাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এখন ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—স্থির করিলেন, যেরূপেই হউক শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইবেন। লোকপরম্পরায় তিনি শুনিলেন যে চিকাগো অপেক্ষা বোষ্টনে খরচপত্র ঢের কম পড়ে, আর বোষ্টন শিক্ষিত লোকদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র। স্বামিজী স্থির করিলেন, আপাততঃ কিছু দিন বোষ্টনে গিয়া থাকা যাউক, তার পর যাহা হয় হইবে।

এই স্থির করিয়া তিনি বোষ্টন যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে ভগবান তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রেলে যাইতে যাইতে বোষ্টনের সন্নিকটস্থ ব্রিজি মেডোস নামক গ্রামের এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বৃদ্ধা তাঁহাকে আপন আলয়ে কিছুদিন

থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি লোকও মন্দ ছিলেন না। তবে স্বামিজীকে নিজ গৃহে লইয়া যাওয়ার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখান—প্রাচ্য দেশবাসী জীব কিরূপ অদ্ভুত। দ্বিতীয়তঃ, স্বামিজী একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ওদেশে গিয়াছেন—সে ধর্ম্মই বা কিরূপ তাহাও দেখা।

যাহা হউক বৃদ্ধার গৃহে থাকাতে স্বামিজীর আর কিছু না হউক এক বিষয়ে খুব সুবিধা হইল। চিকাগোয় তাঁহার যে প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া খরচ হইতেছিল, সেটা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু তথাপি আর একটা মোটা খরচ ছিল—সেটি হইতেছে পোষাক প্রস্তুতের খরচ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামিজীর অদ্ভুত রকমের পোষাক দেখিয়া রাস্তায় শত শত লোক জমিয়া যাইত। সুতরাং তিনি দেখিলেন এ পোষাক এ দেশে চলিবে না। তারপর সম্মুখে শীত আসিতেছে, সেজন্য গরম পোষাক প্রস্তুত করান দরকার। ওখানকার মহিলা বন্ধুরাও পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার পাদ্রীদের মত কাল রং-এর লম্বা জামা পরা উচিত, কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিলেই হইবে। তিনি দেখিলেন যে চলনসই গোছের একটা পোষাক করিতেও ৩০০৲ টাকার উপর খরচ পড়িবে। কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই। সে সময়ে সালেম বলিয়া নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে এক বৃহৎ মহিলা সভা তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের রমা বাইকে খুব সাহায্য করিতেছিলেন। স্বামিজী দেখিলেন ওদেশে মহিলাদের যেরূপ প্রভাব তাহাতে এই সভা ও এরূপ অন্যান্য সভার সহিত পরিচিত হইতে

পারিলে তাঁহার কার্য্যের খুব সুবিধা হইতে পারে এবং চাই কি তাঁহার আমেরিকা আগমনের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে।

আসিবার সময় তিনি ১৭৯ পাউণ্ড (প্রায় ২৭০০৲ টাকা) লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিজি মেডোজ হইতে ২০শে আগষ্ট (১৮৯৩) মান্দ্রাজের শিষ্যদিগকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার হাতে তখন ১৩০ পাউণ্ড ছিল; তবে ঐ পত্র ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। বিদেশে হস্তে অর্থ না থাকিলে বা সঙ্গের সম্বল ফুরাইবার মত হইলে কাহার প্রাণে না ভয় হয়? প্রথম প্রথম স্বামিজীরও ঐরূপ ভয় হইয়াছিল। তাই পত্রে দেখি, তিনি লিখিতেছেন, "যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমায় ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতোমধ্যে আমিও যে কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি—তৎক্ষণাৎ তার করিব। * * * যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতোমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয় আমি লিখিব বা তার করিব। এদেশ থেকে তার করিতে প্রতি শব্দে ৪৲ টাকা পড়ে।" * কিন্তু এই বিপদ ও নৈরাশ্যে ক্ষণিক বিচলিত

* এই চিঠিখানিতেই কিন্তু তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, 'আমি সহজে ছাড়িব না, কারণ আমি শ্রীভগবানের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছি।' ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে এই সময়ে তিনি মহাসভায় প্রবেশ লাভ করিবার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে অন্য কোনরূপে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম

হইলেও তিনি হৃদয়ের বল হারান নাই। অন্য লোক হইলে এরূপ অবস্থায় কি করিত জানি না। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইলেও শীঘ্রই অসাধারণ প্রতিভা ও ধৈর্য্যবলে আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে সকল বিষয়ের সুবিধা হইয়া আসিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমশঃ আমেরিকার বিশিষ্ট ও মান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। ইহার মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে, এইচ্, রাইট মহোদয় তাঁহার সহিত একদিন চারি ঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া তাঁহার অত্যদ্ভুত বিদ্যা, জ্ঞান ও প্রতিভা দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, আমেরিকান জাতির সহিত পরিচয় লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। স্বামিজী এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যে যে অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহা রাইট সাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। প্রধান অন্তরায় এই যে তাঁহাকে কেহ চিনে না শুনে না এবং তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি, এরূপ কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট নাই। রাইট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "স্বামীজি, আপনার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্য্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" তারপর তিনি নিজে স্বামিজীকে ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত করিবার জন্য যে যে বন্দোবস্ত করা আবশ্যক তাহার ভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার সহিত উক্ত সভায় অনেক বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জানাশুনা

প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন এরূপ সংকল্প করিতেছিলেন। যদি আমেরিকায় না হয় অন্ততঃ ইংলণ্ডে যাইবেন।

ছিল। তাহা ছাড়া প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-সভার সভাপতি তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে তিনি লিখিলেন, "ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করিলেও ইঁহার বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।" তারপর স্বামিজীর নিকট অধিক অর্থ নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি চিকাগোর একখানি টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং প্রাচ্য দেশের প্রতি-নিধিগণের থাকিবার ও আহারাদির ব্যবস্থা করার ভার যে কমিটির উপর ছিল, তাহাদের নিকট পত্র দিলেন। স্বামিজী তাঁহার উপর ঈশ্বরের অপার করুণা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইলেন।

কিন্তু যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্ব্বে সময়ে সময়ে দিঙ্মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামিজীর বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বামিজী চিকাগোয় যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিলে একজন ধনী বণিকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বণিক তাঁহাকে চিকাগোর কোন্ স্থানে যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিবেন বলিয়া-ছিলেন, কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ সে কথা বিস্মৃত হইয়া স্বামিজীকে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। এই বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। রাইট সাহেব মহাসভার কার্য্যস্থলের যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, স্বামিজী দেখিলেন তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং চিকাগোতে নামিয়া তিনি আবার দিশেহারা হইয়া পড়িলেন, কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না—দু-চার জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। চিকাগো প্রকাণ্ড সহর, কে কাহার

খবর রাখে!, তাহার উপর এ জায়গাটা সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিক—কেবল জার্ম্মাণদিগের বাস। তাহারা ত স্বামিজীর কথাই বুঝিতে পারিল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কাফ্রী বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তিনি মহা ফাঁপরে পড়িলেন, কোন লোক তাঁহাকে একটা হোটেল পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিল না। অগত্যা তিনি নিরাশভাবে রেলের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে শুইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত রাত্রি জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই ভাবে কাটাইয়া দিলেন। হায়, বিধাতার লীলা বুঝা ভার! দুই দিন পরে সমস্ত আমেরিকার লোক যাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে, আজ তাঁহার এ কি দশা! যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি হ্রদোপকূলবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। সে রাস্তায় ক্রোড়পতিদিগের প্রাসাদ। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ত চিরদিন ভিক্ষুক! ইহাতে আর লজ্জা কি? কিন্তু এ তো আর ভারতবর্ষ নহে যে সাধু-ফকির দেখিলেই লোকে তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে! ক্রোড়পতির ভৃত্যেরা তাঁহার মলিন বস্ত্র ও শ্রান্ত ক্লান্ত ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাড়াইয়া দিল। কেহ কেহ অপমানও করিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। "ওগো ভিক্ষা না দাও, ধর্ম্মমহাসভা-কার্য্যালয়ের ঠিকানাটা ত বলিয়া দাও।" কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তিনি অবসন্নহৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সম্মুখের সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে এক রমণী নির্গত হইয়া আসিলেন এবং স্বামিজীকে তদবস্থায় দেখিয়া সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ধর্ম্মমহাসভার একজন

প্রতিনিধি?" স্বামিজী বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে, কিন্তু আমি ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি।" রমণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিলেন, ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যদিগকে স্বামিজীর যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতে আদেশ দিলেন এবং আহারাদির পর শরীর সুস্থ হইলে স্বামিজীকে লইয়া স্বয়ং ধর্ম্মসভার কার্য্যস্থলে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বামিজী বিধাতার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি এই মাতৃরূপিণী রমণীর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সন্তানাদির সহিত বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রমণী মিঃ জর্জ্জ, ডব্লিউ, হেল্ নামক চিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী।

এই ঘটনায় স্বামিজীর দৃঢ় প্রতীতি হইল, প্রভু অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

তারপর যথাকালে মিসেস্ হেল তাঁহাকে লইয়া মহাসভার কার্য্যালয়ে গমন করিলেন। স্বামিজী তাঁহার পরিচয়-পত্র দেখাইয়া প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন এবং মহাসভার অন্যান্য প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের সহিত একত্র থাকিতে পাইলেন।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘটিকার সময় চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। এই সভা নানা কারণে জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বামিজী স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন—

"চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সে সভায় নানাদেশের ধর্ম্ম-প্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা, প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার-বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খৃষ্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্ব-মহিমা-কীর্ত্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন…"।—("ভাব্‌বার কথা")

প্রকৃতই চিকাগো মহাসভায় সভ্যজগতের বিদ্বৎসমাজাদৃত অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন এবং প্রথমে এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক পরিণামে ইহা অতি অদ্ভুত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও মহা-ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহাতে পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার তুলনা করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে এক নূতন চিন্তাতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। একথা এখন সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মহাসভার পর হইতে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মদৃষ্টি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছে। উক্ত সভার বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতি মাননীয় মিঃ মারউইন মেরী স্নেল লিখিয়াছেন—

"মহাসভা হইতে খৃষ্টীয় জগৎ, বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা এই একটি মুখ্য ফল ও মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত জগতে আরও এমন বহু বরণীয় ধর্ম্ম আছে, যেগুলি দার্শনিক গভীরতা, তত্ত্বানুপ্রবেশ, স্বাধীন ও সতেজ চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বজীবের প্রতি মনুষ্যোচিত উদারতা ও অকপট মমতায় খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অথচ যাহাদের নীতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকারিতা খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা এক তিল ন্যূন নহে। সভায় এইরূপ আটটি খৃষ্টেতর ধর্ম্মের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন; যথা—হিন্দুধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, য়াহুদীধর্ম্ম, কংফুছোর ধর্ম্ম, শিন্তোধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও পারসিক ধর্ম্ম।"

উক্ত চিরস্মরণীয় সোমবার দিবস চিকাগোর শিল্পপ্রাসাদ (Art Institute) নামক ভবনের সুবৃহৎ হলে (Hall of Columbus) এই সভার অধিবেশন হইল। প্রথমে ডাঃ ব্যারোজ মহোদয় দুই চারিটি কথা বলিয়া সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে যথারীতি ভগবৎ-প্রার্থনা-পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সে এক গম্ভীর দৃশ্য! মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত একশত বিশ কোটী নরনারীর প্রতিনিধিরূপে প্রায় ছয় সাত সহস্র মহামহাপণ্ডিত সে স্থানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া পাশ্চাত্যজগতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মনায়ক কার্ডিনাল গিবন্স—তাঁহার বামে ও দক্ষিণে উপবিষ্ট বিচিত্রবেশী প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিগণ। বিবেকানন্দও ইঁহাদের মধ্যে একজন—তাঁহার অঙ্গের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের আংরাখা, মস্তকের প্রকাণ্ড গৈরিক উষ্ণীষ ও মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দীপ্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; তাঁহার পার্শ্বে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপ মজুমদার ও নাগরকার এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল; ইহা ছাড়া রোমান ক্যাথলিকদলের শত শত

আর্কবিশপ, বিশপ, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মযাজক এবং জগতের প্রধান প্রধান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতমণ্ডলী। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের আয়োজন করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল এবং এই সভায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, ইহা হইতেই পাঠক এই ব্যাপারের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বিবেকানন্দের স্থান ত্রিশ জনের পর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপ বিপুলায়তন জনসভার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে অতি বড় বক্তারও হৃৎকম্প হওয়া বিচিত্র নহে। সেক্ষেত্রে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক নগণ্য বিদেশী যুবকের পক্ষে উপরোক্ত সভার সম্মুখীন হওয়া কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য পাঠক একবার অনুমান করুন। স্বামিজী ব্যাপারটাকে প্রথমে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহা তত সহজ নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি সঙ্কোচবশতঃ বলিলেন, “না, এখন নহে।” এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহাকে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই ‘এখন নহে’ বলিয়া কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সভাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না যে তিনি আর বক্তৃতা করিবেন। অবশেষে অপরাহ্নের শেষমুহূর্ত্তে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, এইবার উঠিতেই হইবে নতুবা তাঁহাকে আর সময় দেওয়া হইবে না। তখন স্বামিজী আর নিশ্চেষ্ট থাকা অবিধেয় বিবেচনায় আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল তখন রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। তিনি একবার সেই বিশাল জনসঙ্ঘের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নেত্রপাত করিলেন, তারপর দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে প্রণামপূর্ব্বক সভাস্থ

নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'Sisters and Brothers of America' (আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!)। যেমন এই কয়টি কথা উচ্চারণ করা, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মহাশব্দে করতালি-নিনাদ আরম্ভ হইল। সে শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম! সকলেই প্রচলিত পন্থানুসারে Ladies and Gentlemen (ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ) বলিয়া সমবেত সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই নূতন সম্বোধনে যেন সকলের হৃদয়ের সহিত বক্তার হৃদয়নিহিত অপূর্ব্ব প্রেমভাবের সংযোগ-সাধন হইল। তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র মানবজাতির একত্ব অনুভব করিলেন। সেই উৎসাহস্রোত থামিতে চাহে না। শত শত লোক দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড করতালিনিনাদে গৃহভিত্তি কম্পিত করিয়া তুলিল। স্বামিজী ত কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ কি হইল! লোকগুলি কি ক্ষেপিয়া গেল নাকি? তিনি এক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধিপ্রায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হইল সবই আদ্যাশক্তির লীলা, বুঝিলেন মহাশক্তি স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। অমনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহস ফিরিয়া আসিল, অন্তর শতগুণ বলে ভরিয়া উঠিল, হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া বক্তৃতার উৎস ছুটিল। কিন্তু প্রথম দুই মিনিট তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ থামাইতে পারিলেন না। তারপর যখন সকলে স্থির হইল তখন তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আপনার বক্তব্য শেষ করিলেন। প্রথম দিন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার ন্যায় উদার, বিশ্বজনীন ভাব কোন বক্তৃতায় লক্ষিত হয় নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক দুই চারি কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর বক্তৃতায়

সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "সকল ধর্ম্মের গন্তব্য স্থান এক।" তিনি ধর্ম্মের যে বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব পরমহংসদেবের চরণোপান্তে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই সেদিন সুপরিস্ফুটভাবে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভার অধিকাংশ লোক তাঁহার অনুরাগী ও তদীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী তাঁহার পদানত হইল। জগতের ইতিহাসে বিনা রক্তপাতে এরূপ অদ্ভুত বিজয়লাভের কাহিনী আর কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু একজন কপর্দ্দকশূন্য, নিঃসহায় তরুণ সন্ন্যাসী ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকিত পৃথিবীতে সে অসাধ্যও সাধন করিলেন।

প্রথম দিন বক্তৃতার পর "আমাদিগের মধ্যে মতভেদ কেন?" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ব্যতীত স্বামিজী ১৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে আর কোন বক্তৃতা দেন নাই। ১৯শে তারিখে তিনি তাঁহার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইহাতে ধর্ম্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সারভাগ অতি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হইয়াছিল। স্বামিজী ব্যতীত সভায় অন্য ভারতবাসী বা বাঙ্গালী কেহ যে ছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু একমাত্র তিনিই প্রকৃত সর্ব্ববাদিসম্মত, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্রস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিসকলের বহু ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন করিলেন। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—

(১) মনুষ্যমাত্রেই আত্মা, সুতরাং স্বরূপতঃ মনুষ্য ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ নাই। (ইহার দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের "জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ পাপী" এই মত নিরস্ত হইয়া মনুষ্যের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইল।)

(২) সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত এবং বিশ্বপ্রসবিনী শক্তি (Cosmic Energy) মোটের উপর হ্রাসবৃদ্ধিহীন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটি সমান্তরাল রেখার ন্যায় পাশাপাশি চলিয়াছে। (ইহার দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, এই মত খণ্ডিত হইল।)

(৩) বংশপরম্পরাগত ভাব নিজ নিজ অতীত মানসিক সংস্কারের ফল। শরীরের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই। বরং চেষ্টা করিলে অতলস্পর্শ মনঃসমুদ্র আলোড়ন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী স্মৃতিপথে পুনরুদিত করা যাইতে পারে। সুতরাং জাতিস্মরতা অসম্ভব নহে। (ইহার দ্বারা পুনর্জ্জন্মবাদের আভাস প্রদত্ত হইল।)

(৪) ধর্ম্ম কেবল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, অনুভূতিসাপেক্ষ।

কিন্তু যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে এই সকল নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেও স্বামিজীর বক্তৃতায় কোন বিষদিগ্ধ সমালোচনা বা কোন ধর্ম্মের প্রতি অযথা তীব্র আক্রমণ ছিল না। সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাব পোষণ, সকলের সহিত একযোগে মানবাত্মার কল্যাণসাধন, পরস্পরের মধ্যে যাহা কিছু সৎ, শুভ ও পবিত্র তাহার আদান-প্রদান দ্বারা সকলকেই সেই এক লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তাকরণ—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তিনি তীক্ষ্ণমুখ শল্যের দ্বারা অপরকে আহত করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং স্নেহ-মধুর কণ্ঠে সকল বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ দিবসে অর্থাৎ ২৭শে তারিখে স্বামিজী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে না বা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না করিয়া অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইবে। উন্নতি বা বিকাশের নিয়মই এই।

"ধর্ম্মমহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা এই—পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ কোন ধর্ম্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে সকল ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি ও এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণসত্ত্বেও সকল ধর্ম্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, 'সমর নহে—সহায়তা!' 'বিনাশ নহে—বরণ'!! 'দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি'!!!"

তিনি কাহারও প্রাণে আঘাত করিয়া একটি কথাও বলেন নাই, বরং সকলের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি কোন দার্শনিক জটিলতার অবতারণা করেন নাই; সহজ সরল দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুবোধ্য ভাষায় আপন বক্তব্যগুলি সকলের নিকট পরিস্ফুট ও সুগম করিয়াছিলেন। আর একটি কথা—তিনি কোন মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। অপরকে জোর করিয়া নিজমত গ্রহণ করান চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এখানেও তিনি তাহার অন্যথা করেন নাই। সাধারণতঃ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর আপনাদিগের মত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন। তাঁহারা বলেন, "তাহা না হইলে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া

যায় না'' ; কিন্তু স্বামিজী ঠিক তাহার বিপরীত করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা আগাগোড়া আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বে (Spiritual Psychology) পূর্ণ ছিল। তিনি বুঝাইলেন যে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে কোন একটা মতের স্বপক্ষে মত দিলেই বা ঐ মত 'বিশ্বাস করি'—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় না, প্রকৃতপক্ষে ঐ মতানুযায়ী জীবনযাপন করিয়া ঐ মত যথার্থ কি না তাহা নিজ অনুভূতির দ্বারা জানিতে হয়। প্রথমে বিশ্বাস, পরে বোধ, অনুভূতি ও সাক্ষাৎ দর্শন। যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে সেই প্রকৃত সাধু। এইরূপে তিনি স্বীয় অলৌকিক তত্ত্বদর্শন-সাহায্যে ধর্ম্মরাজ্যের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়গুলি সকলের গোচর করিলেন।

এই বক্তৃতার ফল কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই। তবে এটা ঠিক যে ইহার পর হইতে পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ধর্ম্ম জিনিষটি সম্পূর্ণ নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। তাহা না হইলে কি আজ আমরা লণ্ডনের সেণ্টপল চার্চ্চ নামক সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরের ছায়াতলে ও আমেরিকার প্রধান প্রধান ভজনালয়ে পুনর্জন্মবাদ ও মনুষ্যের দেবত্ব বিষয়ক কথা শুনিতে পাইতাম? কখনই নহে। এ হিসাবে বলিতে পারা যায় তিনি নব্য ইউরোপী ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্মদাতা এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই প্রভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সত্য বটে, খৃষ্টধর্ম্ম জগৎ হইতে এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার উপদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-নায়কগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন এবং বহুল-পরিমাণে তাঁহার আদর্শসমূহকে ঐ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের নিকট ইহাই স্বামিজীর বক্তৃতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল নহে। আমরা দেখি, তিনি এই বক্তৃতার দ্বারা আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যজাতি ও আর্য্যভূমিকে জগতের চক্ষে উন্নত, সম্মানার্হ ও পূজাস্পদ করিয়া

তুলিয়াছেন। যে হিন্দু ভোগদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট নগণ্য ক্ষুদ্র হেয় ও লাঞ্ছনার পাত্র ছিল, তাহাকে তিনি অবমাননার পঙ্করাশির মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া মহোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। জগৎ বুঝিয়াছে—হিন্দু পদদলিত হইলেও অবজ্ঞেয় নহে, দীন-দরিদ্র হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেও পারমার্থিক সম্পদে হীন নহে, বরং অতুল্য রত্ন-রাশির অধীশ্বর, অনন্ত গৌরবের অধিকারী, বিশ্বের গুরুপদে সমাসীন হইবার যোগ্য। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন না, কিন্তু দেখাইলেন যে, ধর্ম্মের আরম্ভ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও চরম পরিণতি বেদান্তে এবং যাহা বিভিন্ন আদর্শের মধ্য দিয়া বহুদিকে বহুভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত এক অখণ্ড সনাতন হিন্দুধর্ম্ম—শুধু হিন্দুধর্ম্ম নহে, তাহাই বিশ্বব্যাপী মানবধর্ম্ম—কারণ তাহা সমুদয় মানবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে, সকলের প্রাণে আশার আলোক জ্বালিতে, সকল হৃদয়ের ব্যথাতৃষ্ণা নিবারণ, বন্ধন ছেদন ও দৈন্য কাতরতা দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

তাঁহার ইংরেজী চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন—"চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মসভায় স্বামিজী যে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, খৃষ্টের পর আর কোন প্রাচ্যজগদ্বাসীর নিকট ওদেশের লোক তেমন কথা শুনে নাই। তাঁহার ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্মবিস্তারের সহায়ক-রূপে গণ্য হইবে এবং জগতের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ গৃহীত হইবে।"

কথাগুলি বাস্তবিক প্রতিবর্ণে সত্য। কারণ স্বামিজীর পূর্ব্বে যদিচ কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় খ্যাতনামা বক্তাগণ পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বক্তৃতায়

তাদৃশ ফল হয় নাই, অর্থাৎ তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রচারের বিন্দুমাত্র সাহায্য হয় নাই। ইহার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা কেহই স্বামিজীর মত নির্ভীক ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন নাই—তাঁহাদের বক্তৃতার অধিকাংশ ভাগ খৃষ্টের গুণগানে পূর্ণ থাকিত, আর হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে দুচার কথা যাহা বলিতেন তাহাও নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে অর্থাৎ মূর্ত্তি পূজাকে বাদ দিয়া এবং ওদেশের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত মিল রাখিয়া। এক কথায়, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ইউরোপী পোষাক পরাইয়া ও কাটছাঁট করিয়া ওদেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ওদেশের পণ্ডিতগন তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানের গভীরতার উপর তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতবর মোক্ষমুলর একবার কথাপ্রসঙ্গে প্রতাপবাবুর নিকট একটা সুদীর্ঘ শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি কবিয়া উহার মনোহারিত্বের প্রসংসা করিতে থাকেন। তৎপূর্ব্বে তিনি আরও দুএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তখন প্রতাপবাবু 'হাঁ' 'না' করিয়া সায় দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু সহসা এরূপ সুদীর্ঘ বাক্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে আহূত হইয়া তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ জানেন না। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রের অর্থ জানেন না শুনিয়া মোক্ষমূলর অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। আর একবার আমেরিকার এমার্সনের শ্রাদ্ধবাসর স্মৃতি উপলক্ষে একটি সভায় প্রতাপবাবুকে গীতার একখানি ইংরাজী অনুবাদের স্থলবিশেষ দেখাইয়া উহার মূল শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেবারও প্রতাপবাবু বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সকল কারণে ওদেশের লোক হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের নিকট

বিশেষ কিছু শিখিবার আছে ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে স্বামিজীই প্রথম ত্যাগবৈরাগ্যের কথা ওদেশে শোনান এবং অসঙ্কোচে মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করেন। তিনি পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন করিতে জানিতেন না বা নিন্দা-প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেন না, তাই অকপট ভাবে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাহা খাঁটিসত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গুরুদাস নামক তাঁহার একজন শ্বেতাঙ্গ ভক্ত বলিতেন, "তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল জগতের লোককে জ্ঞানদান করা"; আর একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলিতেন, "মানুষকে মানুষ গড়িয়া তোলা"—বাস্তবিক উভয়ের কথাই সত্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ পাঠের পর ২০শে তারিখে স্বামিজী 'ধর্ম্মই ভারতের প্রকৃত অভাব নহে,' শীর্ষক আর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি দুই এক কথায় বুঝাইয়া দেন যে, ভারতে ধর্ম্মের অভাব আদৌ নাই, প্রকৃত অভাব অর্থের। উপসংহারে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট নির্ধন ভারতের জন্য সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ওদেশে পদার্পণ। মহাসভার সভ্যগণ দেখিলেন তিনি শুধু ধর্ম্মরহস্যবেত্তা ও দার্শনিক নহেন, সঙ্গে সঙ্গে মহা স্বদেশপ্রেমিক।

২২শে তারিখে মহাসভার বৈজ্ঞানিকশাখার সমক্ষে তিনি দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন—পূর্ব্বাহ্নে 'নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শন' ও অপরাহ্নে 'ভারতের আধুনিক ধর্ম্মসমূহ'। ঐ সকল বিষয় পুনরালোচনার জন্য ২৩শে তারিখেও আর একটি বৈঠক বসিয়াছিল। ২৫শে অপরাহ্নে তিনি 'হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এইগুলি ব্যতীত বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশনসমূহে আরও চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২৬শে তারিখে তিনি মহাসভায় 'বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ক্রমপরিণতি' এই সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাসভায় এক সহস্রেরও অধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সতর দিন ধরিয়া শুধু প্রবন্ধপাঠই চলিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য আধঘণ্টা করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু স্বামিজীকে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পঠিত হইত; মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম। সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই নীরস ও অসার, সুতরাং অনেক সময় শ্রোতৃবর্গ শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই সময়ে সভাপতি মহাশয় সকলকে জানাইয়া দিতেন, "সব শেষে স্বামী বিবেকানন্দ ৫।১০ মিনিট বক্তৃতা করিবেন।" ইহাতে সেই বিরাট জনসঙ্ঘ অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত—স্বামিজী তাঁহাদের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন!

এ সম্বন্ধে 'বষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন —"ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বিবেকানন্দকে রাখিয়া দিতেন। যদি কোন গরমের দিন কোন নীরস বক্তা বেশীক্ষণ ধরিয়া বকিলে শত শত লোক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, সভাপতি অমনি উঠিয়া বলিতেন, 'স্বস্তিবাক্য উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিবেন।' আর কথা নাই, সেই শত শত ব্যক্তি শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে কলম্বস হলের চারি সহস্র শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহাস্য বদনে দুই ঘণ্টা হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত ও অবিরাম পাখা নাড়িত। সভাপতি 'যত শেষ তত বেশ' এই প্রাচীন নীতিটি বেশ বুঝিতেন।"

মহাসভার অধিবেশনান্তে

এইরূপে স্বামিজী চিকাগো মহাসভায় একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী হইতে সহসা বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষরূপে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার পূর্ণায়তন প্রতিকৃতিসমূহ চিকাগো সহরে নানা স্থানে প্রদর্শিত হইতে লাগিল —উহাদের নিম্নে লেখা ছিল "ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ"। শত শত পথিক ভ্রমণকালে ঐ সকল চিত্রের নিকট গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত এবং মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে চিত্রলিখিত মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। সংবাদপত্রসমূহ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা ও যশোগান করিতে লাগিল। রাজধানীর সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া কাগজওয়ালাও তাঁহাকে একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ওদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক হেরাল্ডের তুল্য গোঁড়া কাগজ আর নাই; তাহাতেও লিখিল—"ধর্ম্মমহাসভায় ইনিই নিঃসন্দেহে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-প্রেরণ কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতা তাহা বেশ বুঝিতেছি।"

এক বিবেকানন্দকে দেখিয়া তখন তাহারা সমস্ত ভারতবাসীকে 'পণ্ডিতের জাতি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে! আর কি গভীর নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক সুর!—'পাদ্রী ফাদ্রী পাঠান আর চল্‌বে না!'

'দি বষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' লিখিলেন—তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্ত্বের জন্য এবং চেহারার গুণে তিনি ধর্ম্মসভায় একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। যদি তিনি শুধু মঞ্চের উপর দিয়া

চলিয়া যান, তাহা হইলেই করতালিধ্বনি হইতে থাকে। অথচ সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট হইতে এই বিশেষ সমাদর ইনি ঠিক বালকের ন্যায় সরলভাবে গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মাভিমানের লেশমাত্র থাকে না।"

বাস্তবিক তাঁহার বালসুলভ অকপটতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এত বড় পণ্ডিত, এত নাম যশ, অথচ কিছুমাত্র অভিমানের চিহ্ন নাই। এরূপ দৃশ্য বড় বিরল। তাই স্বামিজী একবার বষ্টনে বেড়াইতে গেলে উক্ত পত্র আবার লিখিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন মহৎ ব্যক্তি—সরল, অকপট এবং অগাধ পণ্ডিত—তাঁহার এত পাণ্ডিত্য যে আমাদের দেশের খুব কম পণ্ডিতই তাঁহার সহিত তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য। দি প্রেস অব্ আমেরিকা লিখিলেন—"ভারতের অতীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন প্রিয়দর্শন ও তরুণ বয়স্ক আচার্য্য বিবেকানন্দ মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তথায় বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎপ্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা, তাঁহার মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব বুদ্ধিজ্যোতিঃ, এবং তাঁহার চিরসম্মানিত ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বর্ণনকল্পে তিনি যে সুন্দর ইংরাজী বলেন—সমস্ত একত্রিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করিয়াছে।"

দি ইন্টিরিয়র চিকাগো লিখিলেন—"ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে যাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সভামধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।"

দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক্ লিখিলেন—"বক্তৃতাশক্তি তাঁহার ঈশ্বরদত্ত

ক্ষমতা। তাঁহার গৈরিক বসনাবৃত প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল যেমন চিত্রবৎ মনোরম, তাঁহার কণ্ঠস্বরও তেমনি বীণাধ্বনিবৎ সুমধুর। কথাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিতেছে।”

অন্যান্য বহু পত্রিকার ন্যায় এই পত্রিকাও স্বামিজীর সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

রিভিউ অব্ রিভিউজ্ তাঁহার বক্তৃতাকে বলিয়াছিল অতি মহৎ ও উচ্চ ভাবপূর্ণ। এরূপ আরও শত সহস্র সাময়িক পত্র তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তর প্রশংসাসূচক কথা লিখিয়াছিল। তৎসমুদয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে সকল আমেরিকাবাসী মনস্বী পুরুষ তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে দুই জনের অভিমত এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

মাননীয় মিঃ মারউইন মেরি স্নেল লিখিয়াছিলেন—“আর কোন ধর্ম্মই ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই, এবং এই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় ইঁহার প্রভাব ও আদর যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন—খাস মহাসভায় ত বটেই এবং উহার বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশনসমূহেও (যাহাতে সভাপতি হইবার সম্মান আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল); এবং প্রত্যেকবারই খৃষ্টান, অখৃষ্টান সকল বক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁহাকেই বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তিনি যেদিকে যাইতেন সেই দিকেই লোকের ভিড় হইত এবং তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। খৃষ্টানদের মধ্যে যাঁরা সব চেয়ে গোঁড়া তাঁরাও বলেন ‘বাস্তবিক ইনি নরকুলের অলঙ্কারস্বরূপ’।”

মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড ব্যারোজ মহোদয়ও বলিয়াছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত অভিমতসমূহ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকার অধিবাসীগণের মনের উপর স্বামিজী কিরূপ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এখন হইতে তাঁহার আর কোন অভাব বা কষ্ট রহিল না। আমেরিকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনকুবেরদিগের গৃহদ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হইল। সকলেই তাঁহার সঙ্গ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া একান্ত চিত্তে উহা প্রার্থনা করিতে লাগিল ও তাঁহার দর্শনলাভে বা মুখের একটি কথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। স্বামিজী স্বয়ং এ সম্বন্ধে ২রা নবেম্বর চিকাগো হইতে লিখিয়াছিলেন—

"আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপে যাইতে আমার যে খরচ লাগিবে তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই।……আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর—আমি বরাবরই কাহারও

না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না।" (ইংরাজীর অনুবাদ—পত্রাবলী)।

পাঠক! এই সেই বিবেকানন্দ যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পরিব্রাজক ভিখারীর বেশে ভারতের পথে পথে ঘুরিয়াছিলেন, যিনি সেদিনও প্রথম আমেরিকাতে আসিয়া অর্থাভাবে দারুণ অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হইয়া ভারতে সাহায্য প্রার্থনার জন্য তার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হায়! সেদিন কে জানিত যে আজ যিনি অর্থাভাবে এত কাতর ও চিন্তিত হইয়াছেন শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন তিনি আর অর্থের জন্য আকুল হইবেন না, বিশ্বের অর্থ সম্পদই তাঁহার পদতলে লুটাইবার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইবে! সত্যই এইরূপ হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, স্বামিজীর অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া আমেরিকার বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলনারী তাঁহার অনুরাগিণী এবং কেহ কেহ এমন কি তাঁহার পাণিপ্রার্থিনী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই অনন্ত ভোগসুখ করায়ত্ত করিতে পরিতেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। যাঁহার নয়নবহ্নিতে মদন ভস্ম হইয়াছিল সেই শঙ্করতুল্য তেজস্বী পুরুষ কামনার দাস ছিলেন না। একথা বোধ হয় এখন কাহারও অবিদিত নাই যে এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী এই সময়ে বিনীতভাবে তাঁহার পদে আপনার রূপযৌবন ও অগাধ ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী উত্তরে তাঁহাকে শুধু একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'ভদ্রে, আমি যে সন্ন্যাসী, নিখিলের সমস্ত রমণীই যে আমার মা'। এ কি সাধারণ চরিত্র-বল?

কিন্তু এত আদর, সম্মান, যশোগীতি ও প্রশংসাকীর্ত্তন স্বামিজীর নিষ্কলঙ্ক চিত্তে বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের ছায়াপাত করিতে পারে নাই। বরং মনে হয় তিনি ইহাতে যেন যন্ত্রণা বোধ করিয়াছিলেন। কারণ যেদিন প্রথম তিনি সংবাদপত্রের স্তম্ভে আপনার অজস্র প্রশংসা ও খ্যাতির বিবরণ পাঠ করিলেন, সেদিন তিনি "আজ হইতে আমি নির্জ্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম" ভাবিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন।

আর—স্বদেশ? এ ঐশ্বর্য্যের পুষ্পিত নন্দনে আসিয়া তিনি এক দিনের জন্যও তাঁহার দরিদ্র স্বদেশের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নিজের এখন আর কোন অভাব ছিল না সত্য—ইচ্ছা করিলে তিনি এখন অনায়াসে ক্রোড়পতির প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে মহা আরামে অসংখ্যপ্রকার বিলাস-বৈভবের মধ্যে বিহার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে হৃদয় ভোগে মাতিবার নয়! পাঠক একটি ঘটনার কথা শুনুন। যেদিন তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িল ঠিক সেইদিন চিকাগো সহরের একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ধনী তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং অনুগত ভক্তজনের ন্যায় বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা ও সৎকার করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার শয়নের জন্য একটি বিচিত্র বিলাসোপকরণসজ্জিত সুরম্য প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে রাত্রে স্বামিজীর নিদ্রা হইল না। সেই ইন্দ্রপুরী-সদৃশ অট্টালিকা, রত্নাবলীভূষিত দীপালঙ্কৃত গৃহদ্বার, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কল্পনাতীত অসংখ্য ভোগোপকরণ তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার চক্ষের সলিলে উপাধান ভিজিয়া গেল, শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া

শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইয়া বাহিরের ঘোর অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা ভারতের। ভারতের লোক দু-বেলা দু-মুঠা খাইতে পায় না, আর এদেশের লোকের এত ঐশ্বর্য্য যে তুচ্ছ ভোগবিলাসের জন্য কোটী কোটী মুদ্রা জলের মত খরচ করে—এ চিন্তা তুষানলের ন্যায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে যন্ত্রণার আবেগে তাঁহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি গৃহতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া ক্রমাগত এই চিন্তা উঠিতে লাগিল—'হা আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দ্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ! আমি এ সুখ সৌভাগ্য ও নামযশঃ লইয়া কি করিব?

কিন্তু এই মহদাশয় ব্যক্তিরও শত্রুর অভাব ছিল না। চিকাগো মহাসভায় তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে ও পরে তাঁহার জগদ্ব্যাপী যশঃকীর্ত্তন শ্রবণে কতিপয় নীচ, স্বার্থান্বেষী কুটিল ব্যক্তি ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। বলিতে লজ্জা হয়, ইহার মধ্যে একজন তাঁহার স্বদেশীয় ও ভারতের সংস্কারকসম্প্রদায়ের নেতৃকল্প ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী কোথা হইতে অতর্কিতে আসিয়া তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরাশিকে মলিন ও নিষ্প্রভ করিবার উপক্রম করিয়াছে, তখন তিনি কৌশলক্রমে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরবহানি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ধর্ম্মমহাসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট স্বামিজীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনেও না। ও একটা ভবঘুরে গোছের লোক, আর জুয়াচোর. এখানে আসিয়া মস্ত সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইতেছে" ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, ধর্ম্মমহাসভার

পরিচালকগণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা স্বয়ং স্বামিজীর আকার-প্রকার, কথাবার্ত্তা ও চালচলন দেখিয়া তাঁহাকে কিছুতেই প্রবঞ্চক বা হীন-চরিত্রের লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। সুতরাং উক্ত মহাত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শুধু ইঁহারা নহেন, থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতারাও স্বামিজীর প্রতি শুধু যে সহানুভূতির অভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গাত্রদাহ হইয়াছিল গোঁড়া সম্প্রদায়ের খৃষ্টান পাদরীদিগের। তাঁহারা তাঁহার নির্ভীক সমালোচনা ও স্পষ্টবাদিতায়* তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠিল এবং কি করিয়া তাঁহার কলঙ্ক রটনা করিতে পারিবে তাহার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কিন্তু সহজে তাঁহার ছিদ্র না পাইয়া তাহারা অবৈধভাবে তাঁহাকে গালি দিতে ও তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তাহারা কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া এক গর্হিত উপায় অবলম্বন করিল। কতকগুলি সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার

* স্বামিজী দেখিলেন ভারত-প্রত্যাগত মিশনরীগণের অনেকেই দেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতবর্ষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ব্বরের দেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও নানাবিধ কাল্পনিক গল্পের দ্বারা নিজ নিজ উক্তির সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন,—ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। সুতরাং তিনি সুযোগ পাইলেই আমেরিকাবাসীর মন হইতে ঐ ধারণাটি অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতেন ও তজ্জন্য কখন কখন তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। একবার মিনিয়াপোলিস নামক স্থানে বক্তৃতাকালে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হিন্দুরমণীরা সন্তানদিগকে নদীগর্ভে কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করেন কিনা; স্বামিজী তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাশয়া,

ধর্ম্মনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল এবং কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। স্ত্রীলোকগুলি প্রথমে তাঁহার নিকট গিয়া নানাবিধ প্রলোভন-জাল বিস্তারের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ও তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা, শিশুসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাস্তবিক তাহারা জীবনে কখনও এ প্রকার মোহপাশ, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে কোন পুরুষকে এ ভাবে অটল, সংযত ও দৃঢ়ব্রত থাকিতে দেখে নাই; প্রকৃত ধাম্মিক যে কতদূর

তাই বটে, আমাকেও তাহারা ঐরূপে ফেলিয়া দিয়াছিল, তারপর আপনাদের পুরাণোক্ত জোনার ন্যায় আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি"। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি স্পষ্ট কথা বলি বটে, তবে সে তোমাদেরই ভালর জন্য। আমি এখানে তোমাদের মনযোগান কথা বলিতে আসি নাই, সত্য কথা বলিতে আসিয়াছি। মনযোগান বা খোসামুদে কথা বলা আমার ব্যবসা নহে, তাহাই যদি হইত তবে আমি এতদিনে নিউইয়র্ক সহরের ফিপ্থ এভেনিউ নামক রাস্তায় একটা নবরঙ্গের গীর্জ্জা খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানবৎ। আমি তোমাদের ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া ভগবানের দিকে তোমাদের লইয়া যাইতে চাই, সুতরাং সব সময় তোমাদের প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম ও সভ্যতার গুণগান করিতে পারিব না।" ডেট্রয়েটে স্বামিজী একদিন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম কৈ? এই মারামারি কাটাকাটি ও প্রবল স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে যীশুর স্থান কোথায়? যদি আজ তিনি এখানে উপস্থিত হইতেন, মাথায় দিয়া শুইবার জন্য একখণ্ড প্রস্তর পাইতেন কিনা সন্দেহ"। খ্রীষ্টের আদর্শের এমন সুন্দর ধারণা তিনি কেমন করিয়া করিলেন ভাবিয়া একজন সুবিখ্যাত ধর্ম্মযাজক বিস্ময় প্রকাশ করিলে স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"কেন, খ্রীষ্ট যে প্রাচ্য দেশের লোক ছিলেন! আমরাও সেই দেশের লোক। সুতরাং তাঁর ভাব যে ঠিক ঠিক ধর্ত্তে পারব এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি"?

ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ তাহাও তাহারা অবগত ছিল না। সুতরাং স্বামিজীর চরিত্র-মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহারা অবিলম্বে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইল। ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি যে ঈর্ষ্যাচালিত হইয়া এতদূর নীচতা অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, ঈর্ষ্যায় লোক অন্ধ হয়।

১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের মিশনরীরাও অনেকে স্বামিজীকে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পিত কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয় ও আমেরিকায় কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার উপর অযথা আক্রমণ করিতে থাকে। ভারতবর্ষ হইতে স্বামিজী যে সব চিঠিপত্র পাইতেন তাহার মধ্যে একখানি পত্রে ঐ সংবাদ দেওয়া ছিল ও আমেরিকার কোন একখানা সংবাদপত্র তাঁহার যে নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিল তাহার উল্লেখ ছিল। স্বামিজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌছিয়াছে। 'ইন্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকাকে এখানে কেহ চেনে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটিরিয়ন'দের কাগজ বলিয়া ঠাট্টা করে। এরা খুব গোঁড়া সম্প্রদায়। অথচ নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু নাম জাহির করিবার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকার জনসাধারণ (বিশেষতঃ পুরোহিতগণ) আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ কোন বড়

লোককে গালাগালি দিয়া অনেক পত্রিকা যে খ্যাতনামা হইতে চায় এই কৌশল এখানকার কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং ইহারা ওসব বড় গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। অবশ্য ইহাতে ভারতীয় মিশনরীদের যে খুব সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও—'হে য়াহুদী, চাহিয়া দেখ, ঈশ্বরের নিকট তোমাদের বিচারের দিন সমাগত।' বাস্তবিক তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তিসমূহ এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে, উহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা আর কিছুতেই টিঁকিতেছে না। অবশ্য মিশনরীদের জন্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশের লোকেরা দলে দলে এখানে আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাহা হউক, যখন পুষ্করিণীতে নামিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত ভাল করিয়াই দেখিব।"

বাস্তবিক সাধারণ শ্রেণীর হীনচেতা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানা কথা রটনা করিতেছিল বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, সমস্ত খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, বরং খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে যে সকল চিন্তাশীল, মহামনা উচ্চান্তঃকরণ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এবং পুরোহিতশ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ প্রধান বা সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বামিজী এবং তাঁহার মতের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইতর লোকদিগের ব্যবহার দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে সংবাদপত্রে লেখনী-চালনা করিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু স্বামিজী বলিতেন, "আমি কেন ঐরূপ করিতে যাইব? নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ কোন কথা বলা সন্ন্যাসীর

কার্য্য নহে। তা ছাড়া সত্যকে কেহ গোপন করিতে পারিবে না। ঠিক জানিও সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।” ভক্ত ও গুণগ্রাহী বন্ধুদিগকে এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিলে কখন কখন বলিতেন, “ক্রোধ করিতেছেন কেন? নিন্দুক ও নিন্দিত, প্রশংসক ও প্রশংসিতের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে?”

এই সময় স্বামিজীর পরিশ্রমও খুব গুরুতর হইতেছিল। ওখানকার একটা বক্তৃতা-কোম্পানী তাঁহাকে সমস্ত আমেরিকাময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল। সাধারণতঃ যাঁহারা উৎকৃষ্ট বক্তা ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদিগকেই এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। স্বামিজীকেও তাহারা এই জন্য আপনাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিল। তিনি দেখিলেন, ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিছু অর্থ পাইলে তাঁহার নিজেরও সুবিধা হইবে, চাই কি, উহা হইতে তিনি ভারতে ধর্ম্ম ও জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসী নরনারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদিগের মন হইতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির উচ্ছেদপূর্ব্বক যথার্থ সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। সুতরাং তিনি উক্ত কোম্পানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমেরিকার চতুর্দ্দিকে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন; যথা—ভারতের নারীজাতি, হিন্দুদিগের আচার পদ্ধতি, ভারত কি অজ্ঞানাচ্ছন্নদেশ? ইত্যাদি। এই সকল বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব্ব ও মধ্যপশ্চিম প্রদেশের প্রত্যেক বৃহৎ ও প্রধান প্রধান নগরে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি চিকাগো, আইওয়া সিটি, ডিসময়েনিস্ সেণ্টলুই, ইণ্ডিয়ানা পোলিস্, মিনিয়াপোলিস, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বষ্টন,

কেম্ব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুক্লিন এবং নিউইয়র্কে ভ্রমণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল বক্তৃতা ও ভ্রমণের সবিশেষ বৃত্তান্ত এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। মাঝে মাঝে ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস বা ঐরূপ দুই চারি খানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তাঁহার দুই চারিটি উপদেশ বা বক্তৃতার সারাংশ ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে এই সকল বক্তৃতা দ্বারা তিনি যে আমেরিকাবাসীদের মন হইতে 'ভারতবর্ষ বর্ব্বরের দেশ, উহার ধর্ম্ম অতি অকিঞ্চিৎকর এবং উহার অধিবাসীরা দারুণ অসভ্য' এই সকল মিথ্যা সংস্কার দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রাচ্যদেশ, ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ও যথার্থ ধারণা স্থাপন করিতে বহুল পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ঠিক কোন্ সময়ে তিনি যে এই সকল বক্তৃতা দিবার জন্য পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে বোধ হয় ১৮৯৪ সালের প্রারম্ভে। কারণ এই সময়েই তিনি একবার লিখিয়াছিলেন, "আমি ক্রমাগত চর্কীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" তাঁহার পর্য্যটনাবসরের অধিকাংশকাল চিকাগোর জর্জ্জ, ডব্লিউ, হেল সাহেবের বাটীতে যাপিত হইত; কারণ এই পরিবারের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

কিন্তু এই প্রচার কার্য্য তাঁহার সকল সময় ভাল লাগিত না। মধ্যে মধ্যে ভারতের সেই পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া বর্ত্তমান অবস্থাকে ঘোর বদ্ধাবস্থা মনে হইত, তাহার উপর শ্রোতাদিগের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত জ্ঞানের একান্ত অভাব এবং তাহাদের মূঢ়বৎ প্রশ্নের উপর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিয়া যাইত। সত্য

বটে, অনেক সময়ে ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাঁহাকে নিজ নিজ উপাসনাগারে লইয়া গিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই লোকের উৎসাহের সীমা থাকিত না, তথাপি অসংখ্য লোকের অজ্ঞতা দূর করা বড় কম পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার কর্ম্ম নহে। তিনি দেখিলেন লোকগুলি ভারত সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ, আর যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানে তাহাও ভ্রমপূর্ণ। তিনি কখনও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া বক্তৃতা দিতেন না, সভায় উপস্থিত হইয়া যাহা বলিবার ইচ্ছা হইত বলিতেন। অনেক সময় এইরূপ হইত—হয়ত বক্তৃতা বেশ জমিয়াছে, তিনিও প্রাণের আবেগে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন এমন একটা তুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে সব মাটি হইবার যোগাড়—হয় তখন বক্তৃতাস্রোত থামাইতে হয়, না হয় তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। কেহ কেহ আবার তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না, প্রতিবাদ করিত, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। আর একবার তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহার বেগধারণ করা কাহারও পক্ষে সহজ হইত না। তাঁহার প্রবল মানসিক শক্তি ও ক্ষুরধার বিদ্রূপের নিকট সকলকে নিরুত্তর হইতে হইত। এ সম্বন্ধে আইওয়া ষ্টেট রেজিষ্টার লিখিয়াছেন—

"যদি কোন ব্যক্তি স্বামিজীর যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ। তাঁহার উত্তরগুলি যেন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় ঝলসাইয়া উঠিত, আর সেই দুঃসাহসিক তার্কিক তাঁহার শাণিত বুদ্ধিফলকে বিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইত। তাঁহার জ্ঞান-সম্ভার-পূর্ণ, সুশিক্ষিত মনের ক্রিয়াসকল এত সূক্ষ্ম ও প্রখর যে, সহজেই শ্রোতৃবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু এরূপ

মনের গতি অনুধাবন করা বড়ই প্রীতিপ্রদ। বাস্তবিক বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রতিপাদ্য মতসকল খৃষ্টনিষ্ঠের হৃদয় অধিকার করিয়াছে।”

যাহা হউক অসহ্য বিরক্তি সত্ত্বেও স্বামিজী, ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সব সময়ে তিনি যে সাধারণ ও লৌকিক বিষয়েই বক্তৃতা দিতেন তাহা নহে, মাঝে মাঝে ধর্ম্ম দর্শনাদি বিষয়ক উপদেশ দিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ আর একটি কারণে তিনি ঐ কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন, বক্তৃতা কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা তাঁহার সাহায্যে নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেছেন, অথচ তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ। প্রথম প্রথম তাঁহারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এক একটি বক্তৃতার জন্য ৯০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৭০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর ক্রমশঃ ঐ টাকার পরিমাণ হ্রাস হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে একদিন একটি বক্তৃতায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া স্বামিজীকে মাত্র ২০০ ডলার বা ৬০০৲ টাকা দিলেন। ইহাতে স্বামিজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন। তিনি তাহাদের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে যৎসামান্য কিছু দিয়া যেন কৃতার্থ করিতে চায়, ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। আর বাস্তবিক এরূপ করিবার কোন সঙ্গত হেতুও ছিল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর তাঁহার প্রভাবও দিন দিন বাড়িতেছিল। যাহা হউক এই সকল

কারণে ও পয়সা লইয়া বক্তৃতা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় * কিছুকাল পরে স্বামিজী উক্ত কোম্পানীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

উপরোক্ত প্রকারে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিবার সময়ে তিনি আমেরিকানদিগের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—সেটি হইতেছে তাঁহাদের সত্যানুরাগ। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র অর্থ উপার্জ্জন, পাশ্চাত্যজাতি মাত্রেই অতিশয় অর্থগৃধ্নু। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উহারা সত্যানুরাগী, এবং এই অনুরাগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক শ্রেণীর ভণ্ডজ্ঞানী শিক্ষাদানছলে জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। স্বামিজী পর্য্যটন করিতে করিতে এইরূপ একদল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিবার জন্য বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত তাহাদিগের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল যে, তিনি ওদেশে প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিবেন, কিন্তু তাহার জন্য এক কপর্দ্দকও কাহারও নিকট গ্রহণ করিবেন না।

---

* এই সম্বন্ধে তিনি পরে ভারতীয় শিষ্যবর্গের সম্মুখে বলিয়াছিলেন—এইরূপে যথেষ্ট অর্থ সমাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে উদিত হইল, এ কি করিতেছি! আমি না সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য! আমার আধ্যাত্মিক শক্তি যে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে! তৎক্ষণাৎ ঐরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করা ছাড়িয়া দিলাম।'

এই সকল কার্য্যের অবকাশে তিনি আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, চিত্রশালা, কারখানা ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিতেন ও তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যাদি বিস্তারের উপায় ও প্রণালীসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি পরিশ্রমনিরত ছাত্রের ন্যায় আমেরিকার সামাজিক জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত সদাসর্ব্বদা মিশিতেন তাঁহারা বলেন, "তাঁহার কাছে থাকিলেই বহু বিষয় আপনা আপনি শিক্ষা হইয়া যাইত।"

স্ত্রীলোকেরা আমেরিকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। স্বামিজী ওখানে বহু স্ত্রীলোকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, নারীজাতিকে শিক্ষিত না করিলে কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত। আবার, সাধারণতঃ আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষগুলি অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে।" ইহাদের সহিত ভারতের শিক্ষাহীনা নারীকুলের তুলনা করিয়া তিনি বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন। ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিপদ মিত্র মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন—

"এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' (যে দেবী স্বয়ং সুকৃতি-পুরুষের গৃহে বিরাজ করেন), একথা

বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়াদেশে মেয়েছেলের পথ চলবার যো নেই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দিবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

"বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন তিনিই প্রকৃত শাক্ত। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ যে বলেছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ', অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা—এখানে ঠিক তাই, আর এরা এত সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি—তার ফল, আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।......"

আর এক স্থানে লিখিতেছেন—"আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না, আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার, হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, অধ্যাপনা সব কাজ করে, অথচ মনে একটুও দাগ নেই। যাদের পয়সা আছে তারা আবার দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি?—না, আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ', ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে বিদ্যালাভ কর্ত্তে হবে, তেমনি মেয়েদেরও

করতে হবে, কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু-জন্ম ঘুচিবে না।"

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, ধর্ম্ম বিষয়ে আমেরিকানরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক হীন, কিন্তু সমাজসম্বন্ধে উহারা অনেক অগ্রগামী। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর ইহাদিগকে আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।'

আমেরিকায় থাকিতে ওদেশের শিষ্টাচারের নিয়মাবলী পালন করিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত হইতেন। এ বিষয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে বহু প্রভেদ। কিন্তু তিনি ওদেশীয় নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক মনে করিতেন। আবার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইলে বালকের ন্যায় সরলভাবে গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'কোন্‌টি ঠিক?' যেমন সিঁড়িতে উঠিবার বা নামিবার সময় কাহার আগে যাওয়া উচিত—স্ত্রীলোকের না পুরুষের? কিন্তু তিনি যেখানেই যাইতেন কেহ তাঁহার ত্রুটি বা দোষ ধরিত না, তাঁহার সম্বন্ধে নিয়ম ছিল তিনি কোন সামাজিক রীতিনীতির বাধ্য নহেন। সর্ব্বত্রই গৃহস্বামী তাঁহাকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

এত ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি ও কাজকর্ম্মের মধ্যেও স্বামিজী আপনার প্রকৃতিগত ধ্যানধারণার ভাব হারান নাই। সময়ে সময়ে তিনি আত্মভাবে তন্ময় হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। অনেক দিন এমন ঘটিত যে ট্রামে উঠিয়াছেন, ট্রামখানি দুই তিনবার গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার খেয়াল নাই; অবশেষে কণ্ডাকটার আসিয়া যখন ভাড়ার তাগাদা করিত, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িতেন ও ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ঘটনা পুনরায় না ঘটে তজ্জন্য সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

পর্য্যটন ও প্রচার

বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য্য উপলক্ষে পর্য্যটনকালে স্বামিজীর সহিত যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আলাপ পরিচয় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা * মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সহিত স্বামিজীর ধর্ম্মদর্শনাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ হইত। ইঙ্গারসোল তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন তিনি অত স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ না করেন—বিশেষতঃ নূতন কিছু প্রচার করিবার সময়, বা ও দেশের লোকের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোনরূপ সমালোচনা করিবার সময়। স্বামিজী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এইরূপ প্রচার করিতে আসিতেন, তবে ইহারা আপনাকে ফাঁসিতে লটকাইত বা পুড়াইয়া মারিত। এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে আসিলেও, আপনাকে ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিত।" স্বামিজী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বাস্তবিক আমেরিকার লোকেরা যে কোন সময়ে অত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বা ধর্ম্মান্ধ ছিল ইহা তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইঙ্গারসোলকেও তিনি সে কথা খুলিয়া বলিলেন। তবে ইঙ্গারসোল ও তাঁহার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ছিল। ইঙ্গারসোল কোন ধর্ম্মই মানিতেন না, একরূপ নাস্তিক ছিলেন বলিলেই হয়। স্বামিজী ধর্ম্ম

---

* স্বামিজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'মিঃ ইঙ্গারসোল এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা। ইনি প্রতি বক্তৃতায় ৫ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন।'

ও ঈশ্বর মানিতেন, এবং যদিও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত আমেরিকাবাসীদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইত, তথাপি তিনি কোন ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না, বরং খৃষ্ট ও খৃষ্টমাতা মেরীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং ইঙ্গারসোলের যতটা ভয়ের কারণ ছিল, স্বামিজীর ততটা ছিল না। এই দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে মতের কিরূপ পার্থক্য ছিল স্বামিজী-কথিত একটি ক্ষুদ্র কাহিনী হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। স্বামিজী বলিতেন, "ইঙ্গারসোল এক সময়ে আমায় বলিয়াছিলেন, 'আমি এই জগৎটা যথাসম্ভব ভোগ করিবার পক্ষে; লেবুটা নিংড়াইয়া যত পার রস বাহির করিয়া নাও, কারণ এই জগৎটার অস্তিত্বই আমাদিগের নিকট নিশ্চিত, এছাড়া আর সব অনিশ্চিত'। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'আপনি যে উপায়ে লেবু নিংড়াইবার কথা বলিতেছেন, আমি তাহার চেয়ে ঢের ভাল উপায় জানি, আর তাহাতে বেশী রসও পাই। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, তাই রস নিংড়াইয়া নিবার জন্য তাড়াহুড়া করি না। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নাই, সুতরাং বেশ ধীরে সুস্থে মজা করিয়া নিংড়াই। কাহারও প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তিরও ধার ধারি না, সুতরাং আমি জগতের সব নরনারীকে ভালবাসিতে পারি। আমার নিকট সকলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবান-বোধে ভালবাসিতে পারিলে কতটা সুখ হয় ভাবুন, আর এই ভাবে লেবুটা নিংড়ান দেখি, তাহাতে হাজারগুণ বেশী রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।"

ইঙ্গারসোলের মত ব্যক্তির সহিত উপরোক্ত ভাবে কথাবার্ত্তা বলাতে বেশ বুঝা যায়, আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামিজীর কিরূপ স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। শুধু যে হুজুগওয়ালা

সৌখীন ধনীরা তাঁহাকে লইয়া হৈ চৈ করিতেছিলেন তাহা নহে, ওদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও মনস্বী ব্যক্তিবর্গও তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিবার জন্য লালায়িত হইতেন। অনেকে প্রকাশ্য সভায় বা লোকের বাটীতে তাঁহার বক্তৃতা বা কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইত না, তাঁহার বাসস্থানে পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইত।

একবার পশ্চিমদিক্‌কার একটি সহরে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্বামিজী মহাসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত কতকগুলি যুবক কৃষি ও গবাদি-পশু-পালন কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিত। তাঁহারা উক্ত সহরে স্বামিজীর মুখে ভারতীয় দর্শনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, যাঁহার তত্ত্বলাভ হইয়াছে তিনি কোন পার্থিব অবস্থায় বিচলিত হন না, এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে নিজেদের গ্রামে বক্তৃতা করিবার জন্য একদিন আহ্বান করিল এবং তিনি আগমন করিলে একটি পিপা উল্টাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে বলিল। স্বামিজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই আপন ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন। সহসা তাঁহার কানের কাছ দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া কতকগুলি বন্দুকের গুলি ছুটিল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অবিচলিত ভাবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে গোপালকেরা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মহাকলরব করিতে লাগিল ও তাঁহাকে খুব খাঁটি লোক বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামিজী যদি সেদিন বিন্দুমাত্র ভীতিচিহ্ন প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিত।

স্বামিজীর অদৃষ্টে এইরূপ নানাবিধ বিড়ম্বনাভোগ হইয়াছিল।

একটি ঘটনা তিনি প্রায়ই কৌতুকচ্ছলে বর্ণনা করিতেন। তাহা এখানে উল্লেখ করিব। সে সময়টা তিনি খুব পরিশ্রম করিতেছিলেন—একটি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগমাত্র সম্বল লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আজ এখানে কাল সেখানে বক্তৃতা দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সময়ে সময়ে দিন দুইতিনটা বক্তৃতাও দিতে হইত। এই ভাবে একদিন মধ্য-পশ্চিম রাজ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সহরে তিনি বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যর্থনাসমিতির সেক্রেটারী বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তিনি যেমন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরাম কেদারায় বসিতে গিয়াছেন, অমনি সেটা মাঝখান হইতে খসিয়া গিয়া এমনি বেথাপ্পা গোছের হইয়া দাঁড়াইল যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বরং যত বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই চেয়ারভাঙ্গা, পোষাক ছেঁড়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইবার আশঙ্কা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অগত্যা তিনি সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন—নড়িতে চড়িতেও পারেন না। অবশেষে সেক্রেটারী মহোদয় যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আসুন, শ্রোতৃগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন"। তখন তিনি ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমার বোধ হয় আপনি যদি আমায় আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে শ্রোতৃগণকে বরাবরই ঐরূপ অপেক্ষা করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া সেক্রেটারী দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর খুব একচোট হাসি

হইল। স্বামিজী এমনভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন যে, তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুরা হাসিয়া অস্থির হইতেন।

কিন্তু এই কৌতুককর ঘটনার সহিত আরও এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে যাহা হইতে পাঠক এই মহাপুরুষের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইবেন। ওদেশে যাহারা স্বামিজীকে জানিত না, তাহারা অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া নিগ্রো মনে করিত। অনেকবার এজন্য তাঁহাকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, অথচ সেই সব ক্ষেত্রে যদি তিনি একটিবার নিজের পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে অপমান করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইত। একবার তিনি ট্রেন হইতে নামিলে একজন নিগ্রোজাতীয় কুলি বহুব্যক্তি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি আমাদের জাতির মধ্যে খুব একজন মস্তবড় লোক, তাই আমি আপনার সহিত করমর্দ্দনের সৌভাগ্য লাভ করিতে আসিয়াছি।" স্বামিজী বুঝিলেন লোকটি তাঁহাকে ভুলক্রমে নিগ্রো মনে করিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা রুষ্ট না হইয়া সাদরে তাহার হস্তধারণ করিলেন ও বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তোমায় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" এইরূপ আরও অনেক নিগ্রো তাঁহাকে স্বজাতীয় মনে করিয়া তাঁহার নিকট আসিত, কিন্তু তিনি কখনও তাহাদের ভুলের জন্য অপরাধ গ্রহণ করিতেন না। মার্কিণ রাজ্যের দক্ষিণভাগে ভ্রমণ-কালে বহুবার এমন ঘটিয়াছে যে প্রচারার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি এক বৃহৎ সহরে গিয়া সেখানকার হোটেলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে হোটেলস্বামী তাঁহাকে দেখিয়া রুক্ষভাবে তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। এই সকল স্থলেও তিনি যদি

নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন তবে অক্লেশে প্রবেশাধিকার পাইতেন। তাহার পরদিন যখন হোটেলের লোকেরা খবরের কাগজে তাঁহার অজস্র প্রশংসা ও বক্তৃতাদি পাঠ করিত, তখন অনুতপ্ত ভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিত। এই সব অসুবিধা দেখিয়া প্রচারকার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক সময় তাঁহার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। এমন কি উত্তর দিকের সহরে দাড়ি কামাইবার জন্য ক্ষৌরকারের দোকানে প্রবেশ করিলে অনেক সময়ে তাহারা রূঢ়ভাষায় তাঁহাকে দরজা দেখাইয়া দিত। অনেকদিন পরে তাঁহার এক পাশ্চাত্য শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সব ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেই যখন সব লেঠা চুকিয়া যাইত, তখন তিনি কি জন্য নিজের পরিচয় দিতেন না? তিনি তাহার উত্তরে স্বগতোক্তির ভাবে বলিয়াছিলেন, "কি! অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইব? এ জন্য ত আর জগতে আসি নি!" বাস্তবিক তিনি সাদা-কালোর প্রভেদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। তিনি নিজে কৃষ্ণকায় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, বরং ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ববোধ করিতেন এবং কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তাঁহার সমক্ষে নিজ চর্ম্মের গৌরব দেখাইলে কঠোর বাক্য শুনাইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

স্বামিজী প্রচারোদ্দেশ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে যেখানে যাইতেন সেইখানেই দেখিতেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাগণ সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার পূর্ব্বজীবন, রীতি-প্রকৃতি, অভ্যাস, আহার, ধর্ম্ম-দর্শনাদিবিষয়ক মত—সকল বিষয়ের খোঁজ লইতেন ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, তাঁহার ভবিষ্যৎ

কার্য্য-প্রণালী, তাঁহার দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আচারপদ্ধতি বিষয় প্রভৃতি জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তারপর তাঁহার মতামত সহ ঐ সকল কথোপকথন নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেন। আমেরিকার যে সকল লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ পাইতেন না তাঁহারাও ঐ সকল সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই অবগত হইতে পারিতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন ডেট্রয়েটে উপস্থিত হইলেন, তখন খবরের কাগজের সংবাদদাতাগণ দিনরাত তাঁহাকে জ্বালাতন করিত। এ সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে সকল সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাহুল্যভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল না। কেবলমাত্র 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' নামক আমেরিকার অন্যতম মুখ্য সংবাদপত্র যাহা লিখিয়াছিল তাহার কিয়দংশের অনুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল—

"হিন্দু প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—যে ইংরেজী বলেন তাহা দোষশূন্য অথচ কোন নোট বা স্মারক-পত্র ব্যবহার করেন না। উচ্চারণও এত মধুর যে শ্রোতাদের অনেকেই বলেন, যদি কেহ উহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারে তথাপি বলিবে উহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখশ্রাব্য। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি অনেক সহরে বৃহৎ বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন। সকলেই এক বাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণী শক্তি প্রত্যেক বিষয়েই নূতন আলোকদান ও প্রাণ-সঞ্চারের ক্ষমতার কথা বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আমেরিকাবাসীদের নিকট

পৃথিবীর পরপার হইতে আগত এই ব্যক্তি স্বয়ং যেমন চমৎকার ও অপরূপ, বিবিধ উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিও সেইরূপ। যখন এই শ্যামকায়, শ্যামলকেশ, উজ্জ্বল-গৈরিকধারী মহাপুরুষ স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও অনর্গলভাবে তাঁহাদের ভাষা বলিতে থাকেন, তখন প্রত্যেক আমেরিকাবাসী বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হন।"

১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঐ সংবাদপত্র আবার লিখিয়াছিল—"হিন্দু দার্শনিক ও ধর্ম্মবিৎ স্বামী বিবেকানন্দ গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান গীর্জ্জাঘরে তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতাবলী শেষ করিয়াছেন। শেষ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মনুষ্যের দেবত্ব'। দুর্য্যোগসত্ত্বেও গীর্জ্জাঘরে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল এবং আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতার আগমনের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লোকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবহারজীবী, বিচারক, ধর্ম্মযাজক, বণিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। মহিলাবৃন্দের উল্লেখ তো বাহুল্যমাত্র—কারণ তাঁহারা সকল সভায় পুনঃ পুনঃ তঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বাস্তবিক ইনি সাধারণ স্থানে বক্তৃতা দিতেও যেমন পটু, ভদ্রগৃহে ছোট ছোট বৈঠক বা মজ্‌লিসেও তেমনি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ। ইত্যাদি।"

মিসেস্ মেরী, সি, ফান্‌কে নাম্নী ডেট্রয়েট মহিলা-সমাজের একজন প্রধানা রমণী বহুদিন পরে এই সময়কার কথা এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপথে একটি বিশেষ পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে; কারণ ঐ দিনেই আমি সর্ব্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম্মজগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি দর্শন ও

তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর পরে আমায় শিষ্যপদে বরণ করিয়া লইয়া আমাকে অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন।

"তিনি এই দেশের (আমেরিকার) বড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটিতে সত্যসত্যই তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, এবং স্বামিজী তথায় রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে প্রথম পদার্পন করিলেন, তাঁহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্ত্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূর্ত্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে! আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত, কখন বীণার ন্যায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, আবার কখন গম্ভীর শব্দময়, আবেগময় হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল এবং সেই বিপুল জনসঙ্ঘ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

"স্বামিজী তথায় সর্ব্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি এমন ভাবে কথা বলিতেন যে, বোধ হইত যেন তিনি চাপরাশ পাইয়াছেন। তাঁহার তর্কগুলি বহু যুক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং লোকের সংশয় অপনোদন করিয়া দিত; আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও কদাপি ভাবাবেশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি লোকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন সেই মূল বক্তব্য বিষয়টি হারাইয়া ফেলিতেন না।"

এই সময় বহু সভাসমিতি, গীর্জ্জা ও ভদ্রলোকের বাটীতে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজী অনবরত আহুত হইতেন। ইহার ফলে তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব্ব ও মধ্য-পশ্চিম প্রদেশসমূহের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক ও বষ্টন হইতে বাল্টিমোর পর্য্যন্ত যে কতবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নির্ণয় হয় না। তিনি সর্ব্বত্রই বক্তৃতাচ্ছলে অনেক হিতকর উপদেশ দিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই গিয়া দেখিতেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতে 'গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী'র কীর্ত্তি লোকমুখে আলোচিত হইতেছে। তিনি সর্ব্বত্র বেদ, বেদান্ত, বৈদিক ঋষি ও হিন্দুস্থানের সাধুদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যসমূহের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য্য ও আশার আশ্বাসবাণীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং শত শত শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোঁড়া ও অজ্ঞ মিশনরীরা সর্ব্বত্র ভারতের যে সকল কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা করিয়াছিল তিনি তাহা অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 'জীব-ব্রহ্মে ঐক্য,' 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্বসমূহের বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা বেদ ও উপনিষদের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন—সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, নিগুর্ণ ব্রহ্মবস্তুলাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং জ্ঞান, রাজ, ভক্তি ও কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ যোগ সেই লক্ষ্য সাধনার উপায়।

সময়ে সময়ে স্বামিজীকে এক সপ্তাহের মধ্যে বার, চৌদ্দ বা ততোধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সময়ে সময়ে তাঁহার শরীর-মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িত যে,

তিনি আর নূতন কিছু বক্তব্য খুঁজিয়া পাইতেন না, মনে হইত যেন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে আর কোন নূতন চিন্তা বাহির হইবে না। তখন তিনি বিহ্বল হইয়া ভাবিতেন, 'তাই ত! কি হইবে? কালিকার বক্তৃতায় কি বলিব?' এই অবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হইত। গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পাইতেন, পরদিন তাঁহাকে যে সব কথা বলিতে হইবে কে যেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নিকটে বলিতেছে। কখনও কখনও ঐ শব্দ দূর হইতে আসিত, যেন বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত রাজপথের অপর পার্শ্ব হইতে আসিতে আসিতে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইত, অথবা মনে হইত কে যেন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে, আর তিনি শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিতেছেন। কখনও বা শুনিতেন যেন দুইটি কণ্ঠস্বর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পরদিনকার বক্তব্য-বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেছে। সময়ে সময়ে এই অদ্ভুত উপায়ে অনেক নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব তাঁহার কর্ণগোচর হইত—সে সব তিনি ইহজন্মে কখনও শুনেন নাই বা ভাবেন নাই। নিদ্রাভঙ্গে এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি পর দিবসের বক্তৃতায় বলিতেন।

স্বামিজী এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনাকে নিজ মনেরই সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, আবশ্যকানুসারে মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ কার্য্যসম্পাদনে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এই অলৌকিক বক্তৃতাগুলি এত জোরে হইত যে অন্য ঘরের লোকের কাণে পর্য্যন্ত তাহা পৌঁছিত। তাহারা সেই জন্য পরদিন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "স্বামিজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন?" স্বামিজী কথাটা কোনরূপে কাটাইয়া দিতেন।

এই সময়ে ও ইহার পরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান কালে স্বামিজীর নানা প্রকার যোগজ শক্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্পর্শমাত্র লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, বহু দূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেন এবং লোকের মনোভাব অবগত হইয়া তাহাদিগের সন্দেহ নিরসন বা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেন। এমন কি, লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জীবনের অতীত ইতিহাস পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন। কচিৎ কদাচ তিনি দুই একজন সত্যার্থী লোককে ঐরূপ বলিয়া দিতেন, তাহারা তাঁহার কথার সত্যতা অনুভব করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া যাইত, আর যাহাদের ভিতরে গলদ থাকিত তাহারা ভয়ে তাঁহার ত্রিসীমানা মাড়াইত না। উদাহরণস্বরূপ চিকাগো সহরের একজন ধনী ব্যক্তির কাহিনী এ স্থানে বলিতেছি। এই ব্যক্তি যোগদৃষ্টি বা যোগজশক্তিলাভ, এ সব মোটেই বিশ্বাস করিত না—বলিত ওসব গাঁজাখুরি কল্পনা মাত্র। স্বামিজীকে সে স্পষ্টই একদিন বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তবে আপনি আমার মনের ভাব বা অতীত জীবনের ঘটনা সব বলে দিন না কেন?" স্বামিজী এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন এবং তাহার পর তাহার চক্ষুর দিকে নিজ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এরূপ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন যে সে ব্যক্তির বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার মনের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছে। সে দৃষ্টিতে কোন কঠোরতা ছিল না, কিন্তু তথাপি বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত, অপরাজেয় ও তাহা অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ। লোকটি সহসা চঞ্চল ও ভীত হইয়া রহস্য ত্যাগকরত কাতরস্বরে বলিল, "স্বামিজী, আপনি আমার এ কি কচ্ছেন? মনে হচ্ছে যেন আমার

ভিতরটা মথিত করে জীবনের সমস্ত গুপ্তরহস্য টেনে বের কচ্ছেন!" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ স্বামিজীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিল ও সেই দিন হইতে যোগশক্তি সম্বন্ধে তাহার আর অবিশ্বাস রহিল না। স্বামিজী কখনও এই সকল শক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিতেন না, বরং এগুলি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যাঁহার অন্তর নিরন্তর অদ্বৈতের অমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, তাঁহার নিকট এ সকল শক্তির আর কি মূল্য! তবে সাধারণ লোকে আবার এগুলি না দেখিলে উন্নত শ্রেণীর সাধু বলিয়া বিশ্বাসও করে না, এমনি বিড়ম্বনা!*

আমেরিকার যে সকল লোক বহুবর্ষ ধরিয়া নানাবিধ মত শ্রবণ করিতে করিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা স্বামিজীর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে যেন আশ্বস্ত হইল। তাঁহার অনিন্দিত দেবকান্তি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দিব্যজ্ঞান, প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেন তাহাদের শুষ্কপ্রাণে নববারি সিঞ্চন করিল। এমন কথা তাহারা জীবনে কখন শুনে নাই, এমন লোকও তাহারা কখনও দেখে নাই। এমন করিয়া আপনার জনের মত প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়া কেহ তাহাদিগকে আশার মোহন বংশী শুনায় নাই, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলে নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকে নাই। যাহারা সত্যের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য বারবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াছে, এতদিনে তাহাদের সকল উদ্যম, সকল চেষ্টা সার্থক হইল। তাহারা দেখিল তিনি যাহা বলেন তাহার একটিও

* এই প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। স্বামিজীর শিষ্য গুড্‌উইন সাহেব (পাঠক পরে ইঁহার পরিচয় পাইবেন) একবার জড়-

ধার-করা কথা নহে, সবই স্বীয় অন্তর্লব্ধবোধপ্রসূত। এমন লোকটি তাহারা আর দ্বিতীয় দেখে নাই। যাঁহারা অতিথিরূপে কিছুদিন স্বামিজীকে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, "তাঁহার প্রতিভা বিচিত্র ও বহুবর্ণশোভিত"। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা জগতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একাধারে শিল্পী ও গায়ক, সাহিত্য ও ইতিহাসবেত্তা, সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষক, সুরসিক ও গভীরচিন্তাশীল মনস্বী—এমন লোকের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যে তাঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া বিবেচনা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাদের পক্ষসমর্থন করিয়া স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমুল তর্ক চলিল, কিন্তু গুড্‌উইন সাহেব স্বামিজীর মন্তব্যসমূহ কিছুতেই স্বীকার করিতেছিলেন না। সেই সময়ে সহসা সাহেবের জীবনের অতীত ঘটনাসমূহ ঠিক বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় স্বামিজীর চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামিজী তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমিত এইরূপ লোক, এই করিয়াছ, এই করিয়াছ, তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরিবে! গুড্‌উইন স্বামিজীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তর্ক ছাড়িয়া নীরব হইলেন।